ISBN-81-7334-007-2
চল্লিশ টাকা
Rs Forty only

কৌতূহলী কনের কাঁটা

নারায়ণ সান্যাল



উ উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির-কলিকাতা -৭

KAUTUHALI KONER KANTA
BY NARAYAN SANYAL
PUBLISHED BY :
UJJAL SAHITYA MANDIR
C-3 COLLEGE STREET MARKET
Calcutta -7 (1st floor) INDIA

প্রথম প্রকাশঃ
আষাঢ়,১৩৬৭
জুলাই,১৯৬০

প্রাপ্তিস্থান :
উজ্জ্বল বুক স্টোরস্
৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০০৭৩ (দ্বিতলে)

প্রতিষ্ঠাতা :
* শরৎচন্দ্র পাল
* কিরীটি কুমার পাল

প্রকাশিকা :
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল সাহিত্য-মন্দির
সি - ৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা - ৭০০০০৭ (দ্বিতলে)

প্রচ্ছদ :
রঞ্জন দত্ত

মুদ্রণে :
মা কালী প্রেস
৪/১ই, বিডন রো
কলিকাতা - ৭০০০০৬

ISBN- 81-7334-007-2

।। উৎসর্গ ।।

প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ

পাকুড়ের বাসিন্দাঃ

শ্রীমতী অলকা ত্রিবেদী

শ্রীযুক্ত অনন্তপ্রসাদ ত্রিবেদী

যুগ্মকরকমলেষু ---

নারায়ণ সান্যাল

'কাঁটা - সিরিজ' - এর পরম্পরা

ট্রায়ালবল	...	১৯৬৮	... নাগচম্পা
কাঁটায়-কাঁটায় ১	...	১৯৭৪	... সোনার কাঁটা
		১৯৭৫	... মাছের কাঁটা
		১৯৭৬	... পথের কাঁটা
		১৯৭৭	... ঘড়ির কাঁটা
		১৯৭৮	... কুলের কাঁটা
কাঁটায়- কাটায় ২	...	১৯৮০	... উলের কাঁটা
		১৯৮৭	... অ-আ-ক খুনের কাঁটা
		১৯৮৯	... সারমেয় গেন্ডুকের কাঁটা
অনিকেত		১৯৯০	... রিস্তেদারের কাঁটা
		১৯৯৩	... কৌতূহলী কনের কাঁটা
যন্ত্রস্থ	...		... সাধু-এ তো বড় রঙ্গের কাঁটা

॥ এক ॥



ইণ্টারকমে ভেসে এল রানি দেবীর কণ্ঠস্বর. তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে চাইছে।

বাসু-সাহেব একটি এফিডেবিটের ড্রাফট সংশোধন করছিলেন। ইণ্টারকমেই জানতে চান, 'চাইছে' বললে যখন, তখন নিশ্চয় অল্পবয়সী। ছেলে না মেয়ে?

—দ্বিতীয়টা।

—বিবাহিতা না কুমারী?

—চাবিটা তো তোমার বাঁ-দিকের ড্রয়ারে আছে।

—চাবি! কিসের চাবি?

—আচ্ছা, আসছি আমি।

একটু পরেই হুইল-চেয়ারে পাক মেরে রানি এ ঘরে চলে আসেন। মানে, ব্যারিস্টার পি. কে বাসুর খাস-কামরায়। উনি ইনভ্যালিড-চেয়ারেই সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ান। কারণ তিনিই ব্যারিস্টার সাহেবের রিসেপশনিস্ট তথা জীবনসঙ্গিনী।

রানি দরজা খুলে এ ঘরে এলেন। অটোমেটিক ডোর-ক্লোজারের অমোঘ আকর্ষণে একপাল্লার ফ্লাশ-পাল্লা নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। বাসু জানতে চান, চাবির কথা কী বলছিলে? চাবি তো হারায়নি কিছু?

রানি মুখে আঁচল চাপা দেন। হাসির দমক একটু কমলে বলেন, একে ব্যারিস্টার, তায় গোয়েন্দা! চাবির রহস্যটা ধরতে পারলে না? সাক্ষাৎপ্রার্থী আমার সামনেই বসে আছে। তার নাকের ডগায় বসে কোন আক্কেলে বলি, শুধু বিবাহিতা নয়, সদ্য বিয়ের জল পাওয়া কনে! অষ্টমঙ্গলা পার হয়েছে কী হয়নি।

বাসু-সাহেব পকেট থেকে পাইপ পাউচ বার করতে করতে বলেন, কীভাবে এ সিদ্ধান্তে এলে?

—ওটা বোঝা যায়, বোঝানো যায় না।

—তবু?

—রাতে ভালো ঘুম হয়নি, মুখটা ফুলো ফুলো—বাঁ হাতের অনামিকায় যে আংটি পরেছে সেটায় অভ্যস্ত হয়নি, বারে বারে ডান হাতের আঙুল দিয়ে পাকাচ্ছে। সিঁথিতে সিঁদুর পরার ঢংটা দেখেও বোঝা যায়, অভ্যস্ত হাতের কাজ নয়। তাছাড়া ও পুরুষ মানুষ বুঝুক না বুঝুক, আমরা দেখলেই বুঝতে পারি।

—কী নাম ?

—শিখা দত্ত।

—কী চায় ?

—সে কথা শুধু তোমাকেই বলতে চায়। কী-সব লিগ্যাল এ্যাডভাইস।

—ঠিক আছে। পাঠিয়ে দাও। কৌশিক আর সুজাতা কোথায় ?

—ওরা দু'জনেই বেরিয়েছে। আচ্ছা, মেয়েটিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তে-চাকা গাড়িতে পাক মেরে রানি চলে গেলেন পাশের ঘরে। যেটাকে গৌরবে বলা হয় রিসেপশান কাউন্টার। শুধু বাসু-সাহেবের নয়, ও পাশের উইং-এ 'সুকৌশলী'-র রিসেপশান অফিসও ওইটাই।

একটু পরে দরজায় কেউ নক করল।

—ইয়েস। কাম ইন, প্লিজ।

ভিতরে এল মেয়েটি। সপ্রতিভভাবে নমস্কার করল। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ। আহামরি সুন্দরী কিছু নয়, তবে স্বাস্থ্যবতী, যৌবনের চটক আছে। দীর্ঘাঙ্গী। দেহ সৌষ্ঠবও ভালো। লালচে রঙের একটা মুর্শিদাবাদি পরেছে, ম্যাচ করা ব্লাউজ। খুব সম্ভব রানি দেবীর অনুমান নির্ভুল : সদ্য বিবাহিতা। কিন্তু ওর চোখে কুমারী মেয়ের ভীরু সরলতা। হাত তুলে নমস্কার করল বটে, চোখ তুলে তাকাতে পারল না।

—বোস ওই সোফাটায়। বল শিখা, কী তোমার সমস্যা ?

বসল। কিন্তু এখনও চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। আঁচলের প্রান্তটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে বললে, আজ্ঞে না, সমস্যাটা আমার নয়, আমার বন্ধুর, মানে বান্ধবীর—

—আই সী! কী সমস্যা তোমার বন্ধুর, মানে বান্ধবীর ?

—আমার বান্ধবীর স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিল। অনেক অনেকদিন আগে। শুনেছি, 'লিগ্যাল ডেথ' বলে একটা কথা আছে—মানে, যখন ওই রকম নিরুদ্দিষ্ট মানুষকে আইনত মৃত বলে ধরা হয়—সেটা কত বছর ?

বাসু-সাহেব সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলেন, বয়স কত ?

—কার ? আমার বান্ধবীর ?

—না। তোমার ?

শিখা একটু নড়ে চড়ে বসল। হ্যান্ডব্যাগটা এতক্ষণ রাখা ছিল ওর কোলের ওপর। এবার সেটাকে সোফার পাশে নামিয়ে রাখল। তারপর বলল, সাতাশ।

—তুমি যে বিবাহিতা তা তো দেখতেই পাচ্ছি, আমার সেক্রেটারির অনুমান : তুমি সদ্য-বিবাহিতা। কতদিন বিয়ে হয়েছে তোমার ?

এতক্ষণে মেয়েটি চোখে চোখে তাকায়। বলে, প্লিজ স্যার, আমার প্রসঙ্গ থাক। আমার নাম, বয়স, ইত্যাদি সব কিছুই ফালতু কথা। আমি আগেই আপনাকে বলেছি যে, আমার এ সাক্ষাৎকার আমার এক বান্ধবীর তরফে। সে নিজে আসতে পারছে না বলেই আমাকে পাঠিয়েছে।

বাসু বললেন, রানু—মানে আমার সেক্রেটারি—বাই দ্য ওয়ে, উনি আমার বেটার-হাফও বটেন—এসব বিষয়ে সচরাচর ভুল করে না। ও বলছিল, তোমাদের অণ্টমঙ্গলা হয়েছে-কী-হয়নি। তোমরা হানিমুনে যাওনি কোথাও? মধুচন্দ্রিমায়?

মেয়েটি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে দেড়-মুহূর্ত নীরবে নিজেকে সংযত করল। তারপর একেবারে নিরুত্তাপকণ্ঠে বলতে থাকে, আমার বান্ধবীর স্বামী হরিদ্বার থেকে বদ্রিনারায়ণ যাচ্ছিল। অনেক অনেকদিন আগে। যাত্রীবাহী বাসটা খাদে পড়ে যায়। পুলিস রিপোর্টে জানা যায় যে, পেট্রলট্যাঙ্কে আগুন ধরে বহু লোক জীবন্ত দগ্ধ হয়। বহু যাত্রীর দেহ শনাক্ত করা যায়নি। কিন্তু যাত্রীর তালিকায়—মানে অফিসে যে টিকিট বিক্রি হয়েছিল তার কাউণ্টার-ফয়েলে আমার বান্ধবীর স্বামীর নাম ছিল। তারপর আর তাকে কেউ দেখেনি···

—কতদিন আগে?

—বছর সাতেক।

—এই সাত বছরের মধ্যে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির জীবিত থাকার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি? কেউ কখনও তাকে দেখেনি, বা তার চিঠি পায়নি?

—হ্যাঁ, তাই।

—তোমার বিয়ে হয়েছে কবে?

—প্লিজ, স্যার—আমাকে রেহাই দিন! আপনাকে বারে বারে একই কথা শোনাতে আমারই বিরক্ত আসছে, আপনারও নিশ্চয় তাই। আবার বলি, আমি এসেছি আমার বান্ধবীর তরফে।

—আমার মনে হচ্ছে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির কিছু জীবনবীমা করা ছিল, আর তার স্ত্রী ইনসিওরেন্স কোম্পানি থেকে টাকাটা আদায় করতে পারছে না, যেহেতু সে 'ডেথ সার্টিফিকেট' দেখাতে পারছে না। তাই কি?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ তাই। সেটাও একটা সমস্যা।

—একটা সমস্যা! তাহলে মূল সমস্যাটা কী?

—আমার বান্ধবী জানতে চায়, সাত বছর যখন অতিক্রান্ত তখন সে কি আইনত বিধবা নয়? সে কি আবার বিয়ে করতে পারে? আইনত?

—ঠিক কতদিন আগে বাস দুর্ঘটনা ঘটেছিল?

—সাত বছরের চেয়ে দু-তিন মাস বেশি। অবশ্য সে যখন···

মাঝপথেই মেয়েটি থেমে যায়। বাসু-সাহেব ওর অসমাপ্ত বাক্যের শব্দদুটি পুনরুচ্চারণ করেন একটা জিজ্ঞাসা চিহ্নের লেজুড় জুড়ে দিয়ে, 'অবশ্য সে যখন··· ?'

—সে যখন এই নতুন ছেলেটির সঙ্গে পরিচিত হয়···মানে, যাকে সে এখন বিবাহ করতে চাইছে···অর্থাৎ সে যদি আইনত বিধবা হয়···

বাসু নীরবে পাইপে কয়েকটা টান দিয়ে বললেন, তোমার বান্ধবীর আর কোনও কিছু জিজ্ঞাস্য নেই?

—আছে···মানে, সে একটা আইনের লব্‌জ্‌-এর প্রকৃত অর্থটা জানতে চায়···আমাকে জেনে যেতে বলেছে···অবশ্য নিছক কৌতূহল···

—'আইনের লব্‌জ্‌'? কী কথাটা?

—Corpus delicti···কথাটার মানে কী?

বাসু সাহেব সোজা হয়ে বসলেন। কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে প্রশ্ন করলেন, তোমার বান্ধবী হঠাৎ ওই ল্যাটিন শব্দটার অর্থ জানতে কৌতূহলী হলেন কেন?

—না, মানে···আসলে সে জানতে চেয়েছে···এটা কি আইনের নির্দেশ যে, হত্যাপরাধে কাউকে অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করতে হলে মৃত ব্যক্তির মৃতদেহের অস্তিত্বটা প্রসিকিউশানকে প্রমাণ করতে হবে?

—সেটাই বা তোমার বান্ধবী জানতে চাইছেন কেন?

—একটা গোয়েন্দা গল্পে তাই লেখা হয়েছে। কথাটা কি ঠিক?

বাসু মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, বুঝলাম। তার মানে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে, তোমার বান্ধবী চাইছেন তাঁর মৃত স্বামীর দেহের অস্তিত্বটা প্রমাণিত হোক, যাতে এক নম্বর: তিনি ইন্সিওর করা টাকাটা আদায় করতে পারেন. দু-নম্বর: সদ্য-পরিচিত পাণিপ্রার্থীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন এবং একই সঙ্গে তোমার বান্ধবী চাইছেন, যেন তাঁর নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর মৃতদেহের অস্তিত্বটা পুলিশে না প্রমাণ করতে পারে, কারণ সেক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে স্বামীহত্যার মামলা দায়ের করা যেতে পারে। মোদ্দা ব্যাপারটা তো এই?

মেয়েটি যেন ইলেকট্রিক শক খেয়েছে। সোজা হয়ে উঠে বসে বলে, এসব কী বলছেন আপনি?···বাঃ! 'Corpus delicti' কথাটার মানে তো সে জানতে চেয়েছে অ্যাকাডেমিক্যালি, মানে একটা গোয়েন্দা গল্পে···

বাসু একটা হাত তুলে ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন। বললেন, একটা কথা বুঝিয়ে বলো তো: তোমার বান্ধবী কি আমার স্ত্রীর মতো হুইল-চেয়ার ব্যবহার করেন? তিনি কি প্রতিবন্ধী?

—না, তা কেন?

—তাহলে তাঁকে বল, আমার সেক্রেটারির সঙ্গে টেলিফোনে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিজেই চলে আসতে। দেখ শিখা, Corpus delicti শব্দের অর্থ তোমার বান্ধবী না জানলেও তাঁর ক্ষতি নেই; কিন্তু প্রতিটি মানুষের জানা উচিত যে, ডাক্তারের কাছে রোগের উপসর্গ আর সলিসিটারের কাছে সত্য ঘটনা গোপন করতে নেই। তাঁর সমস্যার কথা তিনিই যেন স্বয়ং এসে আমাকে সরাসরি জানান।

মেয়েটি রুখে ওঠে, কিন্তু কেন? আমি তার প্রতিনিধি. তার তরফে আমি জানতে এসেছি—সেই আমাকে পাঠিয়েছে। এক্ষেত্রে···

—ক্লায়েন্টের নামধাম না জেনে আমি কখনও কাউকে লিগ্যাল অ্যাডভাইস দিই না। তোমার বান্ধবী ইনভ্যালিড নন একথা তুমি বলেছ। আশা করি তিনি পর্দানসিনও নন। তাঁকে স্বয়ং আসতে বল. কেমন?

মেয়েটি কী একটা কথা বলতে গেল। বলল না। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। তার মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে। অপমান, অভিমান না উত্তেজনায় বোঝা গেল না। কোনো কথা না বলে গট্ গট্ করে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। বাসু-সাহেবের মুখের হাসিটা মিলিয়ে যায়নি। তিনি প্রতি মুহূর্তেই আশা করছিলেন, মেয়েটির সুবুদ্ধি হবে, সে থমকে দাঁড়াবে। ফিরে আসবে। তা সে এল না। একবার পিছন ফিরে তাকালো না পর্যন্ত। মাথা খাড়া রেখেই সে ঘর ছেড়ে বার হয়ে গেল।

বাসু-সাহেবের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। বিষণ্ণভাবে তিনি আপন মনেই মাথা নাড়লেন। দু হাতের কনুই গ্লাসটপ টেবিলে রেখে দু হাতে মুখটা ঢাকলেন।

—কী হল? এত তাড়াতাড়ি শিখা চলে গেল যে?

চোখ তুলে দেখলেন, নিঃশব্দে কখন রানি প্রবেশ করেছেন ঘরে।

—ও কিছুতেই স্বীকার করল না, সমস্যাটা ওর নিজের। ভেবেছিলাম, ও ভেঙে পড়বে, মন খুলে সব কথা বলবে। আমি ওর বাবার বয়সী, কিংবা তার চেয়েও বড়ো। কিন্তু মেয়েটা আমার কাছে মন খুলে সব কথা বলল না। ভারি জেদি মেয়ে। আত্মসম্মান জ্ঞানটা প্রখর।

—ও যে বিয়ের কনে এখনও, অন্তত সেটুকু স্বীকার করেছে?

—না! কেন করবে? সমস্যাটা যে ওর 'বান্ধবী'র। ওর কথা যতবার তুলতে গেলাম ততবারই বাধা দিল। ওর নাম যে 'শিখা দত্ত' নয় এটা নিশ্চিত। নাম ভাঁড়িয়ে ও এসেছিল কিছু আইনের ব্যাখ্যা জেনে যেতে। ভেবেছিল, সেটুকু হাতিয়ার দখলে পেলে ও নিজেই ওর প্রথম পক্ষের স্বামীর সঙ্গে লড়তে পারবে! কিন্তু ওভাবে কোনও ক্লায়েন্টকে আমি অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়তে দিতে পারি না—মেয়েটা সে কথা বুঝল না!

—ওর প্রথম পক্ষের স্বামী? ও বলেছে?

—ও বলবে কেন? সেটা তো এখন সূর্যোদয়ের মতো স্বয়ংপ্রকাশ! সাত বছর আগে ওর প্রথম পক্ষের স্বামী একটা বাস-অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়—অন্তত এটাই ছিল ওর ধারণা! সেই বিশ্বাসে ও বোধকরি ভালোবেসে সম্প্রতি বিয়ে করেছে—সাত বছরের বৈধব্য জীবন অতিক্রম করে। আর তার পরেই ও জানতে পেরেছে ওর প্রথম পক্ষের স্বামী জীবিত!

—তাহলে? এ সব কথা সে বলেনি?

—কিছুই বলেনি। এ সবই আমার অনুমান। ও তো শুধু ওর বান্ধবীর কথা শোনাতে এসেছিল।

ব্যাকুলকণ্ঠে রানি জানতে চান, তুমি যা অনুমান করছ তার ফলে কী হবে?

—তা কেমন করে জানব রানু। প্রথম কথা, সাত বছর ওর স্বামী আত্ম-গোপন করে রইল কেন? অ্যামনেশিয়া? মানে স্মৃতিভ্রংশ? নাকি, সে প্রতীক্ষায় ছিল কতদিনে মেয়েটি আবার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়—কারণ

তারপর থেকেই যে তার ব্ল্যাকমেলিঙের খেলা শুরু হতে পারবে!

—কিসের ব্ল্যাকমেলিং?

—বাঃ! প্রথম স্বামী জীবিত আছে এটা প্রমাণিত হলেই তো তার দ্বিতীয় বিবাহ অসিদ্ধ! ভালোবেসে যদি বিয়ে করে থাকে তাহলে বাকি জীবন তাকে গহনা বেচে বেচে প্রথম পক্ষের স্বামীকে টাকা জুগিয়ে যেতে হবে!

—কী সর্বনাশ! তাহলে তোমার ক্লায়েন্ট···

—কে আমার ক্লায়েন্ট? ওই একগুঁয়ে জেদী মেয়েটা? যার নাম পর্যন্ত আমি জানি না? যে আমাকে বিশ্বাস করে মন খুলে তার সমস্যার কথা বলতে পারল না? বাপের বয়সী···

বাধা দিয়ে রানি বলে ওঠেন, 'শিখা দত্ত' ওর নাম হোক না হোক, সে তোমার ক্লায়েন্ট তো বটেই। ওই নামেই তো রসিদটা কেটেছি আমি!

এবার বাসু-সাহেবের ইলেকট্রিক শক খাবার পালা।

ধীরে ধীরে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি: কী? কী বললে? রসিদ? রিসিট? তুমি কি ওর কাছ থেকে কিছু রিটেইনার নিয়েছ? টাকা নিয়েছ?

—হ্যাঁ। মেয়েটি নিজে থেকেই একটা একশো টাকার নোট আমার টেবিলে রেখে দিয়ে বললে, এটা রাখুন। আমার রিটেইনার! আমি ওঁর কাছ থেকে কিছু লিগ্যাল অ্যাডভাইস নিতে এসেছি!

—মাই গড! দেন···দেন সি ইজ মাই ক্লায়েন্ট! অগ্রিম টাকা দিয়ে সে আমার কাছে পরামর্শ চাইতে এসেছিল। আর আমি তাকে নিয়ে শুধু ব্যঙ্গ করেছি, তার আত্মাভিমানে আঘাত করে···ছি! ছি! ছি!

অশান্তভাবে ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত একবার পদচারণা করেই থমকে থেমে পড়েন। বলেন, ওকে খুঁজে বার করতেই হবে। ও প্রচণ্ড বিপদে পড়েছে। ওকে রক্ষা করা আমার ধর্ম···

প্রৌঢ় মানুষটি প্রায় ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইলেন ঘর ছেড়ে।

প্রায় ধাক্কা লাগার মতো অবস্থা। সেদিক থেকে ঘরে ঢুকছিল কৌশিক। বললে, কী ব্যাপার? কাকে খুঁজছেন?

—একটি মেয়ে। রানি-কালারের মুর্শিদাবাদি শাড়ি—অ্যারাউণ্ড পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি—বয়স সাতাশ—

—হ্যাঁ, সে চলে গেছে। আমি যখন গেট খুলে ঢুকছি, তখনই। একটা ফোর-ডোর মারুতি-সুজুকি চালিয়ে। মেয়েটি অবশ্য জানে না যে, একজন অ্যামেচারিশ গোয়েন্দা তাকে ফলো করছে···

—তুমি কি করে জানলে?

—গোয়েন্দাটা ছিল ওই মিষ্টির দোকানের কাছে। একটা জিপে। আপনার ক্লায়েন্ট মারুতিতে স্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও জিপটা চালু করে। মেয়েটির পিছন পিছন সেও চলে গেল—প্রায় বিশ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে।

—এটা একটা কোয়িন্সিডেন্সও হতে পারে।

—পারে না। মেয়েটিকে দেখার আগে—ইন ফ্যাক্ট, সে আপনার চেম্বার থেকে বের হবার আগেই ওই জিপের ড্রাইভারটিকে আমার নজরে পড়ে। তখন আমি বাড়ি থেকে প্রায় ত্রিশ মিটার দূরে। লোকটার হাতে একটা বাইনোকুলার ছিল। দৃষ্টি আপনার ঘরের দিকে। মেয়েটি আপনার ঘর ছেড়ে বার হওয়া মাত্র সে বাইনোটা ঝোলা ব্যাগে ভরে নেয়।

—সে লোকটা কি জানে যে, তুমি তাকে লক্ষ করেছ?

—জানি না, কিন্তু এটুকু তার বিশ্বাস আছে যে, ভবিষ্যতে তাকে আমি শনাক্ত করতে পারব না। কারণ ওর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, গোঁফ, টুপি, গগ্‌লস সব কিছুই টিপিক্যাল অ্যামেচারিশ গোয়েন্দার ছদ্মবেশ।

কৌশিককে সঙ্গে নিয়ে বাসু-সাহেব ফিরে এলেন তাঁর চেম্বারে।

নজরে পড়ে, রানি তাঁর চাকা-দেওয়া চেয়ারে বসেই মেঝে থেকে কী একটা জিনিস তুলবার চেষ্টা করছেন। পারছেন না।

—কী করছ তুমি?

রানি সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, তোমার ক্লায়েন্ট একটা ব্যাগ ভুলে ফেলে গেছে।

এতক্ষণে নজরে পড়ে। যে ভিজিটার্স-সোফায় মেয়েটি বসেছিল তার পাশে পড়ে আছে একটা লেডিজ-ব্যাগ। কৌশিক সেটা সাবধানে তুলে আনে। বাসু-সাহেবের হাতে দেয়। বাসু নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলেন। একটা প্যাড আর ডট পেন রানির দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, লেখ—

—কী লিখব?

—ইনভেন্টরি। লেডিজ হাতব্যাগে কী কী পাওয়া গেল তার তালিকা।

সাবধানে ব্যাগ থেকে একটি একটি করে গচ্ছিত সম্পদগুলি তাঁর প্লাসটপ টেবিলে সাজিয়ে রাখতে রাখতে ঘোষণা করতে থাকেন : একটা লেসবসানো লেডিজ রুমাল, একটা পার্স—তাতে নোট আর খুচরোয় মিলিয়ে দুশো বাহাত্তর টাকা আশি পয়সা, লিপস্টিক একটা, কম্প্যাক্ট একটা। একটা ওষুধের শিশি—ভিতরে সাদা রঙের ট্যাবলেট। ওষুধের নাম 'ইপ্রাল'। একটা বড় হাতল ওয়ালা চিরুনি, টেলিগ্রামের খাম একটা। টেলিগ্রামের প্রাপক সি রায়, একুশের-এক বেণীমাধব সরকার লেন। টেলিগ্রামের বক্তব্য : 'শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টা হচ্ছে সময়ের শেষসীমা—কমলেশ'...হঠাৎ মুখ তুলে বলেন, আজ কী বার?

—আজই তো শুক্রবার।—কৌশিক জবাবে জানায়।

বাসু আবার ব্যাগের ভিতর হাত চালিয়ে দেন। তোয়ালে জড়ানো ভারী কী একটা ব্যাগের তলা থেকে উদ্ধার করে আনেন। সাবধানে তোয়ালের পাক খুলে বলে ওঠেন : দ্যাখো কাণ্ড!

তাঁর হাতে একটি ঝকঝকে ছোট্ট রিভলবার!

রানি আঁতকে ওঠেন : কী সর্বনাশ!

বাসু নির্বিকার। বলে চলেন, লিখে নাও—পয়েন্ট থ্রি টু ক্যালিবারের কোল্ট অটোমেটিক। নাম্বার ঃ থ্রি-সেভেন-ফাইভ-নাইন-সিক্স-টু-ওয়ান। ম্যাগাজিন চেম্বারে ছয়টা স্টিল-জ্যাকেট বুলেট। ব্যারেল সাফা। বারুদের গন্ধ নেই। ছ টা বুলেটই তাজা।

প্রতিটি বস্তু নিজের রুমাল দিয়ে সাফ করে অর্থাৎ আঙুলের ছাপ মুছে নিয়ে আবার ভরে রাখলেন। শুধু টেলিগ্রামখানা ভরে নিলেন নিজের পকেটে।

রানি বলেন, রিভলবার নিয়ে ঘুরছে কেন ?

বাসু বলেন, খুনি বলে যখন আশংকা করা যাচ্ছে না, তখন আত্মরক্ষার্থে নিশ্চয়।

কৌশিক বলে ওঠে, কলকাতা শহরে কেউ আত্মরক্ষার্থে রিভলবার নিয়ে ঘোরাফেরা করে না।

বাসু বলেন, তাহলে বোধহয় টিফিন বক্স নিতে গিয়ে ভুল করে রিভলবারটা ব্যাগে ভরেছিল।

রানি ধমক দেন, রসিকতা থাক। রিভলবার নিয়ে ঘোরাফেরা করার হেতু নিশ্চয় আছে। মেয়েটি জানে, তার সামনে প্রচণ্ড বিপদ আসতে পারে।

বাসু প্রসঙ্গটা অন্য দিকে মোড় ঘোরালেন, রানু, দেখতো মেয়েটি রেজিস্টারে নিজের কী ঠিকানা লিখেছে।

ব্যারিস্টার-সাহেবের সঙ্গে যারা দেখা করতে আসে—অর্থাৎ ক্লায়েন্ট হিসাবে—তাদের একটা রেজিস্টারে নাম ধাম স্বহস্তে লিখিতে হয়। স্বাক্ষরও করতে হয়।

সেই রেজিস্টার দেখে রানি বললেন, নামধাম ও যা লিখেছে তা হল ঃ 'শিখা দত্ত, একশ বত্রিশ, নসিরাম পতিতুণ্ড সেকেন্ড বাই লেন।'

বাসু কৌশিকের দিকে ফিরে জানতে চান, চেন ?

—শিখা দত্ত কে ?

—আরে না রে বাপু। কলকাতা শহরে নসিরাম পতিতুণ্ডের নামে কোনও রাস্তা ?

কৌশিক নেতিবাচক মাথা নেড়েই থামে, না। বইয়ের র‍্যাক থেকে কলকাতা শহরের পথনির্দেশিকা দেখে নিয়ে বলে, 'সেকেন্ড বাই লেন' দূরঅস্ত ! ও নামে কোনও রাস্তাই নেই !

—অলরাইট ! আমি একটু বেরুচ্ছি ! এক ফোটা একটা মেয়ে এভাবে তেজ দেখিয়ে বেরিয়ে যাবে ! ওকে খুঁজে বার করতেই হবে।

রানি বলেন, পোনে তিনশো টাকার মায়ায় না হলেও ওই রিভলবারটার জন্য ওকে ফিরে আসতেই হবে।

বাসু-সাহেব পিঞ্জরাবদ্ধ শার্দুলের মতো ঘরময় পায়চারি করছিলেন। রানির কথায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। বলেন, আসবে না ! লিখে দিতে পারি। ভারি জেদি মেয়ে। ও জানে, আমার চেম্বারে ওর রিভলবারটা থাকাও যা,

ব্যাংক ভল্টে থাকাও তাই। কিন্তু হতভাগিটা নিরস্ত্র হয়ে গেল যে—

কৌশিক প্রশ্ন করে, আপনি কোথায় যাবেন খোঁজ নিতে ?

—সে কথা তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তুমি বরং লালবাজারে চলে যাও আমার গাড়িটা নিয়ে। রবিকে ধরো, রবি ঘোস, পুলিস ইন্সপেক্টর। আমাকে খুব শ্রদ্ধা করে। তার মাধ্যমে দেখ, ওই রিভলবারটার লাইসেন্সি কে ! ভালো কথা, গাড়ি দুটোর নম্বর নোট করে নিয়েছিলে ?

—জিপের নম্বরটা টুকেছি ; কিন্তু মারুতির নম্বরটা···

—টোকনি ! কারণ সেটাই যে আমার বিশেষ প্রয়োজন !

—কী আশ্চর্য ! আপনি খামোখা রাগ করছেন। দু-দুটো গাড়ি হুস-হুস করে বেরিয়ে গেল নাকের ডগা দিয়ে। ন্যাচারাল্যি আমি শুধু পিছনের গাড়ির নম্বরটা টুকে নেবার সুযোগ পেয়েছি···আর তাছাড়া আমি কেমন করে জানব যে, আপনি আপনার ক্লায়েন্টের নাম ধাম জানেন না ?

বাসু সাহেব ওর দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে হন হন করে বেরিয়ে গেলেন।

॥ দুই ॥



বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল একটা ট্যাক্সি। পাড়ারই। বাসু এগিয়ে এসে বললেন, কী যেন নাম তোমার ?

—রসিদ আলি, স্যার।

—ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। রসিদ ! তা তুমি বেণীমাধব সরকার লেন চেন ?

—জী হাঁ, নজদিগই। কেত্তনা নম্বর ?

—একুশের-এক। বাড়িটার থেকে কিছু দূরে ট্যাক্সিটা থামিও। অপেক্ষা করতে হবে। আমি ওদের জানাতে চাই না যে, ট্যাক্সি করে এসেছি। বুঝলে ? নাও এটা ধরো, এটা তোমার মিটারের উপর।

প্রয়োজন ছিল না। পাড়ার ট্যাক্সি। বাসু-সাহেবকে ট্যাক্সি-ড্রাইভার ভালো করেই চেনে। সে কোনও উচ্চবাচ্য করল না। নোটখানা নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে পকেটে রাখল।

মিটারে দশ টাকাও ওঠেনি—ঘ্যাঁচ করে কার্ব—ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেল ট্যাক্সিটা। ড্রাইভার বললে বাঁয়ে তরফ বিশ নম্বর কোঠি, সা'ব !

বাসু নেমে গেলেন। একুশ নম্বর একটা গম ভাঙানোর কল। তার পাশেই একটা একতলা পুরনো বাড়ি। নম্বর-প্লেট বসানো : একুশের-এক। কল-বেল-এর বালাই নেই। অগত্যা সদর দরজার কড়া ধরে জোরে-জোরে নাড়লেন বারকয়েক।

দরজা খুলে মুখ বাড়ালেন একটি মহিলা।

বছর চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। সাদা থান নয়—তবু বিধবা বলেই মনে হল ওঁর। অম্লানবদনে বাসু-সাহেব হাঁকাড় পাড়েন: টেলিগ্রাম! সি. রায়। এ বাড়িই?

ভদ্রমহিলা ঝুঁকে পড়ে দেখলেন খামের উপর লেখা নাম ঠিকানা।

বললেন, হ্যাঁ, দাও।

—এখানে একটা সই দিন আগে।—পকেট থেকে নোটবই আর ডটপেন বার করে মহিলার দিকে বাড়িয়ে ধরেন।

এতক্ষণে মহিলাটি ভালো করে টেলিগ্রাফ পিয়নের দিকে তাকিয়ে দেখেন। বলেন, আপনাকে তো আগে কখনও দেখিনি টেলিগ্রাম নিয়ে আসতে?

একটু আগে মহিলা ওঁর দিকে না তাকিয়েই 'তুমি' সম্বোধন করেছিলেন। অভ্যাসবশত। 'টেলিগ্রাম' হাঁক শুনে, প্রতিবর্তী প্রেরণায়। এখন উনি একটু ঘাবড়ে গেলেন মনে হল। স্যুটেড-বুটেড টেলিগ্রাম পিয়ন ইতিপূর্বে দেখেননি বলে।

বাসুর চট জলদি জবাব: আমি পোস্ট-মাস্টার। এদিকেই আসছিলাম, তাই; নিন, সই করুন।

এমন পোস্ট-মাস্টার মশাইও বোধকরি ওঁর দেখা নেই। যিনি ডাক-পিয়নের কাজ স্কন্ধে তুলে নেন 'এদিকেই আসার' সুবাদে। কিন্তু টেলিগ্রামটা নিতে হলে খাতায় সই দিতে হয়—স্যুটেড-বুটেড ভদ্রলোক অন্যায় কিছু দাবি করেননি। ফলে ভদ্রমহিলা ওঁর হাত থেকে পকেট বুকটা নিয়ে সই দিলেন: সি. রায়।

বাসু কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে বললেন, আপনিই 'সি, রায়'?

—না, তবে ওর টেলিগ্রাম আমিই বরাবর নিয়ে থাকি।

—ও! তাহলে আপনি ওই 'সি. রায়' কথাটার উপর লিখে দিন 'ফর অ্যান্ড অন বিহাফ অফ', আর নিচে আপনার সই দিন।

—আগে তো কখনও তা করিনি।

—টেলিগ্রাফ পিয়নগুলো সব অকর্মার ধাড়ি। কেবল কাজে ফাঁক দেয়। সেটাই পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের নিয়ম।

ভদ্রমহিলা যুক্তির সারবত্তা অনুধাবন করেন। নোটবইটা নিয়ে নির্দেশ-মতো লিখে ফেরত দিলেন। বাসু দেখলেন লেখা আগে 'সি রায়'-এর তরফে শুভ্রা চৌধুরি। এবার মহিলা টেলিগ্রামখানা গ্রহণ করতে হাতটা বাড়িয়ে দেন।

বাসু তার আগেই নোটবুক আর টেলিগ্রামখানা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এবার বললেন, আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল শুভ্রা দেবী। ঘরে চলুন। রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে এসব কথা আলোচনা করা ঠিক নয়।

গট গট করে গলিপথটা অতিক্রম করে তিনি সামনের বৈঠকখানায় ঢুকে একখানা চেয়ার দখল করে জমিয়ে বসলেন। যেন গৃহকর্তা, অম্লানবদনে বলেন, আসুন, ভিতরে এসে ওইখানে বসুন। আমি আপনার কাছ থেকে 'সি. রায়'-এর বিষয়ে কিছু তথ্য জানতে এসেছি।

ভদ্রমহিলা ওর পিছন পিছন ঘরে ঢুকেছেন বটে, তবে বসেননি। তাঁর বিস্ময়ের ঘোরটা কাটেনি। বললেন, আপনি···আপনি আসলে কে?

বাসু-সাহেব হিপ পকেট থেকে টেলিগ্রামখানা আবার বার করলেন। সেটা শুভ্রা দেবীর নাকের ডগায় মেলে ধরে বললেন, লুক হিয়ার, শুভ্রা দেবী, এটা একটা পুরনো টেলিগ্রাম। গতকাল সকালে এটা এই ঠিকানাতেই বিলি করা হয়। কেউ একজন 'সি, রায়'-এর নাম দিয়ে সেটা গ্রহণ করেছে। এখন মিসেস রায় অভিযোগ করছেন—তাঁর নাম ভাঁড়িয়ে কেউ তাঁর টেলিগ্রাম হাতিয়ে নিচ্ছে। সেজন্যই এন্‌কোয়ারিতে এসেছি আমি। টেলিগ্রাম পিয়নের কাজ ভাগ করে নিতে নয়।···এখন বলুন, কাল সকালে কি আপনি এই টেলিগ্রামখানা 'সি, রায়'-এর তরফে নেননি?

—নিয়েছিলাম। তারই অনুরোধ—আর তাকেই দিয়েছিলাম।

—কিন্তু টেলিগ্রাম পিয়নের খাতায় আপনি তো নিজের নাম লেখেননি। তাছাড়া আপনি তাঁকে টেলিগ্রামখানা দিলে তিনি আপনার নামে কম্‌প্লেন করবেন কেন?

—ছন্দা তা করতেই পারে না!

—তাহলে আমার পকেটে এ টেলিগ্রামখানা কী করে এল, বলুন?

—তাই তো ভাবছি আমি!

—ভাবা-ভাবির দরকার নেই, আপনি মিসেস ছন্দা রায়কে ডাকুন।

—সে এখানে থাকে না।

—কোথায় থাকে? তার ঠিকানা কী?

—আমি জানি না।

—এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? ছন্দা কোথায় থাকে তা আপনি জানেন না, অথচ তার সই জাল করে তার টেলিগ্রাম আপনি নিচ্ছেন?

—সই জাল করে?

—নয়? এর আগে কি আপনি পোস্টাল-পিয়নের খাতায় লিখেছিলেন 'ফর অ্যান্ড অন বিহাফ অব ছন্দা রায়'? নিজের নামটাও তো সই করেননি। আমি সব কাগজপত্র দেখে নিয়ে তারপর এন্‌কোয়ারিতে এসেছি। 'আ-য়াম' সরি। আপনি তৈরি হয়ে নিন। আমার সঙ্গে একবার আপনাকে থানায় যেতে হবে।

—থানায়! বাঃ! কেন? কী আমার অপরাধ?

—বাঃ! অপরাধ নয়? আপনি মিসেস ছন্দা রায়ের সই জাল করেছেন। সে এখানে থাকে না, তবু আপনি তার টেলিগ্রাম রিসিভ করেছেন।

—কিন্তু আমার কী দোষ? সে তো ছন্দারই অনুরোধে। ও বললে, ও একজনকে সেই ঠিকানা দিয়েছে। তার চিঠিপত্র এলে বা টেলিগ্রাম এলে আমি যেন রেখে দিই। ও সময় মতো এসে নিয়ে যাবে।

—এই টেলিগ্রামখানা আপনি কাল কখন পেয়েছেন? আর কখন মিসেস রায়কে হস্তান্তরিত করেছিলেন?

—গতকাল সকাল ন'টা নাগাদ ওটা পাই। আমি হাসপাতালে যাই এগারোটা নাগাদ। তার আগেই ছন্দা ফোন করে জানতে চায়, তার কোনও চিঠিপত্র এসেছে কিনা। আমি বলি, একখানা টেলিগ্রাম এসেছে। সে হাসপাতালে এসে দুপুরবেলা আমার সঙ্গে দেখা করে আর ওটা নিয়ে নেয়।

—কোন্ হাসপাতালে ?

—শরৎ বোস রোডের শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম হাসপাতালে।

—আপনি নার্স ?

—হ্যাঁ।

—ট্রেইনড নার্স ?

—হ্যাঁ, দু'জনেই পাস করা নার্স।

—ছন্দা তার নিজের ঠিকানায় টেলিগ্রাম নেয় না কেন ?

—তার···মানে, কিছু অসুবিধা আছে।

—'অসুবিধা' মানে তো তার স্বামী ? এরই মধ্যে স্বামীর কাছ থেকে লুকোবার মতো ব্যাপার ঘটেছে ?

—'এরই মধ্যে' মানে ?

—কেন, তা আপনি জানেন না—ওদের বিয়ে হয়েছে এই সেদিন ?

—আপনি কেমন করে জানলেন ?

—ছন্দা দেবী নিজেই এসেছিলেন পোস্ট-অফিসে। কমপ্লেন করতে। দেখেই মনে হল ও এখনও সদ্য বিয়ের কনে। কদ্দিন বিয়ে হয়েছে ওর ?

—দিন দশেক।

—ওর স্বামীর নাম কী ?

—আমি জানি না।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। ছন্দা রায় কোথায় থাকে তা আপনি জানেন না, তার স্বামীর নাম কী তা জানেন না, অথচ তার সই জাল করতে জানেন। তা আমার অত কথায় কী দরকার ? যা বলার থানায় গিয়ে বলবেন। মিসেস রায় কমপ্লেন করেছেন বলেই···

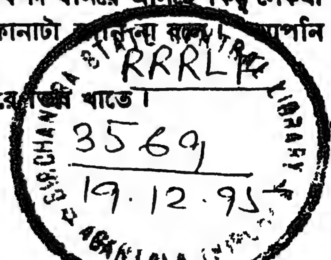
—ছন্দা আমার নামে কমপ্লেন করতেই পারে না।

—পারে না ? তাহলে আমি কেন এসেছি ?

—সেটাই তো তখন থেকে ভাবছি আমি। আমার মনে হয়, আপনি পোস্ট-অফিস থেকে আদৌ আসেননি। কায়দা করে ছন্দার সম্বন্ধে কিছু খোঁজ-খবর নিতে এসেছেন। তাই নয় ?

—আপনি ঠিকই ধরেছেন, শুভ্রা দেবী। আমি ডাক-বিভাগের কেউ নই। আমি ছন্দার একজন শুভানুধ্যায়ী—কিন্তু ছন্দা নিজেই সে কথা জানে না। আমি জানতে পেরেছি, ছন্দার একটা ভীষণ বিপদ ঘনিয়ে আসছে কিন্তু সেকথা ওকে জানাতে পারছি না। ওর বর্তমান ঠিকানাটা জানি না বলে। আপনি আমাকে সাহায্য করবেন ?

জবাবে ভদ্রমহিলা যা বললেন তা একেবারে অন্য খাতে।



—আপনাকে আমার ভীষণ চেনা চেনা লাগছে। আপনার ছবি আমি কোথাও দেখেছি। আপনি কি টি, ভি, সিরিয়ালে অভিনয় করেন?

—না! সম্ভবত আপনি খবরের কাগজে আমার ছবি দেখেছেন।

হঠাৎ শুভ্রা বলে ওঠেন, এতক্ষণে চিনতে পেরেছি! আপনি ব্যারিস্টার পি, কে, বাসু?

—ঠিকই চিনেছেন। এবার নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে, আমি ছন্দার শুভাকাঙ্ক্ষী। সব কথা খুলে বলুন এবার।

—বলব। সব কথাই বলব। কিন্তু তার আগে বলুন কী খাবেন? চা, না কফি?

—কী আশ্চর্য! আমি ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে এসেছি। আমার নানান জরুরি কাজও আছে। সংক্ষেপে বলুন, ছন্দা রায় সম্বন্ধে আপনি কতটুকু কী জানেন? কেমন করে তার সন্ধান পেতে পারি?

শুভ্রা দেবী আর কোনও সংকোচ করলেন না। সব কথাই খুলে বলেন: না, ছন্দা রায়ের ঠিকানা উনি সত্যিই জানেন না। এমন কি তার স্বামীর নামটাও ওঁর অজানা। না, বিয়েতে শুভ্রা দেবীর আমন্ত্রণ ছিল না। সম্ভবত রেজিস্ট্রি-বিয়ে হয়েছে, কলকাতাতেই। অথচ ছন্দা আর শুভ্রা দু'জন দু'জনকে দীর্ঘদিন ধরে চেনেন। এই বাড়িতে শুভ্রার সঙ্গে বিয়ের আগে ছন্দা বিশ্বাস —হ্যাঁ, বিয়ের আগে কুমারী অবস্থায় ওর পদবি ছিল বিশ্বাস—চার-পাঁচ বছর বাস করে গেছে। দু'জনেই পাস করা নার্স, যদিও বয়সে ছন্দা দশ-বারো বছরের ছোটো। অবশ্য দু'জনের কর্মস্থল ছিল ভিন্ন। ছন্দা কাজ করত একটা প্রাইভেট নার্সিংহোমে, বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছাকাছি। সব কিছুই সে গোপন করতে চাইত। তার অতীত ইতিহাসে এমন কিছু আছে যাতে সে নিজের কথা কিছুই বলতে চাইত না। এমন কী, সে যে ঠিক কোন নার্সিং-হোমে চাকরি করত—চার পাঁচ বছর একই ছাদের তলায় বাস করেও—শুভ্রা তা জানতে পারেননি। হঠাৎই সে একদিন এসে জানায় যে, সে একজনকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। কাকে, কী বৃত্তান্ত কিছুই স্বীকার করেনি। তীব্র অভিমানে শুভ্রাও বিস্তারিত জানতে চাননি। প্রায় মাসখানেক আগে ওর জিনিসপত্র নিয়ে ছন্দা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। দিন-সাতেক আগে আবার হঠাৎ এসে জানায় যে, ইতিমধ্যে সে জনৈক মি, রায়কে বিবাহ করেছে। আরও জানায় যে, তার কিছু চিঠি অথবা টেলিগ্রাম এই ঠিকানায় আসবে। শুভ্রা যেন তা সংগ্রহ করে রাখেন। সময়-মতো ছন্দা তা নিয়ে যাবে। এরপর প্রত্যেকদিন সকালেই ছন্দা একবার করে ফোনে জেনে নিত তার কোনও চিঠিপত্র এসেছে কিনা। গতকালও সে ফোন করেছিল।

বাসু বললেন, আবার যদি সে ফোন করে তাহলে তাকে বলবেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। আজ সকালেই সে এসেছিল আমার চেম্বারে। আর যাবার সময় ভুল করে একটা হ্যান্ডব্যাগ ফেলে গেছে। ওই ব্যাগের ভিতর অত্যন্ত দামি কিছু আছে…

—অত্যন্ত দামি কিছু? কী তা?

—সেটা আমি আপনাকে জানাতে পারছি না, শুভ্রা দেবী। প্রফেশনাল এথিক্‌সে বাধছে। তবে ছন্দা নিশ্চয় এতক্ষণে সেটা টের পেয়েছে। হয়তো সে মনে করতে পারছে না—ব্যাগটা ঠিক কোথায় খুইয়েছে। আপনি বললেই ওর মনে পড়ে যাবে। ও বুঝতে পারবে অথবা…

—অথবা?

—অথবা হয়তো ওর মনে পড়েছে সব কথা। কিন্তু দুরন্ত অভিমানী মেয়েটা জেদ করে ফিরে আসছে না। কারণ সে জানে, আমার হেফাজতে ও জিনিস নিরাপদেই আছে।

শুভ্রা বললেন, তাও হতে পারে। ছন্দা অত্যন্ত অভিমানী।

—আপনি ওকে বলবেন তো?

—নিশ্চয় বলব। তবে একটা শর্ত আছে।

—শর্ত! কী শর্ত?

—আপনার ব্লাড শুগার আছে? ডায়াবেটিস?

গুড গড! না! কিন্তু সে কথা কেন?

—তাহলে আপনি একটু বসুন। পাঁচ মিনিট। আমি সামনের দোকান থেকে দুটো কড়াপাক সন্দেশ নিয়ে আসি। খুব ভালো বানায়। আপনি একটা কিছু মুখে না দিলে আমার…

—অল রাইট! যান, নিয়ে আসুন।

শুভ্রা ড্রয়ার খুলে একটা নোট নিয়ে চটিটা পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

বাসু তৎক্ষণাৎ টেলিফোনটা তুলে নিয়ে ওঁর বাড়িতে ডায়াল করলেন। ধরলেন রানি দেবী: কী খবর?

—সুজাতা ফিরেছে?

—না।

—সুজাতা ফিরে এলেই বলবে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি অঞ্চলে চলে যেতে। কাছে-পিঠে প্রতিটি নার্সিংহোমে গিয়ে সে যেন খোঁজ নেয়: নার্স ছন্দা বিশ্বাস সেখানে কাজ করে কি না। ইন ফ্যাক্ট—ছন্দা রায় মাসখানেক আগে 'বিশ্বাস' পদবিতে ওই অঞ্চলের কোনও নার্সিংহোমে কাজ করত, এখন করে না। তবে প্রশ্নটা ওইভাবে পেশ করাই শোভন। যদি কেউ বলে, আগে এখানে কাজ করত, এখন করে না, তখন তার বর্তমান ঠিকানা সংগ্রহের নানান চেষ্টা যেন করে। বুঝলে?

—বুঝলাম। কিন্তু নার্স ছন্দা রায়টি কে?

—যার হাত থেকে একখানা একশো টাকার নোট হাতিয়ে তুমি আমাকে দায়ে মজিয়েছ!

—আমি? না তুমি নিজে ওকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে…

—সারেন্ডার! সারেন্ডার! হ্যাঁ, সব দোষ আমার। আরও নোট করে নাও—আমি ফোন করছি একুশের-এক বেণীমাধব সরকার লেন থেকে। এই

নম্বরটা হচ্ছে 46-5322। মিনিট দশেক পরে এখানে রিং কর। যিনি ধরবেন তাঁর নাম শুভ্রা চৌধুরি। তাঁকে বলবে, তুমি যা হয় একটা নাম বলে নিজের পরিচয় দিও। শুভ্রা দেবীকে বলবে, তুমি কমলেশের বান্ধবী। ছন্দা রায়ের জন্য একটা জরুরি খবর দিতে চাও। ছন্দা যেন তোমাকে ফোন করে। তোমার নাম্বারটা শুভ্রাকে দিয়ো।

—তারপর ছন্দা যখন ফোন করবে ?

—তখন তাকে নিজের সত্য পরিচয় দিয়ে বলবে সে যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। জানিয়ো, নিজের ব্যবহারের জন্য আমি দুঃখিত।

—বুঝলাম। আর কিছু ?

—রিভলবারের লাইসেন্সির পাত্তা পাওয়া গেছে ?

—এখনও না। কৌশিক কোনও ফোন করেনি এখনও।

আপাতত এই পর্যন্ত। জানলা দিয়ে দেখছি এক জোড়া কড়াপাকের সন্দেশ এগিয়ে আসছে।

— একজোড়া কড়াপাকের সন্দেশ ! তার মানে ?

বাসু নিঃশব্দে ধারক যন্ত্রে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন। পরমুহূর্তেই সন্দেশের প্যাকেট হাতে শুভ্রা ফিরে এলেন।

ট্যাক্সিতে উঠে বললেন : এবার চল রাজা রামমোহন রায় সরণীতে। শেয়ালদা ফ্লাই ওভার হয়ে। ভিড় কম হবে।

আমহার্স্ট স্ট্রিট আর হ্যারিসন রোডের জংশনে নেমে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিলেন। ওঁর গন্তব্যস্থল থেকে বেশ কিছুটা দূরে। কারণ ছিল। এবার উনি যে কাজটা করতে চলেছেন সেটা বে-আইনি ! এমন ক্রিয়াকাণ্ডে উনি অভ্যস্ত। ওঁর মতে 'এন্ড জাসটিফাইজ দ্য মীনস'—অর্থাৎ মূল লক্ষ্যটা যদি সত্য-শিব-সুন্দরমুখী হয়, তাহলে প্রতিটি পন্হাই নীতিধর্মের অনুসারে। প্রতিপক্ষদল অর্থাৎ সমাজবিরোধীরা কোমরের নিচে ক্রমাগত আঘাত হানবে আর শান্তিকামী ব্যক্তিরা যে-কোনওভাবে ওদের মোকাবিলা করতে পারবে না—ওটা কোনও যুক্তি নয়। তাই উনি ট্যাক্সি-চালককে জানাতে চান না ওঁর গন্তব্যস্থলটা।

ছোট্ট একটা প্রেসের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সামনে বসে একজন কম্পোজিটার টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় কাজ করছিলেন। চোখের উপর চশমা তুলে বললেন, কাকে খুঁজছেন স্যার ?

—গোরা আছে ? গৌরাঙ্গ জানা ?

—আজ্ঞে না। গোরা কাঁথাই গেছে। মানে, দেশের বাড়িতে। ছাপাখানার কাজ করাতে চান কিছু ?

—তা তো চাই, কিন্তু গোরা না হলে তো তা হবে না !

—কেন স্যার ? গোরাকে বাদ দিয়েই তো ছাপাখানা দিব্যি চলছে।

বাসু জবাব দিলেন না। হঠাৎ ভিতর থেকে এক বৃদ্ধ হন্তদন্ত হয়ে

বাইরে বেরিয়ে এলেন। খেটো ধুতি, গলায় কণ্ঠি, ফতুয়া গায়ে, চোখে নিকেলের চশমা। হাত দুটো জোড় করে বলেন, স্যার! আপনি?

—আমাকে আপনি চেনেন?

—বিলক্ষণ! আপনাকে চিনব না? আপনি না থাকলে সেবার যে গোরার মেয়াদ হয়ে যেত। আমি গোরা, মানে গৌরাঙ্গের বাপ, প্রভুচরণ জানা, আজ্ঞে। আসুন, ভিতরে আসুন—

নিজের চেয়ারটা কোঁচার খুঁট দিয়ে মুছে নিয়ে বসতে বললেন। বাসু-সাহেবের নজর হল, অনেকগুলি কৌতূহলী চোখ ওঁদের লক্ষ্য করছে। বললেন, জানামশাই, কিছু গোপন কথা ছিল। কোথায় বসে হতে পারে?

প্রভুচরণের কোনও ভাববৈকল্য হল না। যেন নিত্যি ত্রিশদিন তিনি এমন গোপন কথা শুনে থাকেন। বলেন, তাহলে, স্যার, ওপরে চলুন। দোতলায় আমার বাসা।

কাঠের নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে দুজনে দ্বিতলে উঠে আসেন। নিম্নমধ্যবিত্তের অভাবের সংসার। একজন অবগুণ্ঠনবতী—বোধকরি গৌরাঙ্গের গর্ভধারিণী একটি বেতের মোড়া পেতে দিয়ে গেলেন। প্রভুচরণ ভিতর থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বলেন, এবার বলুন। গৌরাঙ্গ দেশে গেছে। তাতে আটকাবে না। কী কাজ, বলুন?

বাসু মোড়ায় বসে একটু ভূমিকা করতে গেলেন, জানামশাই, সেবার গোরা যেমন বিনা অপরাধে জেল খাটতে যাচ্ছিল এবার তেমনি এক নিরপরাধীকে বাঁচাতে আমি একটু বেআইনি···

প্রভুচরণ দু'হাত দু'কানে চাপা দিয়ে বলে ওঠেন, আপনি দেবতুল্য মানিষ্যি। আমারে কোনও কৈফিয়ত দিতে যাবেন না। কী করতে হবে—শুধু সেইটুকু বলুন।

—আমাকে খানকতক—ধরুন পাঁচখানা ভিজিটিং কার্ড বানিয়ে দিতে হবে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে।

—এ আর কী এমন শক্ত কাজ? গোরা নেই তো নেতাই আছে—ওই গোরারই ছোটো ভাই। প্রেসের সব কাজই জানে। কম্পোজ করে নিজেই ছাপিয়ে আনবে। আপনি শুধু কী লিখতে হবে বলেন।

বাসু তাঁর পকেট নোটবুক থেকে একটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে নিয়ে ইংরেজি হরফে লিখে দিলেন :

Charu Chandra Roy, B. Sc.
Real Estate Agent & Govt.
Authorised Agent of N.S.C.,
C.T.D., Unit Trust, R.D,
21/1 Benimadhab Naskar Lane
Calcutta-700026

প্রভুচরণ বললেন—ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হবে, স্যার।

—তাহলে আমি একটু ঘুরে আসি।

—আজ্ঞে না, ইঞ্জিরি হরফ, প্রুফটা আপনাকেই দেখে দিতে হবে। আমি বরং আপনার জন্য কিছু চা-মিষ্টির যোগাড় দেখি—

আগেই বলেছি, উদ্দেশ্য সৎ হলে মিথ্যা বলতে ওঁর বাধে না। আপাতত ওঁর উদ্দেশ্য নিজের উদর এবং অপরের আত্মাভিমানকে বাঁচানো। অম্লানবদনে বললেন, না, জানামশাই; একটু অ্যাসিডিটি মতো হয়েছে—ওই অম্বল আর কী। বরং দেখুন, কাছে-পিঠে ঠাণ্ডা 'লিম্‌কা' পাওয়া যায় কিনা, অথবা ডাব।

ডাবই পাওয়া গেল। ঘণ্টাখানেক পরে ওই সদ্যমুদ্রিত ভিজিটিং-কার্ডগুলি নিয়ে বাসু সাহেব রওনা দিলেন।

বাসু-সাহেবের কর্মপদ্ধতি ছকবাঁধা।

পরবর্তী দৃশ্য মধ্য কলকাতার একটি বড়ো ডাক ও তার ঘর।

কমলেশ নামধারী এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি দু'দিন আগে এই ডাকঘর থেকে একটি তারবার্তা পাঠিয়েছিল জনৈকা সি, রায়কে : 'শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টা হচ্ছে সময়ের শেষ সীমা।'

আজই সেই শুক্রবার। নির্দিষ্ট সময়ের শেষ সীমান্তে উপনীত হতে আরও ঘণ্টা ছয়েক বাকি। উনি নিজে এই মর্মান্তিক বার্তাটা জেনেছেন ঘণ্টা তিনেক আগে। এই তিন ঘণ্টার মধ্যে জানতে পেরেছেন 'সি· রায়' হচ্ছে ছন্দা রায়। একটি আতঙ্কতাড়িতা সদ্য-বিবাহিতা। বোধকরি যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি—দীর্ঘ সাত বছর সে ছিল বিধবা। এখন সে তার মনের মানুষ খুঁজে পেয়েছে। আর সেই শুভ মুহূর্তেই অজ্ঞাতবাস থেকে এসে উপস্থিত হয়েছে ওই কমলেশ। তার পুরো নামটা জানেন না—কিন্তু আন্দাজ করেছেন, ওই ভিরু কপোতীর দৃষ্টিভঙ্গিতে সে এক হিংস্র শ্যেনপক্ষী। হয়তো—হ্যাঁ, এমনও হতে পারে—সাত-সাতটি বছর সে স্বেচ্ছায় অজ্ঞাতবাসে ছিল : কখন তার পত্নী নতুন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়! তখনই শুরু হবে তার খেলা : ব্ল্যাকমেলিং!

প্রথম স্বামী জীবিত থাকাকালে—তার সঙ্গে ডিভোর্স না হলে—দ্বিতীয় বিবাহ অসিদ্ধ। অর্থাৎ ওই অজ্ঞাতপরিচয় 'কমলেশ' যে মুহূর্তে জনবহুল ট্রাম রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে হাঁকাড় পাড়বে 'অয়ম অহম্‌ ভো'—তৎক্ষণাৎ ওই সদ্যবিবাহিতার সাতমহলা স্বপ্নের প্রাসাদ হাড়গোড় ভেঙে হুড়মুড়িয়ে উল্টে পড়বে। এই হচ্ছে আইনের অনিবার্য নির্দেশ। সেই দুর্দৈব ঠেকাবার শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে বাড়ি থেকে বার হয়েছেন অভুক্ত প্রৌঢ় মানুষটি। প্রথামতো যাঁর কাজ আদালত চৌহদ্দি থেকে ল' লাইব্রেরির ভিতর সীমিত হবার কথা।

ডাকঘরে ঢুকেই নজরে পড়ল এনকোয়ারির পাশেই খাম-পোস্টকার্ড আর ডাকটিকিট বিক্রি হচ্ছে। সেদিকটায় চাপ ভিড়। বাসু সেদিকে গেলেন না। একটা ফাঁকা মতো কাউণ্টারে গিয়ে কর্মরত করণিককে বললেন, শুনছেন?

কিছু এন. এস. সি. কিনব। কার কাছে যাব?

মন্ত্রের মতো কাজ হল তাতে। ইউনিট ট্রাস্টের নানান সুবিধাজনক স্কিমের চাপে লোকে আজকাল আর ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট কিনতে উৎসাহী নয়। অথচ এগুলি বিক্রয় করতে নানান কারণে পোস্টাল কর্মচারীরা উৎসাহী। ছেলেটি বললে, গলিপথে একটা দরজা আছে—ওইদিকে। তাই দিয়ে ভিতরে চলে আসুন। ওই কোণায় যে টাকমাথা ভদ্রলোক বসে আছেন, ওঁর সঙ্গে কথা বলুন। ওঁর নাম : অরিন্দমচন্দ্র ঘোষাল।

গলিপথে খিড়কি-দরজা দিয়ে বাসু ওই বৃদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখলেন ভিতরের গলিপথে ছেলেটি ইতিপূর্বেই ঘোষাল-মশাইকে তাঁর উদ্দেশ্যের কথাটা জানিয়ে দিয়েছে। একটি টুলও কোথা থেকে যোগাড় করে এনেছে।

অনুরুদ্ধ হয়ে বাসু টুলে বসলেন। অরিন্দম প্রশ্ন করেন, এন. এস. সি. কিনবেন? কত হাজার?

বাসু সেকথার জবাব না দিয়ে বললেন, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো, ঘোষালমশাই? আপনি কি কখনও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তেন?

হা হা করে হেসে ওঠেন অরিন্দম। বলেন, আরে না মশাই! কলেজে আর পড়ার সুযোগ পেলাম কোথায়? বাবামশাই ছিলেন পোস্ট-মাস্টার। ম্যাট্রিকটা পাশ করার পর একটা টুলে বসিয়ে দিয়েছিলেন। সে আমলে সেসব সুবিধে ছিল। তেত্রিশ বছরে ঘষতে ঘষতে এতদূরে এসে পৌঁছেছি। ডিসেম্বরে রিটায়ার করব।

—কিন্তু আপনাকে এত চেনা চেনা লাগছে কেন? আপনারও তাই লাগছে না কি?

অরিন্দম বাসু-সাহেবকে আর একবার ভালো করে দেখে নিয়ে বললেন, আজ্ঞে না। তবে আমার চেহারাটা টিপিক্যাল কেরানির। আপনি হয়তো অন্য কোনও করণিকের সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলছেন।

ইতিমধ্যে ও-পাশের আর একটি মহিলা করণিক একটা ফাইল এগিয়ে দিয়ে বললে, ঘোষালদা, এইখানে একটা সই দিন।

নির্দেশিত স্থানে স্বাক্ষর দিয়ে অরিন্দম আবার বাসু-সাহেবের দিকে মন দিলেন, খগেন বলছিল, আপনি নাকি কিছু এন. এস. সি কিনতে এসেছেন।

খগেন তার সিটে ফিরে গেছে। বাসু ইতিমধ্যে গোটা পোস্ট-অফিসটা দেখে নিয়েছেন। না, কেউ ওঁর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে নেই। পি কে. বাসু-হিসাবে কেউ তাঁকে চিহ্নিত করেনি। তাই হাসতে হাসতে বললেন, না ঘোষালমশাই। আমি জাতে ময়রা। সন্দেশ খাই না।

—ময়রা? সন্দেশ খান না? মানে? কিন্তু খগেন যে বলল

বাসু-সাহেব সদ্যলব্ধ ভিজিটিং-কার্ড একখানা নামিয়ে রাখলেন ঘোষাল-মশায়ের টেবিলে। উনি সেটা পড়তে যখন ব্যস্ত তখন বাসু বলতে থাকেন, আমার কাজ কারবার ছিল এতদিন দক্ষিণ কলকাতায়। কিন্তু আমার ছেলে

অফিস থেকে এ পাড়ায় কোয়াটার্স পেয়েছে। তাই বেণীমাধব নস্কর লেন ছেড়ে সামনের মাসে এ-পাড়ায় উঠে আসছি। তা সিজনে পাঁচ-সাত লাখ টাকার বিজনেসও পাই। আপনি তো জানেনই যে, কোন পোস্ট- অফিসে এন. এস. সি জমা পড়ল তা নিয়ে ক্লায়েন্টের কোনও পক্ষপাতিত্ব থাকে না —কিন্তু এজেন্টদের থাকে।

বলে, ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বাম চক্ষুটি নিমীলিত করলেন।

ঘোষাল অনুচ্চকণ্ঠে বলে ওঠেন, ও-পাড়ায় যেসব ফেসিলিটি পেতেন, এখানেও তাই-তাই পাবেন। মাসে পাঁচ-সাত লাখ?

—না, মাসে বলিনি। সিজন টাইমে মাসে আট লাখও হয়েছে ইয়ার বিফোর লাস্ট। যাহোক এ পাড়ায় এসে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব!··· ও ভালো কথা, আর একটি কাজ আছে ঘোষাল-মশাই। আমার একটা উপকার করতে হবে।

—অত সংকোচ করছেন কেন? বলুন বলুন?

—আমার এক মক্কেল—কমলেশবাবু—কলকাতায় একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনতে চায়। ও দর দিচ্ছে সাড়ে সাত, আর মালিক হাঁকছে আট লাখ···

অরিন্দম বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, আদার ব্যাপারিকে ওইসব জাহাজের গপ্পো কেন শোনাচ্ছেন চারুবাবু?

বাসু পকেট থেকে একটা টেলিগ্রাম বার করে বললেন, দিন-তিনেক আগে কমলেশবাবু এই ডাকঘর থেকেই আমাকে টেলিগ্রাম করেছিলেন। আজ সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে শেষ দর জানাবার কথা। কিন্তু ওঁর ঠিকানা লেখা ভিজিটিং কার্ডখানা আমি হারিয়ে ফেলেছি। এই টেলিগ্রামের মাথায় যেসব সাঙ্কেতিক নম্বর-টম্বর লেখা আছে তা থেকে কি জানা যায়, কমলেশবাবুর ঠিকানাটা?

—নিশ্চয় যায়। টেলিগ্রামের ফর্মে প্রেরক নাম ঠিকানা লিখে দেয়। স্বাক্ষরও করে। এ তো মাত্র তিনদিন আগেকার। এখনি দেখে বলে দিচ্ছি। বি-কা-শ! একটু শোনো তো ইদিকে।

বিকাশ, অর্থাৎ টেলিগ্রাফ-প্রেরক করণিক এগিয়ে আসে।

অনতিবিলম্বেই শ্যেনপক্ষীর নীড়ের সন্ধান পাওয়া গেল: কমলেশ ঘোষ, মা সংগ্রামী অ্যাপার্টমেন্টস. 13 বি, তারাতলা রোড।

বাসু বলেন, অ্যাপার্টমেন্টস্ মানে তো মস্ত বাড়ি। অথচ নম্বর-টম্বর তো কিছু নেই।

—তাই তো দেখছি।

বাসু জানতে চান, আর্জেন্ট টেলিগ্রামে জবাব পাঠালে আজ সন্ধ্যা ছয়টার আগে সেটা তারাতলা পৌঁছাবে?

বিকাশের চটজলদি জবাব, অসম্ভব। পরশুর আগে নয়। গোটা পঞ্চাশ আর্জেন্ট টেলিগ্রাম জমা হয়ে আছে।

বিকাশকে বিদায় করে ঘোষালমশাই নিম্নকণ্ঠে বাসু-সাহেবকে বলেন, সাত-আট লাখ টাকার বিজনেস। আপনার কমিশন কোন্ না দশ-বিশ হাজার

টাকা হবে ? আপনি মশাই একশ'টি মুদ্রা খরচ করতে পারবেন ? তাহলে এক ঘণ্টার মধ্যে টেলিগ্রাফ তারাতলায় বিলি হয়ে যাবে।

—কী ভাবে ?

—আমাদের টেলিগ্রাফ-পিয়ন যদুনাথ ট্যাক্সি করে যাবে, বাসে করে ফিরবে। টেলিফোনে তারাতলা পোস্ট-অফিসে আমি জানিয়ে দিচ্ছি। ট্যাক্সি আর বাসভাড়া বাবদ ত্রিশ টাকা, বাকি সত্তর নানান লোককে খুশি করতে—সোজা হিসাব।

বাসু এক কথায় রাজি। টেলিগ্রাফে লিখে দিলেন: ইম্পর্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট নেসেসিটেট্স ইনডেফিনিট পোস্টপোনমেন্ট এএএ কলিং ইন পার্সন টু এক্সপ্লেন [অনিবার্য ঘটনাচক্রে অনির্দিষ্টকালের জন্য ব্যাপারটা মুলতুবি রাখতে বাধ্য হচ্ছি। সাক্ষাতে সব কথা বুঝিয়ে বলব] —সি. রায়

॥ তিন ॥



ডাকঘর থেকে বাইরে এসে ওঁর মনে হল, দু-দুটো অসঙ্গতি রয়ে গেল। এক নম্বর—যেটা উনি বলেই ফেলেছিলেন ঘোষাল মশাইকে—'অ্যাপার্টমেন্টস' কথাটার মানে অনেকগুলি ফ্ল্যাট। সেক্ষেত্রে 'দুই-এর তিন' বা 'তিনের পাঁচ' ইত্যাদি একটা নম্বর ঠিকানায় থাকার কথা, যাতে বোঝা যায় 'কয়'তলায় এবং কত নম্বর চিহ্নিত দরজা। কমলেশ সেটা উল্লেখ করেনি। কেন ? সে কি পুরো ঠিকানাটা জানাতে চায় না ? সেক্ষেত্রে গোটা ঠিকানাটাই তো তার উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত হতে পারে। যেমন হয়েছিল কল্পিত শিখা দত্তের লেখা 'নসীরাম পতিতুণ্ড সেকেন্ড বাই লেন।' দ্বিতীয় প্রশ্ন, তারাতলা রোড-এর বাসিন্দা বেহুদ্দো এতদূর এসে মধ্য কলকাতার একটি পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ অফিস থেকে টেলিগ্রাফটা করবে কেন ? অবশ্য তার অনেক অজ্ঞাত কারণ থাকতে পারে। হয়তো ওর কর্মস্থল এ-পাড়ায়। যাই হোক, ওঁকে একবার তারাতলা অঞ্চলে গিয়ে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। হয়তো 'বুনো-হাঁসের' পিছনে এ দৌড়াদৌড়ি অহেতুক। কিন্তু উপায় নেই—'শিখা দত্ত' ওর নাম না হওয়া সত্ত্বেও যে মেয়েটি ওঁকে দ-য়ে মজিয়েছে সে ওঁর ক্লায়েন্ট।

সামনেই একটা বড় ওষুধের দোকান। বাসু-সাহেব ঢুকে পড়লেন। মধ্য-দিনে তেমন ভিড় নেই। কাউন্টারের বিপরীত থেকে একজন অল্পবয়সী ডিসপেন্সিং কর্মচারী প্রশ্ন করে, বলুন স্যার ?

বাসু জানতে চান, ইপ্রাল আছে।

লোকটা নেতিবাচক মাথা নাড়ল।

—ওষুধটা কোথায় পাব বলতে পারেন ?

—আমি ওর নামই শুনিনি।

বাসু জানতে চান, আপনাদের এখানে কোনও ডাক্তারবাবু বসেন ?

—বসেন। সকালে আর সন্ধ্যায়। এখন নেই।

হঁতাশ হয়ে উনি পিছন ফিরছিলেন। কে যেন ওঁর ও-পাশ থেকে বললে,

'ইপ্রাল' কলকাতার বাজারে পাবেন না। পেটেণ্টেড ওষুধ। প্রেসক্রিপশানটা সঙ্গে আছে?

বাসু ঘুরে দাঁড়ালেন। বছর পঁয়তাল্লিশের একজন প্রৌঢ়। সাফারিস্যুট পরা। জানতে চান, আপনি নিশ্চয় ডাক্তার। বলতে পারেন, ইপ্রাল কী জাতের ওষুধ? মানে, কোন অসুখে…

—ওটা বিষ নয়!

—'বিষ নয়'! এটা বিষ, তা তো আমি বলিনি।

ডাক্তারবাবু হাসতে হাসতে বললেন, আজ্ঞে না স্যার, আপনি বলেননি, আপনার বলার কথাও নয়, ব্যারিস্টার-সাহেব! ওটা তো বলবে প্রসিকিউশান যখন আমি হতভাগার পেট চিরে বলব, 'অত্যধিক পরিমাণে কেউ একে 'ইপ্রাল' খাইয়েছে—সেটাই মৃত্যুর কারণ।'

বাসু এতক্ষণে হেসে ফেলেন। বলেন, এইবার আপনাকে চিনেছি। আপনি অটোপ্সিসার্জেন ডাক্তার অতুলকৃষ্ণ সান্যাল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কেসটা কী, স্যার?

—না, মরেনি কেউ। পুলিস একজনের মেডিসিন-ক্যাবিনেট সার্চ করে যেসব ওষুধ পেয়েছে তার মধ্যে ছিল এক শিশি 'ইপ্রাল'। সাদা সাদা ছোটো ছোটো ট্যাবলেট। ওটা কীসের ওষুধ তা জানা থাকা ভালো। তাই, জিজ্ঞাসা করছিলাম।

—'ইপ্রাল' একটা 'হিপনটিক'—এক রকমের 'ঘুম-পাড়ানিয়া'। বিদেশী ওষুধ। এখানে পাওয়া যায় না। আমরা তার বদলে 'কাম্পোজ', অ্যাটিভান, বা অন্য জাতের ওষুধ প্রেসক্রাইব করি। ইপ্রালের বৈশিষ্ট্য এই যে, ঘুমটা খুব গাঢ় হয়। কিন্তু পরদিন ঘুম ভাঙার পর কোনও 'আফটার-এফেক্ট' থাকে না। মাতালের যেমন খোঁয়াড় ভাঙতে বিলম্ব হয়, ইপ্রালে তা হয় না। ঘুম ভাঙলেই খুব ঝরঝরে লাগে। মার্কিন মুলুকে ড্রাগ-অ্যাডিক্টদের চিকিৎসায় এর ব্যাপক ব্যবহার।

—যদি কাউকে 'ইপ্রাল' এর ওভারডোজ খাওয়ানো হয়?

—ঘুম পাড়ানিয়ার ওভারডোজ-এর মতো কাণ্ড ঘটবে। তার ঘুম ভাঙবে না, আর আমার ঘুম ছুটে যাবে—

—আপনার?

—নয়? আমি তো অটোপ্সি সার্জেন। মরাকাটা ঘরে আমাকেই তো পেট চিরে বলতে হবে: ইটস এ কেস অব ওভারডোজ অব স্লিপিং ট্যাবলেটস!

—থ্যাঙ্কু ডক্টর!

—য়ু আর ওয়েলকাম। ধন্যবাদ তো আমিই দেব। পুলিসের পক্ষে সাক্ষী দিতে উঠে বরাবর আপনার ধমক খেয়েছি। আজ প্রশ্নোত্তরের সময়

আপনি কিন্তু একবারও ধমকাননি ; স্যার !

বাসু সাহেব হা হা করে হেসে ওঠেন।

ডক্টর সান্যাল নমস্কার করে বিদায় হলেন।

বাসু-সাহেব এবার দোকানের মালিকের দিকে ফিরে বলেন, একটা টেলিফোন করতে পারি।

—শিওর ! করুন, স্যার।

বোধকরি ওঁদের কথোপকথন কিছুটা শুনেছেন তিনি। টেলিফোনটা দোকানের একান্তে। নিম্নকণ্ঠে কথোপকথন করলে দোকানের আর কেউ শুনতে পাবে না। ঘড়িটা দেখলেন একবার ; বারোটা কুড়ি। তার মানে শুভ্রা দেবীর বাড়ি থেকে ফোন করার পর দু' দুটি ঘণ্টা কেটে গেছে। ইতিমধ্যে কৌশিক কোনও সূত্র আবিষ্কার করতে পেরেছে কি না জানা দরকার।

দু'বার রিঙিং টোন হতেই রানি লাইনে এলেন : হ্যালো ;

—কৌশিক কি কোনও পাত্তা পেল ? ওই লাইসেন্সটার ব্যাপারে ?

—কোন লাইসেন্স ?

—আরে বাপু, আমিই বলছি। লাইসেন্স নাম্বার : থ্রি-সেভেন-ফাইভ-নাইন-সিক্স-টু-ওয়ান !

ওঁকে কোনও ডায়েরি বা-পকেট-বুক দেখতে হল না —নম্বরগুলো পরপর ওর মস্তিষ্কে 'গ্রে সেল'-এর খাঁজে খাঁজে সাজানো। কিন্তু রানিদেবী চটজলদি তাঁর খাতা দেখে মিলিয়ে নিয়েছেন। বলেন, হ্যাঁ, পেয়েছে। লাইসেন্স হোল্ডারের নাম ডক্টর পি. সি. ব্যানার্জি—প্রতুলচন্দ্র—এম. আর. সি. পি। পাম অ্যাভিনু্য যেখানে বন্ডেল রোডে পড়েছে তার কাছাকাছি একটা নার্সিং হোম। অনেক ডাক্তার বসেন। উনিই মালিক। নাম—'সানিসাইড নার্সিং হোম'।

—এত কথা লাইসেন্সে লেখা থাকে ?

-না, থাকে না ! কিন্তু কৌশিক টেলিফোনে যখন জানায় যে, ওই যন্ত্রটার লাইসেন্সি ডাক্তার পি. সি. ব্যানার্জি, তখন সুজাতা এখানে ছিল। ঠিকানাটা নিয়ে ও তৎক্ষণাৎ একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যায়। তার ফোনও পেয়েছি। ডক্টর ব্যানার্জিকে সে ধরতে পারেনি : কিন্তু একথা জানতে পেরেছে ওই নার্সিং হোমেই মাসখানেক আগে ছন্দা বিশ্বাস চাকরি করত। বর্তমানে সে ছন্দা রায়। তার স্বামীর নামটা জানা যায়নি। তবে এটুকু জানা গেছে যে, সে অত্যন্ত বড়লোকের একমাত্র পুত্র—মানে, রিয়েল মাল্টি-মিলিয়নেয়র ধনকুবের ! ওদের ঠিকানাটা জানা যায়নি, তবে জাতীয় গ্রন্থাগারের পিছনে আলিপুর রোডে অথবা...

—অলরাইট ! অলরাইট ! তোমরা কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখেছ দেখছি। সুজাতা বা কৌশিকের ভেতর কেউ কি ফিরে এসেছে ?

—দু'জনেই এখন এখানে।

—দু'জনকেই বেরিয়ে পড়তে বল। জাতীয় গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র হিসাবে ধরে নিয়ে ম্যাপের উপর এক মাইল ব্যাসার্ধের বৃত্ত টানলে কলকাতা শহরের যতটা ভূভাগ বৃত্তের ভিতর আসবে তার মধ্যে প্রত্যেকটি ম্যারেজ-রেজিস্টার অফিসে গিয়ে খোঁজ নিতে বল; 'সাম মিস্টার রায়ের সঙ্গে মিস ছন্দা বিশ্বাসের বিবাহ রেজিস্ট্রি করা আছে কিনা—এক মাসের ভিতর।'

—ঠিক আছে, পাঠাচ্ছি। এবার আমাদেরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। পেশ করব?

—কর। প্রশ্নকর্তা কে? তুমি? না সুকৌশলী দম্পতি?

—দু' তরফই। কৌশিক জানতে চায়; শিখা দত্ত যে একশ টাকা রিটেইনার দিয়ে গিয়েছিল তার ডবল খরচ তো ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। অজ্ঞাতনামা ক্লায়েন্টের পিছনে আরও খরচ করা কি যুক্তিযুক্ত হবে?

—'অজ্ঞাতনামা' কেন হবে? ষাট বালাই! শিখা দত্তের নামে রসিদ কাটা হলেও আমার ক্লায়েন্টের নাম তো ছন্দা রায়, 'নো' বিশ্বাস!

—আচ্ছা বাপু 'অজ্ঞাতনামা' না হলেও 'অজ্ঞাতবাসিনী' তো বটে?

—দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য ফোর্থ ডাইমেনশন ঃ টাইম। আর ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যেই ওর আবাসের দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা সমেত অবস্থানও জানা যাবে। ও নিয়ে কৌশিককে চিন্তা করতে বারণ কর।...দ্বিতীয়টা কি তোমার?

—হ্যাঁ।

—ফায়ার!

—পৌনে একটা তো বাজে। তুমি লাঞ্চ খেতে আসবে না?

—না রানু। আজ আমার উপবাস।

—উপবাস! কেন? কিসের?

- আমি একটা প্রায়শ্চিত্ত করছি! আমি আমার আতঙ্কতাড়িতা ক্লায়েন্টকে দোর থেকে ফিরিয়ে দিয়েছি! লেট মি অ্যাটোন ফর ইট। তুমি খেয়ে নাও।...কী হ'ল? জবাব দিলে না যে? লাইনে আছ তো?

-- আছি! একই লাইনে আমি! তোমার পিছু পিছু। উপবাস বা প্রায়শ্চিত্ত তুমি একা করবে কেন? পাপ তো আমিও করেছি। তোমাকে আমার বলা উচিত ছিল: মেয়েটি তোমার সঙ্গে দেখা করার আগেই একটা রিটেইনার দিয়েছে—সে তোমার ক্লায়েন্ট!

—অল রাইট! অ্যাজ যু প্লিজ। সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসছি। আশা করি একসঙ্গে ইফতার করা যাবে।

—'ইফতারি' মানে?

—এক পাত্রে আহার গ্রহণ করা, সমবেতভাবে, 'রোজা' ভাঙা।

লাইন কেটে দিলেন বাসু-সাহেব! দোকানের মালিককে টেলিফোনের দাম মিটিয়ে দিতে গেলেন। সে কিছুতেই নিল না। বললে, ডাক্তার সান্যাল আপনাকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করেছেন। আপনি কে, তা আমি জানি না। কিন্তু ডক্টর সান্যালের কাছে যখন নিই না, তখন আপনার কাছেও

দিতে পারি না।

—অল রাইট! আমাকে তাহলে এক শিশি ম্যাগনাম সাইজ হরলিক্স দিতে বলুন।

তেরো নম্বর একটি দ্বিতল বাড়ি। তেরোর-এ বোধহয় একটা ফাঁকা প্লট। তারপরই একটা অর্ধসমাপ্ত প্রকাণ্ড বাড়ির কঙ্কাল। চারতলা পর্যন্ত কলমের ছড় বাঁধা হয়েছে। ঢালাই হয়েছে দুটি মাত্র ফ্লোর। একতলায় উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। কংক্রিট মিক্সিং মেশিন, লোহালক্কর, ঢালাই-এর কড়াই ছড়ানো। জনমানব-শূন্য এলাকাটা। চারদিকে বাঁশের ভারা বাঁধা। মনে হল এটাই শেষ হলে 'মা সন্তোষী অ্যাপার্টমেন্টস'-এর রূপ নেবে। সেই মর্মে একটা সাইন বোর্ড আছে। নির্মাণকারী এবং আর্কিটেক্ট-এর পরিচয় দিয়ে বিজ্ঞপ্তিও জানানো হয়েছে।

বিপরীত দিকে একটা পান-বিড়ির দোকান। বাসু-সাহেব সেখানে গিয়ে বললেন, হ্যাঁগো, এ-বাড়িতে কেউ থাকে না?

লোকটার গালে পান ঠাসা। কোনোক্রমে বললে, আজ্ঞে না! হাইকোর্টের অর্ডারে কাজ বন্ধ আছে। আজ প্রায় ছয় মাস।

—দারোয়ান টারোয়ান নেই?

—ছিল। এখন নেই। শুধু ওই দোতলায় এক বাবু একা একা থাকে।

—কী নাম সেই বাবুর? জান?

—ঘোষবাবু!

—কমলেশ ঘোষ কি?

—পুরো নাম জানি না, বাবু। ওই গেটের পাশে কলিং-বেল আছে। বাজান না? বাবু থাকলে বেরিয়ে আসবে।

বাসু-সাহেব নির্দেশমত কলবেলটা বাজালেন। বারকতক-ক্রিরিং ক্রিরিং করার পর দ্বিতলের খোলা বারান্দায় একটি মূর্তির আবির্ভাব ঘটল। টি শার্ট গায়ে, লুঙ্গি পরা। বছর চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, কাকে চাই?

বাসু ঊর্ধ্বমুখে বললেন, কমলেশ ঘোষকে।

—কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

—তার আগে অনুগ্রহ করে বলুন, কমলেশ ঘোষ কি আছেন?

—তার আগে অনুগ্রহ করে বলুন, কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

—ছন্দা রায়ের কাছ থেকে।

লোকটা একটু থমকে গেল। বললে, আপনি তার কে হন?

—এখান থেকেই চিৎকার করে নিজের এবং ছন্দা রায়ের বংশ পরিচয় দিতে থাকব?

—ও আচ্ছা দাঁড়ান। নিচে গিয়ে দোর খুলে দিচ্ছি।

দ্বিতলবাসীর মুণ্ড অপসৃত হল। একটু পরে নিচে নেমে এসে দরজা

খুলে দিল। কিন্তু দু' হাতে দরজা আগলে বললে, এবার বলুন ?

—রাস্তায় দাঁড়িয়েই ?

—ক্ষতি কী ?

—ক্ষতি আমার নয় কমলেশবাবু, ক্ষতি আপনার। আপনি ওর সঙ্গে আজ সন্ধ্যায় যে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা করেছেন সেটার বিষয়েই আলোচনা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে কথা বলা যায় না। আপনি ইন্টারেস্টেড না হলে আমি বরং এখান থেকেই ফিরে যাই। আফটার অল, আমি আমার 'ফি' ঠিকই পাব। আর্থিক লোকসানটা শুধু আপনারই।

লোকটা একদৃষ্টে বাসু-সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর বললে, আপনার নামটা জানতে পারি ?

—অনায়াসে। আপনি স্বীকার না করলেও আমি যখন আপনার নাম জানি, তখন আপনিই বা আমার নাম জানবেন না কেন ? আমার নাম প্রসন্নকুমার বাসু।

—আপনি ব্যারিস্টার ?

—তা বলতে পারেন।

—অ ! আচ্ছা আসুন আপনি।

দু'জনে ভিতরে ঢুকলেন। ইয়েল-লক দরজা আপনি বন্ধ হয়ে গেল। সামনেই সিঁড়ি। ঢালাই হয়েছে, রেলিং নেই। ফিনিশিং হয়নি। ডগ-লেগেড স্টেয়ার। মোড় ঘুরে দ্বিতলে পৌঁছালেন। দ্বিতলে খাড়া খাড়া স্তম্ভ, যেন আগ্রা দুর্গের দেওয়ানি আম। শুধু একটা বড়ো হল-কামরার চারদিকে দেওয়াল তোলা। এক কোণায় শুধু সেই ঘরের বাইরের দিকের জানলায় গ্রিল বসানো। ঘরে চৌকি, বিছানা পাতা। টেবিল চেয়ার কিছু। টেবিলে টেলিফোন, কিছু নকশা ছড়ানো। এক পাশে নানান গৃহ-নির্মাণের সরঞ্জাম স্তূপাকার করে রাখা। স্যানিটারি পাইপ, কমোড, ওয়াশ-বেসিন। গ্যালভানাইজড জলের পাইপ। আরও কীসব সরঞ্জাম বড়ে বড়ো কেটে বাক্সে বন্দী করা। বাসুর দিকে একটি চেয়ার বাড়িয়ে দিয়ে লোকটা তার মুখোমুখি বসল। বাসু জানতে চাইলে, হাইকোর্টের অর্ডারে নাকি এ বাড়ির নির্মাণ-কাজ বন্ধ আছে ?

—হ্যাঁ, মাস-দুয়েক। কর্পোরেশনের মতে বেআইনি কাজ হয়েছে।

—আপনি কি কেয়ার-টেকার, মিস্টার ঘোষ ?

—সর্ট অফ ! এক্সটেনশনার আমার বন্ধু। আমি এখানে থাকায় তাকে দারোয়ান রাখতে হয় না। আমিই দেখভাল করি।

—যদি দল বেঁধে ডাকাত দল আসে ?

কমলেশ টেবিলের টানা-ড্রয়ার খুলে একটা কালোমতো যন্ত্র বার করে দেখাল। বললে, আপনি যে বিষয়ে আলোচনা করতে এসেছেন সে কথাই বলুন ? ছন্দা রায়ের কী প্রস্তাবের কথা বলতে চান ?

—আমি তো বলতে আসিনি কমলেশবাবু, শুনতে এসেছি।

—এই যে বললেন, ছন্দা রায়ের কাছ থেকে এসেছেন ?

—সে তো বটেই। ওই পরিচয় না দিলে আপনি দোর-গোড়া থেকেই আমায় বিদায় দিতেন, তাই নয় ? কিন্তু আমি তো বলিনি যে, তার কাছ থেকে কোনও প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।.

—ও ! তার মানে আপনার কিছু বলার নেই ?

—সেটাও ঠিক নয়। আমার কিছু বলার আছে। এক নম্বর কথা, ছন্দা রায় মেয়েটি খুব ভালো। ওর জীবনে কোনও অশান্তি বা বিড়ম্বনা আসে, এটা আমি চাই না।

—আমিই কী সেটা চাইছি ? আমি তার শত্রুপক্ষ নই।

—বটেই তো ! আইনত আপনিই যখন ছন্দা রায়ের স্বামী।

লোকটা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, বুঝেছি। কাজটা ছন্দা ভালো করেনি। আপনাকে সব কথা বলে ফেলা…

—ফর য়োর ইনফরমেশান, ছন্দা রায় আদৌ বলেনি যে, 'কমলেশ ঘোষ' তার প্রথম পক্ষের স্বামী।

—তাহলে কে বলেছে সে কথা ?

—আপনি। এইমাত্র ! ছন্দা আমার কাছে এসেছিল তার বান্ধবীর জন্য কিছু লিগাল অ্যাডভাইস নিতে। সে একবারও বলেনি যে, তার প্রথম পক্ষের স্বামী সাত বছর নিরুদ্দেশ ছিল। ওটা আমার আন্দাজ। আপনি এইমাত্র সেটা কনফার্ম করলেন।

লোকটা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকল পুরো একটা মিনিট। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, ছন্দা যদি আপনার মাধ্যমে কোনও প্রস্তাব না পাঠিয়ে থাকে তাহলে আপনি অনুগ্রহ করে যেতে পারেন।

বাসু জবাব দেবার আগেই কলিং-বেলটা বেজে উঠল। একবার দুবার।

কমলেশ জানতে চায়, আপনি কি একা এসেছেন ? না গাড়িতে আর কেউ আছে ?

—আমি একাই এসেছি। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়েছি।

—তাহলে কলিং-বেল বাজাচ্ছে কে ?

—আপনার কোনও সাক্ষাৎপ্রার্থী। আমি কেমন করে জানব ?

কমলেশ টানা-ড্রয়ার থেকে রিভলবারটা হিপ-পকেটে ভরে নিল। বলল, আপনাকে একটু কষ্ট দেব, মিস্টার বাসু। আপনাকে এখানে একা ছেড়ে রেখে আমি যেতে পারব না। আপনিও আসুন আমার সঙ্গে।

—অল রাইট। চলুন।

বাসুকে অগ্রবর্তী করে কমলেশ নিচে নেমে এল। দ্বার খুলে দিল। বাইরে একজন ডাক-পিয়ন। বললে : টেলিগ্রাম ! কমলেশ ঘোষ ? আছেন ?

—আমারই নাম। দাও।

টেলিগ্রাম-পিয়ন খাতায় সই নিয়ে টেলিগ্রামটা হস্তান্তরিত করে চলে গেল। কমলেশ খামটা ছিঁড়ে টেলিগ্রামটা পড়ল। মুখ তুলে বলল, ছন্দারই

টেলিগ্রাম। কিন্তু সে তো আপনার আসার সম্ভাবনার কথা কিছু লেখেনি।

—ন্যাচারালি। সে জানে না যে, আমি এখানে আসছি। ইনফ্যাক্ট, সে আপনার নাম বা ঠিকানা কোনওটাই আমাকে জানায়নি।

—তাহলে আপনি কেন এসেছেন আমার কাছে? শুধু জানাতে যে, ছন্দা একটি লক্ষ্মী মেয়ে, অথবা তার বান্ধবীর স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে?

—না, মিস্টার ঘোষ। আমি এসেছি ছন্দার বর্তমান ঠিকানার সন্ধানে। তার সঙ্গে যোগাযোগ করাটা জরুরি দরকার; কিন্তু সে কোথায় থাকে তা আমি জানি না।

—এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? ছন্দা আপনার ক্লায়েন্ট, অথচ আপনি তার ঠিকানা জানেন না?

বাসু জবাব দেবার আগেই দ্বিতলে টেলিফোনটা বেজে উঠল। কমলেশ বলল, আপনার বক্তব্য বলা নিশ্চয় শেষ হয়ে গেছে। এবার আসুন আপনি।

—না, মিস্টার ঘোষ। আমার আরও কিছুটা বলার আছে। কিছুটা শোনারও আছে। আপনি বরং টেলিফোনের ঝামেলাটা প্রথমে মিটিয়ে নিন।

—অল রাইট। তাহলে আপনি আমার সামনে সামনে চলুন।

—কোন প্রয়োজন নেই, কমলেশবাবু। আপনি সার্চ করে দেখে নিতে পারেন আমি নিরস্ত্র। আপনার চেয়ে বয়সে আমি না-হোক পঁচিশ বছরের বড়ো। আপনার হাতে রিভলবার। অত ভয় পাচ্ছেন কেন?

—ভয় আমি পাইনি।

—পেয়েছেন। অন্য কারণে। গিল্ট কনশাশনেস। যা হোক। চলুন-উপরে চলুন। আচ্ছা আমিই না হয় আগে আগে যাচ্ছি।

দুজনে সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতলে উঠে আসেন।

টেলিফোনটা তখনও একনাগাড়ে বেজে চলেছে: ক্রিরিং…ক্রিরিং

॥ চার ॥



বাসু-সাহেব তাঁর চেয়ারে যতক্ষণ না স্থির হয়ে বসলেন ততক্ষণ কমলেশ টেলিফোনটাকে বাজতে দিল। তারপর তুলে নিল যন্ত্রটা। নিজে বসল না। যন্ত্রটার কথা-মুখে—না, 'হ্যালো' ও বলল না, নিজের নামও ঘোষণা করল না—নিজের টেলিফোন নম্বরটা ঘোষণা করল শুধু।

ওর স্থিরদৃষ্টি বাসু-সাহেবের দিকে। নজর হল, তিনি চোখ দুটি বন্ধ করেছেন। আন্দাজ করতে পারল না হেতুটা। বাসু-সাহেব তখন তাঁর মস্তিষ্কের একটি ফোকরে পর্যায়ক্রমে ছয়টি গাণিতিক সংখ্যা গুছিয়ে রাখতে ব্যস্ত।

ওপক্ষের কথা শুনে নিয়ে কমলেশ বললে, এ-কথা তো টেলিগ্রামেই বলেছ

তুমি, তাহলে কখন আসছ ?…কী ? ন্যাকা সাজবার চেষ্টা কোরো না, তুমি ছাড়া কে এই টেলিগ্রামখানা পাঠাবে ?…ঠিক আছে, পরে কথা হবে…না. না, বললাম তো এখন আমি ব্যস্ত আছি। আমার ঘরে ভিজিটার আছে…কী ? …সেটা তো তুমি জানই…আরাম সরি…

বাসু-সাহেব মাঝপথেই উঠে দাঁড়ান। বলেন, লাইনটা ছেড়ো না। ওর সঙ্গে আমার কথা আছে…

কমলেশ গর্জে ওঠে ঃ সিট ডাউন !

নিঃশব্দে টেলিফোনটা রিসিভারে বসিয়ে দেয়।

বাসু-সাহেব ধীরে ধীরে বসে পড়েন নিজের চেয়ারে।

কমলেশ বলে, বলুন, আর কী বলতে চান ?

ছন্দাই ফোন করছিল তো ?

অবান্তর কথা বলবেন না, মিস্টার বাসু। আর আমার প্রাইভেট লাইফে অহেতুক নাক গলাতেও আসবেন না। আপনার যদি কিছু বলার থাকে বলে ফেলুন ; না থাকে বিদায় হন—

আমার অনেক কিছুই জানবার আছে, মিস্টার ঘোষ।

তাহলে শুরু করুন। আমাদের দুজনেরই সময়ের দাম আছে।

—এক নম্বর প্রশ্ন : আপনার উপাধি 'ঘোষ', অথচ আইনত যিনি আপনার 'স্ত্রী', তাঁর উপাধি 'রায়'—ইতিপূর্বে ছিল 'বিশ্বাস'। এটা কেমন করে হল ?

—সেটা আপনার ক্লায়েন্টের কাছ থেকে জেনে নেবেন। আর কিছু ?

—গত সাত বছর আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করেননি কেন ? তাকে নতুন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার সুযোগ দিতে ?

—লুক হিয়ার, মিস্টার বাসু ! আমি কিন্তু কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নেই যে, আপনি ক্রমাগত প্রশ্ন করে যাবেন, আর আমি জবাব দিয়ে যাব। এটা আপনি আশা করেন কোন আক্কেলে ? আমার একটিমাত্র কথা বলার আছে ঃ আমি বেআইনি কাজ কিছু করছি না। ইন্ডিয়ান পিনাল কোডের কোনও ধারাই আমি লঙ্ঘন করতে চাইছি না। ফলে আপনার কিছু করণীয় নেই। আপনি ফুটুন !

—'ফুটুন ?'

—মানে, মানে-মানে কেটে পড়ুন।

—আই সী ! আপনার ওই শব্দপ্রয়োগে—ওই 'ফুটুন' কথাটাতে আমার বাকি যেটুকু জানবার ছিল, তা জানা হয়ে গেছে। 'ফোটো' কথাটা যে সম্মানার্থে-আপনাদের ক্লাসের মানুষ 'ফুটুন' বলে থাকেন, তা আমার ঠিক জানা ছিল না !

উঠে দাঁড়ান উনি। দ্বারের দিকে দু-একপদ গিয়ে ফিরে দাঁড়ান। বলেন, ছন্দা তোমার ঠিকানা আমাকে জানায়নি কমলেশ, আমি নিজেই তা খুঁজে বার করেছি। আর,…ও হ্যাঁ, ও টেলিগ্রামটাও ছন্দা রায় তোমাকে পাঠায়নি ওটাও আমিই পাঠিয়েছি…

—কোন্ টেলিগ্রাম ?

—ওই যেটা আমার উপস্থিতিতে তুমি ডেলিভারি নিলে 'ইন্সট্যান্ট ডেভেলপমেন্ট নেসেসিটেট্‌স্ ইন্‌ডেফিনিট পোস্টপোনমেন্ট' এট্‌সেটরা এটসেটরা···

কমলেশ বুক পকেট থেকে টেলিগ্রামখানা বার করে পড়ে দেখল। ওর চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে গেল। বললে, ইজ দ্যাট সো ? তা আপনিই বা আমাকে অমন একখানা টেলিগ্রাম পাঠালেন কেন ? সি. রায়ের নাম ভাঁড়িয়ে ?

বাসু বললেন, জবাবে আমিও তো ওই কথা বলতে পারি, কমলেশ। ওই যেটা তুমি এখন আমাকে শোনালে ? পারি না ?

—কী কথা ?

—'লুক হিয়ার, মিস্টার ঘোষ। আমি কিন্তু কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নেই যে, আপনি ক্রমাগত প্রশ্ন করে যাবেন আর আমি জবাব দিয়ে যাব।'

কমলেশ হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়েই থাকে।

বাসু বলেন, হয় আমরা পরস্পরের কাছে প্রশ্ন পেশ করব এবং জবাব শুনব, অথবা তুমি তাতে রাজি না থাকলে, আমি আপাতত 'ফুটব' এবং পরে এমন ব্যবস্থা করব, যাতে তুমি ফুটন্ত ডেকচিতে 'ফুটবে'।

কমলেশ শান্ত স্বরে বললে, বসুন। অলরাইট! আমরা একের পর একজন প্রশ্ন করব এবং অপরপক্ষের জবাব শুনব। একবার আমি, একবার আপনি। পর্যায়ক্রমে। আপাতত বলুন, আমার শেষ প্রশ্নটার কী জবাব ?

—তোমার শেষ প্রশ্নটা ছিল, সি. রায়ের নাম ভাঁড়িয়ে ? আমার জবাব হচ্ছে ; সি. রায় আমার ক্লায়েন্ট! সলিসিটার ক্লায়েন্টের তরফে চিঠি লিখলে বা টেলিগ্রাম করলে আইনত তাকে নাম ভাঁড়ানো বলে না।

—সে কথা আমি বলতে চাইনি, আমার প্রশ্ন···

—আই নো, আই নো! কিন্তু শেষ প্রশ্নটা তোমার ওই রকমই ছিল। আমি তার জবাব দিয়েছি। তোমার সার্ভিস নেট-এ আটকে গেছে। এবার আমার সার্ভিস করার কথা। তুমি রিটার্ন দেবে। তাই না ? শর্ত হয়েছে দুপক্ষই পর পর প্রশ্ন করব। সুতরাং এবার বলো ঃ কেন তুমি সাত বছর আত্মগোপন করে প্রতীক্ষা করেছিলে ?

—আমি··· আমি আত্মগোপন করেছিলাম না মোটেই। বাস-অ্যাকসিডেন্ট-এ আমার স্মৃতিভ্রংশ হয়ে যায়,—ওই যাকে বলে অ্যামনেশিয়া—হঠাৎ আমার পূর্বস্মৃতি ফিরে এসেছে!

বাসু হাসলেন। বললেন, সুন্দর জবাবটা দিয়েছ, কমলেশ। তোমার একটিই ভুল হয়েছে—কর্তৃবাচক পদটির দ্বিত্বপ্রয়োগ! বুঝলে না ? কৈফিয়তটা তোমার সড়গড় হয়নি। তোমার বলা উচিত ছিল, 'আমি আত্মগোপন করেছিলাম না মোটেই।'

—তাই তো বলেছি আমি!

—না, তা বলোনি। বলেছ ঃ 'আমি···আমি আত্মগোপন করেছিলাম না মোটেই।' প্রথম 'আমি'র পর যে সামান্য বিরতি দিয়ে দ্বিতীয়বার 'আমি'

বললে, ওটাই প্রশ্নকর্তাকে বুঝিয়ে দিল ঃ এটা মিথ্যা অজুহাত। সে যা হোক, এবার তোমার প্রশ্ন করার পালা। সার্ভ করো।

—আপনার ক্লায়েন্ট…

—সরি, ফর ইণ্টারাপ্টিং য়ু। এই পর্যায়ে আমার পক্ষে জানিয়ে রাখা শোভন যে, আমার ক্লায়েন্ট 'ছন্দা' নয়, তার স্বামী মিঃ রায়। ইয়েস, বলো কী জানতে চাইছ?

—আপনি তো এতক্ষণ বলেননি যে, 'ছন্দা' নয়, 'ত্রিদিবনারায়ণ'ই আপনার ক্লায়েন্ট। কেন?

—তার হেতু তুমি তো এতক্ষণ আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে স্বীকৃত হচ্ছিলে না! দোর থেকেই আমাকে 'ফোটাতে' চাইছিলে। এখন শর্ত হয়েছে দুজনেই প্রশ্ন করব এবং উত্তর শুনব, তাই।

—সেক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন—

—সরি, কমলেশ! এবারও তোমার সার্ভিস নেটে আটকে গেছে! ডাবল্ ফল্ট্! তোমার প্রশ্ন তুমি পেশ করেছ এবং আমি তার জবাব দিয়েছি। এবার আমার প্রশ্ন করার পালা ঃ তুমি কি জান যে, ত্রিদিবনারায়ণ রায়ও জানতে পেরেছে যে, তার স্ত্রীর প্রথমপক্ষের স্বামী জীবিত এবং সে ব্ল্যাকমেলিং-এর ধান্ধায় আছে?

কমলেশ স্থির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর প্রায় আত্মগতভাবে বললে, ইম্পসিব্‌ল্!

—কোন্‌টা ইম্পসিব্‌ল্? ত্রিদিবনারায়ণ জানে না ছন্দার প্রথম স্বামী জীবিত থাকার তথ্যটা? না কি ব্ল্যাকমেলিং করবার কথাটা?

—কে ব্ল্যাকমেলিং করতে চাইছে? সে প্রশ্ন তো এখনও ওঠেনি?

—না, ত্রিদিবের বিশ্বাস তার স্ত্রীকে ব্ল্যাকমেলিং করতে চাইছে একজন তৃতীয়পক্ষ—একজন প্রফেশনাল ব্ল্যাকমেলার—যে, ঘটনাচক্রে জানতে পেরেছে ধনকুবের ত্রিদিবনারায়ণের স্ত্রী অন্যপূর্বা!

কমলেশের বোধকরি গুলিয়ে গেল খেলার আইনটা। এক-একবার সার্ভ করার কথা। কে কাকে প্রশ্ন করছে আর কে কাকে জবাব দিচ্ছে তার হিসাবটার কথা তার মনে রইল না।

কমলেশ বললে, তৃতীয়পক্ষ! তা হতেই পারে না। তৃতীয়পক্ষ কোথা থেকে আসবে? আর ত্রিদিব এমন গবেট…

—না, কমলেশ! তুমি ত্রিদিবকে যতটা গবেট ভাবছ, ততটা সে নয়!

—কেন? তার 'অতিবুদ্ধির' কী পরিচয় পেয়েছেন আপনি?

—তা পেয়েছি বইকি কিছুটা। তার সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়নি যে, সে আলালের ঘরের দুলাল।

—তাহলে বলব, মানুষ চেনার ক্ষমতা আপনার আদৌ নেই!

—কিন্তু এ কথা তো ঠিক—একটু আত্মশ্লাঘা হয়ে যাচ্ছে—ত্রিদিব খুঁজে খুঁজে জব্বর উকিলকেই কেস্‌টা দিয়েছে। একটা ফেরেব্বাজ টাউটের পাল্লায়

পড়ে রক্তচোষা বাদুড়ের খপ্পড়ে পড়েনি--

কমলেশ বাধা দিয়ে বললে, তার কারণ অন্য কিছুও হতে—

ওকে বাধা দিয়ে বাসু বলে ওঠেন, তা অবশ্য হতে পারে, মানে তুমি যা বলছ···

—আমি আবার কী বললাম ?

—অর্থাৎ ত্রিদিব আমাকে নিজে নির্বাচন করেনি। সে ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল বটে। কিন্তু আমাকে নির্বাচন করেছেন তার স্বনামধন্য পিতৃদেব।

—আমি মোটেই সে কথা বলিনি। ত্রিবিক্রমনারায়ণ কিছুই জানেন না এখনও।

—তুমি বলতে চাও যে, ত্রিদিব যে একটি হাসপাতালের নার্সকে বেমক্কা বিয়ে করে বসে আছে সে খবরটাও ধনকুবের ত্রিবিক্রমনারায়ণ রায় জানেন না।

হঠাৎ কী খেয়াল হয় কমলেশের। সে আচমকা উঠে দাড়ায়। বলে, আপনি ক্রমাগত আমার পেট থেকে কথা বের করে নিচ্ছেন। অথচ নিজে থেকে কিছুই বলছেন না।

—আমিও তো তোমাকে বলছি, কমলেশ। বলছি, সাবধান হও।

—সাবধান হব ! কেন ? কী করেছি আমি ?

—সেটা তুমিও জান, আমিও জানি। সেটা আলোচনা না করা দুপক্ষেরই মঙ্গল। তোমার সঙ্গে আমার যেমন কোনও দোস্তি নেই, তেমনি কোনও শত্রুতাও নেই। আমি শুধু আমার ক্লায়েন্টের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আর সেটা যদি বিনা রক্তপাতে হয়···

—'বিনা রক্তপাতে' মানে ?

—তুমি তো খোকাটি নও, কমলেশ! ত্রিবিক্রমনারায়ণ তাঁর পারিবারিক সুনাম রক্ষার জন্যে কতদূর যেতে পারেন···

—আপনি কি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছেন ?

—আমার স্বার্থ ?

—আপনার ব্যক্তিগত নয়, কিন্তু আপনার ক্লায়েন্টের স্বার্থ জড়িত আছে বইকি।

— তার মানে ধনকুবের ত্রিবিক্রমনারায়ণের পারিবারিক সুনাম নষ্ট করতে তুমি বদ্ধ পরিকর ?

—তেমন কথা আমি আদৌ বলিনি।

—বলনি ; ইঙ্গিত করেছ, যদি তোমার স্ত্রী টাকাটা না মিটিয়ে দেয়।

দুর্ভাগ্য ! নিতান্ত দুর্ভাগ্য ! এই মুহূর্তে আবার বেজে উঠল টেলিফোনটা।

এখানে আরগ্যাস্ট সাক্ষীকে পেড়ে ফেলাই ওঁর পেশা ও নেশা। সেই কায়দাতে শুধো কাছ থেকে আদায় করেছিলেন ওঁর ক্লায়েন্টের নাম। এখানেও সেই একই কায়দায় কমলেশের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন তাঁর ক্লায়েন্টের স্বামী ও

শ্বশুরের নাম। কথাবার্তা আর একটু চালাতে পারলে ছন্দা রায়ের ঠিকানা অথবা টেলিফোন নাম্বারটা ঠিক সংগ্রহ করা যেত। অথচ ওই মুহূর্তেই ক্রিরিং-ক্রিরিং করে বেজে উঠল টেলিফোনটা। যেন সম্মোহনের একটা ঘোর থেকে জেগে উঠল কমলেশ। যন্ত্রটা তুলে নিয়ে এবার আর নাম্বার বলল না, বলল—

কমল বলছি···বলো ? ···না, ওয়েট। একটু লাইনটা ধরো···

যন্ত্রটা নামিয়ে রাখল টেবিলে। বাসুসাহেবের দিকে ফিরে শান্ত স্বরে বললে, প্লিজ মিস্টার বাসু! এবার আসুন আপনি।

—ছন্দাই আবার ফোন করছে ?

গর্জে উঠল কমলেশ, দ্যাটস্ নান্ অব ইয়োর বিজনেস! প্লিজ গেট আউট!

বাসু উঠে দাঁড়ালেন। শান্ত স্বরে বললেন, তুমি অহেতুক রাগারাগি করছ কেন, কমলেশ ? আমি তো তোমার শত্রুপক্ষ নই!

কমলেশ হিপপকেট থেকে তার আত্মরক্ষার অস্ত্রটা বার করে বলল, লুক হিয়ার মিস্টার বাসু। আমি আপনার ক্লায়েন্টের মতো আলালের ঘরের দুলালও নই, গবেটও নই! ফ্যান্টিক-পাইলের মাংকিটার দুম-দুম শব্দ শুনতে পাচ্ছেন ?

শেষ প্রশ্নটা আপাত-অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু তার মর্মগ্রহণে অসুবিধা হল না বাসু-সাহেবের। অদূরেই কোনও বাড়িতে পাইল-বনিয়াদ্ বানানোর জন্য সাত-সেকেন্ড পর পর একটা 'দুম্' শব্দ হচ্ছে। সেটার কথাই বলছে। কমলেশ সেই অপ্রাসঙ্গিক কথাটাকে অর্থবহ করে তুলল তার পরবর্তী কথায় : ঠিক ওই শব্দটার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ফায়ার করলে ত্রিসীমানায় কেউ বুঝতে পারবে না, বাসু-সাহেব তার মানবলীলা এই অসমাপ্ত প্রাসাদের ভিতর সংবরণ করলেন। আর বিলিভ ইট আর নট—এ বাড়ির পিছনে প্লিন্থ ভরাট করানোর জন্য বিরাট বড়ো বড়ো গর্ত খোঁড়া আছে। লাশ পাচার করতে আমার কোনও অসুবিধা হবে না।

বাসু বলে ওঠেন, এসব কী বলছ, কমলেশ ?

মারণযন্ত্রটা উঁচু করে জবাবে ও বলল, আমি তিন গুণব। তার মধ্যে আপনি যদি সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু না করেন···আই মিন, না 'ফোটেন'···

—অলরাইট, অলরাইট! ওটা নামিয়ে রাখো···ওটা লোডেড···

ধীরে পায়ে উনি সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলেছেন। কমল দেখা গেল অত্যন্ত সাবধানী। বাসু-সাহেবের পিছনে পিছনে সে নিজেও নেমে এল নিচে। দরজা খুলে বৃদ্ধকে আক্ষরিক অর্থে পথে নামিয়ে ইয়েল-লক দরজা বন্ধ করে দিল। বাসু ঘড়ি দেখলেন। অনেক বেলা হয়ে গেছে। রাস্তা দিয়ে কিছু প্রাইভেট-কার যাতায়াত করছে বটে, খালি ট্যাক্সির কোনও চিহ্নমাত্র নেই। কী করবেন স্থির করতে গিয়ে প্রতিবর্তী প্রেরণায় ডান হাতটা চলে গেল পকেটে, পাইপ-পাউচ-এর সন্ধানে। দুর্ভাগ্য সর্বদিকেই। অনেকক্ষণ খচর্-খচর্ করেও

লাইটারটা জ্বালাতে পারলেন না। সম্ভবত জ্বালানি ফুরিয়েছে। রি-ফিল করতে হবে। আপাতত সমাধান : একটি দেশলাই খরিদ করা। নজর গেল গলি রাস্তার ওপারে—যে পান-বিড়ির দোকানে সংবাদ নিয়েছিলেন প্রথমে। লোকটার গালে এখনও পান-ঠাসা। দোকানের সামনে একটি মাত্র খদ্দের। মটোর সাইকেলে বসে কী যেন বলছে। লোকটার মাথায় হেলমেট, চোখে সানগ্লাস—চেনা মুশকিল। বাসু গুটি গুটি সেদিকপানে এগিয়ে গেলেন।

পানওয়ালা তখন বলছে, আজ্ঞে না বাবু, আপনি ভুল ঠিকানায় এসেছেন। এই গলিতে আমি হাফ-প্যান্ট পরে মার্বেল খেলেছি, এ পাড়ার সব্বাইকে চিনি। 'দত্ত-মজুমদার' নামে কেউ এ গলিতে থাকেন না।

বাসু এসে দাঁড়ালেন। মোটর-বাইকের আরোহীর বয়স সাতাশ-আঠাশ। নিম্নাঙ্গে জীন্‌স্‌, ঊর্ধ্বাঙ্গে উইন্ড-চিটার। অত্যন্ত বলিষ্ঠগঠন যুবাপুরুষ। বাসু-সাহেবকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে তাঁকেই প্রশ্ন করে, আপনি কি এপাড়ায় থাকেন, দাদু ?

বাসু বললেন, না দাদু, থাকি না। তবে অনেক অনেক দত্ত মজুমদারকে চিনি। কেউ এ পাড়ার, কেউ বে-পাড়ায়। বাই এনি চান্স, তুমি কি কমলেশ দত্ত মজুমদারকে খুঁজছ ?

লোকটা পকেট থেকে একটি সুদৃশ্য সিগ্রেট-কেস বার করে ঠোঁটে একটা সিগ্রেট চেপে ধরে লাইটার জ্বালিয়ে সেটাকে ধরাল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, কমলেশ নয়, কমলচন্দ্র দত্ত মজুমদার…

—বাসু হাত বাড়িয়ে ওর কাছ থেকে লাইটারটা চেয়ে নিয়ে নিজের পাইপটা ধরিয়ে বললেন, সরি। তাহলে সে অন্য কমল। আমি বলছিলাম কুলীন-কমলের কথা।

ছেলেটি উৎসাহ দেখাল, কী কমল ? 'কুলীন' কমল মানে ?

—কুলীনরা সেকালে অনেক অনেক বিয়ে করত শোনোনি ? আমি যে কমল-এর কথা বলছি সে ছিল তেমনি বিবাহ-বিশারদ কমল। কমলচন্দ্র নয়, কমলেশ…

ছেলেটা তার বাহনকে স্ট্যান্ডের উপর দাঁড় করায়। ঘনিয়ে এসে বলে, আপনি যার কথা বলছেন, আমিও বোধহয় তার কথাই বলছি…

—বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ, রোগা, মুখে বসন্তের দাগ ?

—এগ্‌জ্যাক্টলি। কোথায় থাকে জানেন ?

—জানি। এ পাড়ায় নয়।

পানওয়ালা ওপরপড়া হয়ে বলে ওঠে, দেখলেন ? এ পাড়ার নাড়ি-নক্ষত্র আমার নখদর্পণে।

ছেলেটি বলে, তবে কোথায় ?

বাসু বললেন, এস, ওই দোকানে গিয়ে একটু চা পান করা যাক। তোমার মটোর-সাইকেলটা এখানেই থাক।…কী বল ?

শেষ প্রশ্নটা পান-বিড়ি-ওয়ালাকে। সে স্বীকৃত হল।

চায়ের দোকানে দূরতমপ্রান্তে দুজনে গিয়ে বসলেন। এই পড়ন্ত বেলায় আর কোনও খদ্দের ছিল না। দোকানদারও ঝিমোচ্ছিল। ঢুলু-ঢুলু চোখে জানতে চায়, কী দেব, স্যার ?

—দু-কাপ চা।

—ঠিক আছে, বসুন। একটু দেরি হবে কিন্তু। আঁচটা নেমে গেছে।

বাসু বললেন, আমাদের তাড়া নেই।

ছেলেটি বসল দেয়াল-ঘেঁষে। রাস্তার দিকে মুখ করে, যাতে বাহনটাকে নজরে রাখা যায়।

বাসু জানতে চান, কমলকে খুঁজছ কেন ? আগে সেটাই বল ?

—সে অনেক কথা, দাদু! আপনি তার বর্তমান ঠিকানাটা জানেন ?

—জানি। তোমাকে জানাতে রাজি আছি। কিন্তু তার আগে আমার কয়েকটি কৌতূহল মেটাতে হবে। প্রথম প্রশ্ন : তুমি যাকে খুঁজছ সেই কমল যাকে ফাঁসিয়েছে সে মেয়েটি তোমার কে ?

ছেলেটি একটু অবাক হল। বলল, আপনি যে গণৎকার ঠাকুরের মতো ভেলকি শুরু করলেন, দাদু! কেমন করে জানলেন যে, আমি যে কমলকে খুঁজছি সে একটি মহিলাকে ফাঁসিয়েছে ?

বাসু বললেন. দেখ ভাই। আমি খোলা কথার মানুষ। এভাবে উলটো-পালটা প্রশ্নোত্তর করলে আমার চলবে না। তুমি যদি আমার সাহায্য চাও তাহলে আমাকে সাহায্যও করতে হবে। তুমি না চাও কথোপকথন বন্ধ করে আমরা দু-জনেই যে যার বাড়ি পানে হাঁটা ধরতে পারি। আর যদি আমার মাধ্যমে কমলের বর্তমান ঠিকানাটা জানতে চাও···

ছেলেটি বাধা দিয়ে বলে, বুঝেছি, বুঝেছি। বলুন, কী জানতে চান ?

বাসু পকেট থেকে তাঁর নামাঙ্কিত একটি কার্ড ওর সামনে টেবিলে রেখে বলেন. প্রথম প্রশ্ন, তোমার নাম ও ঠিকানা।

ছেলেটা ওঁর কার্ডখানার দিকে তাকিয়েও দেখল না। ফেরত দেবার জন্য বাড়িয়ে ধরে বললে, মাপ করবেন, দাদু, আমি তে-তাস খেলার আসরে প্রথমে তিন ডীল ব্লাইন্ড খেলি।

বাসু নির্বিবাদে ওঁর নিজের নামাঙ্কিত কার্ডখানি তুলে নিয়ে বললেন, তাহলে ওই প্রশ্নটার জবাব দাও, সে মেয়েটিকে কমল ফাঁসিয়েছে সে তোমার কে হন ?

—আমার ক্লায়েন্ট।

—যেহেতু এটা সেকেন্ড ডীল তাই বোধহয় আমার প্রশ্নটা করা সমীচীন হবে না—মেয়েটি তোমার ক্লায়েন্ট হল কোন সুবাদে ডাক্তারি, ওকালতি, ঘটকালি···

—আজ্ঞে না, ওর একটাও নয়। আমি কমিশন নিয়ে কাযোদ্ধার করি। আমার ক্লায়েন্টের বিশ হাজার টাকা মেরে দিয়ে ওই হারামজাদা গা-ঢাকা দিয়েছে। টাকাটা উদ্ধার করতে পারলে আমি কমিশন পাব টোয়েন্টি-ফাইভ

বাইরে যায়, তাহলে কখন গেল, কখন ফিরল লিখে রেখো, কেমন ?

—একটা কথা বলুন, স্যার ? লোকটা কি মস্তান পার্টির ? মানে রাজনৈতিক দাদাদের পোষা গুন্ডা ? পুলিশের সঙ্গে আঁতাত রেখে···

—না, বটুক, সে ভয় নেই ! তবে হ্যাঁ, লোকটা আঁধারের কারবারিই ।

—তাহলে স্যার, আমি ছা-পোষা মানুষ···

— 'ছা' আবার এল কোথা থেকে ? এই যে বললে, দোতলার ঘরে তোমরা মাত্র দু-জন থাক ? তুমি আর তোমার স্ত্রী ?

—একটু রেখে-ঢেকে বলেছিলুম আর কী। দুই নয়, সওয়া দুই ! আমার স্ত্রী—মানে—আর মাস ছয়েক—

—বুঝেছি। না, লোকটার সঙ্গে সংঘর্ষে যেয়ো না। দূর থেকে নজর রেখো শুধু। তোমার স্ত্রীর পিছনে খরচও তো করতে হচ্ছে। উপরি কিছু রোজগারে আপত্তি কী ?

—তা তো বটেই স্যার !

॥ পাঁচ ॥



বাড়িতে এসে যখন পৌঁছালেন তখন সাড়ে তিনটে। রানু কী একটা বই পড়ছিলেন। বারান্দায় বসে। ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়াতেই সুজাতা এগিয়ে এল। বাসু ভাড়া মিটিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে সুজাতাকে বললেন, ওর স্বামী আর শ্বশুরের নাম জানা গেছে।

—হ্যাঁ, ত্রিদিব আর ত্রিবিক্রম নারায়ণ ! কিন্তু সে সব কথা পরে। মামিমা এখনও মুখে কুটোটি কাটেননি। আপনি মুখ-হাত ধুয়ে ডাইনিং হলে চলে আসুন। বড্ড বেলা হয়ে গেল আজ।

রানু বললেন, কৌশিককেও ডাক সুজাতা। সে বোধহয় না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে।

বাসু বিরক্ত : তার মানে ? তোমরা কেউ লাঞ্চ করোনি ?

রানির জবাবটা ধমকের মতো শোনাল : তাই কি কেউ পারে ?

তিনজনে একসঙ্গে আহারে বসলেন। কারণ কৌশিক না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েনি আদৌ। সুজাতা ইতিমধ্যে ম্যারেজ রেজিস্টার—যাঁর অফিসে ওরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল—তাঁর পাত্তাটা পেয়েছে শুনে কৌশিক আবার গাড়ি নিয়ে বার হয়ে গেছে। ত্রিদিব আর ত্রিবিক্রমের বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহ মানসে। বাসু-সাহেবের প্রশ্নে সুজাতা জানাল, ওরা ম্যারেজ-রেজিস্টারের খোঁজ বার করতে পেরেছে। হ্যাঁ, ছন্দার শ্বশুর একজন ধনকুবের। বোম্বাই আর নাসিকের মাঝামাঝি তাঁর বিশাল ফ্যাক্টারি। এতদিন একচ্ছত্র মালিক ছিলেন, ইদানীং সেটি লিমিটেড কোম্পানি ; কিন্তু ত্রিবিক্রমনারায়ণ রায় শেয়ারের

বৃকোদরভাগ দখল করে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হয়ে বসে আছেন। ত্রিদিবনারায়ণ তাঁর একমাত্র পুত্র। বরাবর কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করেছে। একেবারে ভেতো বাঙালি হয়ে গেছে। যদিও ত্রিবিক্রমনারায়ণ বাস্তবে 'রায়' নন, 'রাও'। ওঁরা জাতে রাজপুত। শস্তাবৎ না চন্দ্রাবৎ, কী যেন একটা রাজবংশের রক্ত ওঁদের ধমনীতে। রক্ত থাক না থাক, অভিমানটা আছে। পুত্র পিতাকে গোপন করে বেমক্কা একটা রেজিস্ট্রি বিয়ে করে বসেছে।

শেষপাতে ডিশে যখন পুডিং পরিবেশন করছে, তখন বেজে উঠল টেলিফোন। সুজাতার হাতের কাছেই যন্ত্রটা। তুলে নিয়ে আত্মঘোষণা করল। তারপরেই বলল, কী নাম বললেন? সুভদ্রা সেন? এই নাম্বারে··· ? না-না, নাম্বার ঠিকই আছে—

রানু দেবী চিৎকার করে বললেন, ফোনটা আমার। আমাকে দাও!

সুজাতা রীতিমতো বিস্মিত। তবে বিস্ময়ের অনুভূতিটা এ বাড়িতে সকলেই অনায়াসে ভোঁতা করে নিতে জানে। সুজাতা রিসিভারটা রানুর দিকে বাড়িয়ে ধরল। তিনি হাত দিয়েই খাচ্ছিলেন—কাঁটা চামচ দিয়ে নয়—বাঁ হাতে যন্ত্রটা ধরে তার 'কথামুখে' বললেন, সুভদ্রা সেন বলছি; কে? ছন্দা রায়?

ও-প্রান্ত থেকে ভেসে এল প্রত্যুত্তর, হ্যাঁ। আপনি শুভ্রাকে ফোন করে জানিয়েছিলেন আমি যেন রিং-ব্যাক করি। তাই নয়?

—হ্যাঁ তাই। তোমাকে কিছু বলার আছে, ছন্দা···

—তার আগে বলুন, আপনি কেমন করে জানলেন ওই নাম্বারে শুভ্রা চৌধুরী আমার বন্ধু?

—বলব। তারও আগে বলি, কমলেশ ঘোষ আমার বন্ধু নয় আদৌ। শুভ্রা ওটা ভুল বলেছে তোমাকে। সে নিশ্চয় বলেছে যে, আমি কমলেশের বান্ধবী এবং তোমাকে কমলেশের তরফে কিছু জানাতে চাই, বলেনি?

ছন্দা ওঁর এই বাহুল্য প্রশ্নের কোনও জবাব দেবার চেষ্টাই করল না। সরাসরি বললে, তাহলে আপনি কে? আমাকে কী বলতে চান?

আমার নাম সুভদ্রা নয়, আমার নাম রানু বাসু। আমি মিস্টার পি. কে. বাসুর বাড়ি থেকে বলছি। তুমি আজই সকালে আমাদের বাড়িতে এসেছিলে, নিউ আলিপুরে, শিখা দত্তের পরিচয়ে···

—গুড গড! আপনি কেমন করে··· ?

—শোন, তুমি এখানে একটা ব্যাগ ফেলে গেছ। সেটা টের পেয়েছ নিশ্চয়। তাতে অনেক দামি জিনিস আছে···

—জানি, জানি, কিন্তু শুভ্রাদির নাম্বারটা···

—তোমাকে আরও জানাই, মিস্টার পি. কে. বাসু তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। আমার পাশেই তিনি বসে আছেন। তুমি কি তাঁর সঙ্গে কথা বলবে?

—আর কোনও অলটারনেটিভ্ রেখেছেন আপনারা? দিন!

বাসু ওঁর হাত থেকে টেলিফোন-যন্ত্রটা নিয়ে তার কথামুখে বললেন, অনেক ভুগিয়েছ ছন্দা, এবার এসে মুখোমুখি বসে সব কথা বলবে ?

তার আগে একটা কথা বলুন, আপনি কি ওকে একটা টেলিগ্রাম করেছেন?

—'ওকে' মানে ? তোমার বান্ধবীর স্বামী নিরুদ্দিষ্ট কমলেশ ঘোষকে ? হ্যাঁ, করেছি।

—আপনি ওর নাম ঠিকানা জানলেন কীভাবে ?

—ঠিক যেভাবে তোমার এবং তোমার স্বামী ত্রিদিবনারায়ণ রাওয়ের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করেছি। কিন্তু সে-সব কথা টেলিফোনে আলোচনা করতে চাই না। তুমি কি একবার আসতে পার ?

—না ! আপনি ইতিমধ্যেই সর্বনাশ যা করার তা করেছেন ! আর না !

—তাহলে আমিই তোমাদের আলিপুরের বাড়িতে···

—সর্বনাশ ! না, না, সে চেষ্টাও করবেন না।

—তাহলে ? একটা কিছু তো করতে হবেই। উই মাস্ট সিট অ্যাক্রস্ দ্য টেব্‌ল্ !

—অল রাইট। আমিই আসছি। আধ ঘণ্টার মধ্যে।

—এস। তবে তোমার মারুতি গাড়িতে নয়। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা ফ্লাইং-ট্যাক্সি ধরে।

—কেন বলুন তো ?

—তুমি কি এখনও টের পাওনি যে, তোমাকে একজন 'ফলো' করছে ?

—না তো ? কে ? কেন ? আমার পিছু নেওয়ার কী উদ্দেশ্য ?

—সেটা তো তুমিই আমাকে বলবে, ছন্দা।

আধ ঘণ্টার মধ্যে এল মেয়েটি।

ওঁর একান্ত কক্ষে বসলেন দু-জনে।

ছন্দা মুখ খোলার আগেই উনি এক নিশ্বাসে বললেন আ'য়াম সরি, ছন্দা। আমি জানতাম না, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসার আগেই রানুকে একটা রিটেইনার দিয়ে এসেছিলে!

ছন্দা অবাক হয়ে বলে, তাতে কী হল ?

—তাতে এই হল যে, রানু 'রিটেইনার' গ্রহণের মুহূর্ত থেকে তুমি আমার ক্লায়েন্ট। তুমি জান না, এথিক্যাল কারণে ক্লায়েন্টের জন্যে আমি জানকবুল। তাই সারা দিনে তোমার নাম, স্বামীর নাম, শ্বশুরের নাম, মায়, তোমার প্রথম স্বামীর নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করে ফেলেছি।

—আপনি জানেন না, এইভাবে আপনি আমার কী সর্বনাশ করে বসে আছেন!

—না, তা নয়। সে যাই হোক, তুমি কমলেশের সঙ্গে সন্ধ্যা পাঁচটায় অ্যাপয়েন্টমেন্টটা রাখতে পারলে না কেন ?

—কারণ আমি এখনও কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি।

—কমলেশ কেন দেখা করতে বলেছে ? সে কী চায় ?

—এখনও বোঝেননি ? টাকা।

—কত ?

—কাল সকালে ব্যাঙ্ক খোলার আগে দুই হাজার। এ সপ্তাহের ভিতর দশ হাজার।

—অত টাকা তোমার আছে ?

—না নেই। ধার করতে পারি।

—কেন ? তুমি তো বড়োলোকের বউ। তোমার স্বামী তো কোটি কোটি টাকার ওয়ারিশান।

—সে-কথা আপনি কেমন করে জানলেন ?

—সে-কথা মুলতুবি থাক না, ছন্দা। আমি কি ভুল বলেছি ?

—না, ভুল নয়। তবে স্বামী বর্তমানে কপর্দকহীন। তাছাড়া তার টাকা আমি নেব কেমন করে, কেন নেব ?

—ঠিক কথা। ত্রিদিব কি জানে কমলেশের কথা ?

—না!

দু-জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। নীরবতা ভেঙে ছন্দাই প্রশ্ন করে, এত কথা আপনি কী করে জানলেন বলবেন না ?

—সে অনেক কথা। সে-সব তোমার না জানলেও চলবে। বরং আমি যা জানতে চাই তা জানাও। ডাক্তার পি. সি. ব্যানার্জি কে ?

ছন্দা একটু সময় নিল জবাবটা দিতে। গুছিয়ে নিয়ে বললে, আমার এক্স-এমপ্লয়ার। তাঁর নার্সিং-হোমে আমি নার্স হিসাবে চাকরি করতাম, মানে এই বিয়ের আগে।

—ত্রিদিব কি তার কথা জানে ?

—হ্যাঁ, ডাক্তার ব্যানার্জিকে সে চেনে বইকি। তাঁর নার্সিং হোমেই তো ও ভর্তি হয়েছিল। সেখানেই ওর সঙ্গে আমার আলাপ। আমি তার নাইট নার্স ছিলাম।

একটু চুপচাপ। তারপর ছন্দা জানতে চায়, আপনি তো সব কথাই জানতে পেরেছেন। এখন একটা কথা আমাকে বুঝিয়ে বলবেন ?

—কী কথা ?

—একটা মানুষ যদি সাতটা বছর নিরুদ্দেশ হয়ে থাকে, তাহলে আইনের চোখে সে কি মৃত নয় ? সাত-সাতটা বছর স্বামী তাকে দেখভাল করেনি, মুখের অন্ন, পরিধেয় বস্ত্র জোগায়নি, সে যে বেঁচে আছে, শুধু আড়ালে লুকিয়ে আছে তা পর্যন্ত জানায়নি। আর সাত-সাতটা বছর জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যদি সেই তথাকথিত 'বিধবা' নতুন করে সংসার পাততে চায় তাহলে আইন তাকে সে অধিকার দেবে না ?

—দেবে। সাত বছর ধরে কেউ যদি নিরুদ্দেশ থাকে তবে আইনের চোখে সে তথাকথিত মৃত। বিধবা পত্নী—বলা উচিত তার পরিত্যক্তা পত্নী, যদি

নতুন করে কাউকে বিয়ে করে তবে সে বিবাহ সিদ্ধ।

ছন্দার মুখটা ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। প্রথম সূর্যের আলোয় কাঞ্চনজঙ্ঘার চুড়োটা যেমন ধীরে ধীরে ঝলমল করে ফুটে ওঠে। একটা দমবন্ধকরা শ্বাস—হয়তো কয়েক মাস ধরে এই দীর্ঘশ্বাসটা তার বুকে আটকে ছিল—সেটা ত্যাগ করে বলল, এই কথাটাই আজ সকালে আমি জানতে এসেছিলাম। আপনি আমাকে বাঁচালেন।

বাসু সাহেবের মুখটা বেদনার্ত হয়ে ওঠে। তিনি ধীরে ধীরে নেতিবাচক ভঙ্গিতে দু-দিকে মাথা নাড়ছিলেন।

ছন্দা জানতে চায়, কী 'না' ?

—আই অ্যাম সরি, ছন্দা। সাত বছর নিরুদ্দিষ্টের পত্নী দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারে এবং সে বিবাহ আইনত সিদ্ধ একটা বিশেষ শর্তসাপেক্ষে। প্রোভাইডেড্ ওই নিরুদ্দিষ্ট প্রথম স্বামী সশরীরে কোনদিন ফিরে না আসে। যে মুহূর্তে সে রঙ্গমঞ্চে পুনঃপ্রবেশ করবে, সেই মুহূর্তেই ওই দ্বিতীয় বিবাহ অসিদ্ধ : 'নাল্ অ্যান্ড ভয়েড !'

ব্যাখ্যাটা দিতে ওঁর দু-মিনিটও লাগেনি, কিন্তু মনে হল পুরো দিনটাই কেটে গেছে। সূর্য নেমে গেল অস্তাচলে—কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারশুভ্রশিখরের রক্তিমাভা ঢাকা পড়ে গেল কালো আবরণে। ঘনিয়ে এল অন্ধকার।

ছন্দা ওঁর দিকে দু-চোখ মেলে তাকাল। তার ডাগর দুটি চোখ জলে ভরে এল। সে সংকোচ করল না, আঁচল দিয়ে চোখ দু-টি মুছল না। ওর দু-গাল দিয়ে অশ্রুর দু-টি ধারা নেমে এল। অস্ফুটে বলল, বেচারি।

—বেচারি ? কার কথা বলছ ?

—ত্রিদিব। আমার স্বামী।

বাসু ওর পিঠে একখানি হাত রাখলেন। বললেন, ওর সব কথা আমাকে বুঝিয়ে বল, ছন্দা ? কেন সে 'বেচারি' ? কমলেশ অর্থমূল্যে তোমাকে ডিভোর্স দিতে পারে। তাহলে ত্রিদিবের সঙ্গে তোমার বিবাহটা···

—তা হবার নয়, স্যার ! ত্রিবিক্রমনারায়ণ যদি ঘূণাক্ষরেও জানতে পারেন যে, আমি আইনত তাঁর পুত্রবধূ নই···

—তাই বা কেন ? তাঁকে অস্বীকার করে ত্রিদিব তো তোমাকে রেজিস্ট্রি বিয়ে করেছে···

—তাই তো বলছি, 'বেচারি ত্রিদিব' ! আপনি ওর সব কথা জানেন না।

—বল, সব কথা আমাকে বুঝিয়ে বল ?

—বললেও আপনি বুঝবেন না। কেউ কোনও দিনই ওকে বুঝবে না। আর সেটাই ওর ট্র্যাজেডি ! ওর বাড়ির কেউ, এমন কী ওর বাবাও ওর সমস্যাটা বুঝতে পারেননি, বুঝতে পারবেন না।

—কিন্তু ওর মা ?

—শৈশবেই ও মাতৃহারা, বিমাতার কাছে মানুষ।

—কিন্তু ওর সমস্যাটা কী ? ওর চরিত্রের কোন্ জটিলতাটা কেউ বুঝতে

পারবে না বলতে চাও ? যা, একমাত্র তুমিই বুঝেছ ?

—না, স্যার ! তেমন দাবি আমি করিনি। আমিও বুঝিনি, তবে বোঝবার চেষ্টা করেছি। আমিই প্রথম। বোধকরি তার আগে সাইকিয়াট্রিস্ট !

—কী সেটা ?

—ও একটা অবসেশনে ভুগছে। ও একা নয়, সবাই। গোটা রাও পরিবার। ওর বাবা ত্রিবিক্রমনারায়ণ তো বটেই। ওদের ধমনীতে নাকি বইছে রাজরক্ত। ওরা রানাপ্রতাপের বংশধর, সংগ্রাম সিংহের অধঃস্তন পুরুষ। ওদের ধমনীতে সেই রাজরক্ত। যে রক্ত বইতো স্বয়ং রাজসিংহ ব্যাকটু হেভেন নোজ কোন্ এক 'গায়েব-গারেবী'।

—বেশ তো তাই না হয় বইছে। তাতে কী ?

—আপনাকে কেমন করে বোঝাব ? তাই এরা যখন হাঁটে তখন ওদের ঠ্যাঙজোড়া এই ধূলিময় ধরণীর স্পর্শ পায় না, তার বিঘতখানেক উপর দিয়ে ওরা চলে—হোভারক্রাফ্ট-এর মতো !

—হোভারক্রাফ্ট ? শব্দ প্রয়োগটা তোমার, না তোমার স্বামীর ?

—আমারই। আমার তাই মনে হয়েছে ওরা সবাই অতীতকে আঁকড়ে জীবনযাপন করে, বর্তমান ওদের কাছে ছায়া-ছায়া। তাতে আর কার কী ক্ষতি হয়েছে জানি না, ত্রিদিব হয়ে গেছে যন্ত্রমানব। ওর বাবা ওকে পঁচিশ বছর ধরে 'স্পুন ফিডিং' করিয়েছেন—চামচেটা অবশ্য সোনার !

—ও কি তোমার চেয়ে বয়সে ছোটো ?

—হ্যাঁ, সেটাও একটা হেতু, আমাকে পুত্রবধূ বলে মেনে না নেবার। তবে সেটা পরোক্ষ হেতু। মূল কারণ আমার ধমনীতে কোনও নীল রক্ত বইছে না।

—বিয়ের পরে তোমার শ্বশুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি ?

—আগেও নয়, পরেও নয়। তাঁকে আমি চোখে দেখিনি। ও তাঁকে না জানিয়েই আমাকে রেজিস্ট্রি বিয়ে করেছে। টেলিগ্রাম করে বাবাকে জানিয়েছিল। তিনি টেলিগ্রামে আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন। ব্যাস !

—ওর সঙ্গে তোমার কোথায় প্রথম আলাপ ?

—বললাম যে—হাসপাতালের কেবিনে, নার্স হিসাবে। ও যে মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী এটা ও আজকাল বুঝতে শিখেছে। জীবনযুদ্ধে পরাজয়টা ভুলতে কিছু ইয়ারদোস্ত যে পথটা বাতলায় ও সে পথেই এগিয়ে চলছিল। এভাবেই ও ড্রাগ-অ্যাডিক্ট হয়ে পড়ে। তারপর নার্সিংহোমে ভর্তি হয়। ডক্টর ব্যানার্জির পেশেন্ট হিসাবে। সেখানেই আমার সঙ্গে ওর আলাপ···আমার কাছে ও সব কথা স্বীকার করেছিল, বলেছিল যে, তার বাড়ির লোকেরা যদি জানতে পারে যে, সে ড্রাগ-অ্যাডিক্ট, তাহলে আত্মহত্যা করা ছাড়া ওর বাঁচবার কোনও পথ থাকবে না।

—আত্মহত্যা করে বাঁচা ?

—হ্যাঁ ! ওরা যে রানাপ্রতাপের বংশধর। ওদের বংশে পদ্মিনী নারীরা জহরব্রত পালন করে দিব্যজীবন লাভ করত—আপনি শোনেননি ?

—বুঝলাম। তোমার প্রথম বিয়ের কথা বল। ওই কমলেশের কথা!

ছন্দার ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল। কোনওক্রমে বলল, সে জীবনের কথাটা আমি ভুলে থাকতেই চাই, স্যার।

—কেন? যা ফ্যাক্ট, যা সত্য, তাকে ভুলে থাকলেই কি তার জের মেটে? কেন ভুলে আনতে চাও সে জীবনটাকে?

—ছেলেমানুষ ছিলাম তখন। ছেলেমানুষের মতো নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছি। কড়ায়-গণ্ডায় তার মাসুলও দিয়ে এসেছি অবশ্য।

—তবে আর কী? ছেলেবয়সে মানুষে পাকা মাথার পরিচয় দেয় না। দ্যাট্স্ ন্যাচারাল। তুমিও দিয়েছ। সো হোয়াট? বেশ তো, সে জীবনটার স্মৃতি যদি তোমার বর্তমান জীবনকে বিড়ম্বিত করে, তবে তাকে সাময়িক-ভাবে জাগ্রতমনের আড়ালে সরিয়ে রাখ, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু প্রয়োজনে যেন সেই জীবনের প্রতিটি ঘটনা মনে করতে পার, সেটাও দেখতে হবে। কারণ ওগুলো ফ্যাক্ট! আজ সেই রকম একটি লগ্ন এসেছে। আমার জানা দরকার—আই মাস্ট নো—কবে, কোথায় তুমি কমলেশের সাক্ষাৎ পেয়েছিলে। কী কারণে তাকে বিয়ে করেছিলে। কেমন ছিল তোমাদের দাম্পত্যজীবন, এট্‌সেটরা, এটসেটরা!

ছন্দা নতনেত্রে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। ওঁর টেবিলে একটা কাচের রঙিন কাগজচাপা নিয়ে কিছুক্ষণ অহেতুক নাড়াচাড়া করল। তারপর মনস্থির করে বলল, হ্যাঁ, বলব আপনার জানা থাকা দরকার, অ্যাজ্ মাই অ্যাটর্নি! কী জানেন? চরম উত্তেজনার মুহূর্তে সুযোগ পেলে আমি ওই লোকটাকে খুন করে ফেলতে পারি! কিন্তু বিশ্বাস করুন, স্যার, তেমন কোনও পূর্ব-পরিকল্পনা আমার মাথায় নেই! ওই দুর্ঘটনা যদি আদৌ ঘটে, তবে দ্যাট উড বি জাস্ট আ কালপেব্‌ল্ হোমিসাইড, নট আ ডেলিবারেট মার্ডার! খুন করার পূর্বসিদ্ধান্ত মোতাবেক নয়, ওর উস্কানিতে উত্তেজিত হয়ে, প্রচণ্ড রাগে…অথবা ঘৃণায়…

মাঝ পথেই ও থেমে যায়। অসমাপ্ত বাক্যটা শেষ করে না। বাসুসাহেব ধৈর্য ধরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন। ছন্দা আচ্ছন্ন হয়ে নিশ্চুপ বসেই রইল। পড়ন্তবেলার রোদ পশ্চিমের জানলা দিয়ে মেঝেতে গ্রিল্-এর একটা সিলুয়েট-আলপনা এঁকেছে—সেইদিকে তাকিয়ে ও দীর্ঘসময় ধ্যানমগ্ন হয়ে রইল। তারপর যেন সেই ভাবের ঘোর থেকে বাস্তবে ফিরে এল। হাসল। বলল, না! তেমন দুর্ঘটনা ঘটবে না, কিছুতেই ঘটবে না। আমার ঘরে, জানেন, এককালে ভারি ইঁদুরের উপদ্রব ছিল। আমি ইঁদুর-কল পেতে ওদের ধরে, দূরের মাঠে ছেড়ে দিয়ে আসতাম। মাঠে লক্ষ্য করে দেখতাম, কাকগুলো ঘুর ঘুর করত খাঁচায় ইঁদুর দেখে। তাই আমি ঘন ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে ইঁদুর-কলের ঢাকনাটা খুলে দিতাম…

বাসু বললেন, তাহলে তোমার হাত-ব্যাগে লোডেড রিভালভার থাকে কেন?

আবার আত্মস্থ হয়ে যায়। হাসে। বলে, সে কথা থাক!

—থাকবে কেন? সব কথাই তো খুলে বলতে রাজি হয়েছ?

—না স্যার! সব কথা নয়। আমার জীবনের এ জটিলতার দিকটা আপনাকে জানাতে পারব না—আ'য়াম সরি। রাওয়ের কথা বলব, বিশ্বাসের কথা বলব, কিন্তু…

—বিশ্বাস! 'বিশ্বাস' কে?

—আমার প্রথমপক্ষের স্বামী: কমলেন্দু বিশ্বাস!

—আই সী! বল?

॥ ছয় ॥



শৈশবেই বাবা মাকে হারিয়েছে ছন্দা সেন, হ্যাঁ, কুমারী জীবনে সে ছিল সেন। কাকিমার কাছে মানুষ। তাও নিজের কাকিমা নয়, সম্পর্কে কাকির বাড়িতে থেকেই লেখাপড়া করতে থাকে। সাবালিকা হবার পর বাবার ইন্সিওরেন্সের টাকাটা কাকার কাছ থেকে পায়। কাকা কিন্তু বিচক্ষণ মানুষ। টাকাটা ওকে নগদে দেন না। ওর নামে ফিক্সড-ডিপোজিট কিনে নিজের কাছেই রাখেন, যাতে ওর বিয়ের সময় কাজে লাগে। ওর বয়স যখন উনিশ তখন কমলেন্দুর সঙ্গে প্রথম আলাপ। বেচারি দুনিয়াদারির কিছুই বুঝত না। কমলেন্দু ওর চেয়ে পনেরো বছরের বড়ো। কিন্তু চৌত্রিশ বছর বয়সেও তার ছিল একটা দুর্নিবার আকর্ষণী ক্ষমতা। একাধিক মেয়ে তার প্রেমে পড়েছিল। তার ভিতর ছিল ওর খুড়তুতো দিদি, রমা। কাকা-কাকি সেটা টের পেয়ে গেলেন। পাত্র হিসাবে তারা কমলেন্দুকে আদৌ পছন্দ করেননি। ফলে ওদের বাড়িতে কমলেন্দুর আনাগোনা বন্ধ হয়ে গেল।

রমার সঙ্গে প্রেম করলেও ছন্দাকে সে উপেক্ষা করেনি আড়ালে আবডালে দু-জনের দেখা হোত। সত্যি-সত্যি ভালোবেসে, নাকি দিদির উপর টেক্কা দিতে—এখন আর ঠিক মনে পড়ে না—কমলেন্দুর হাত ধরে এক রাতে গৃহ-ত্যাগ করল ছন্দা। কমলের বাড়িতে কে আছে, সে কতদূর লেখাপড়া জানে, কী করে, কোথায় থাকে—এসব কিছুই না জেনে। চেনাঘাটের নোঙর তুলে অচেনা গাঙে নৌকাকে ঠেলে দিল দুঃসাহসী কুমারী মেয়েটি! সঙ্গে শুধুমাত্র একটা সুটকেস। তাতে ওঁর পোশাক-আশাক, মায়ের ফটো অ্যালবাম, আর বাল্যের কিছু স্মৃতি। প্রথমেই ওরা এল কালীঘাটে। কমলেন্দু ওর সিঁথিতে সিঁদুর দিল, হাতে পরিয়ে দিল নোয়া-শাঁখা। এসে উঠল বেলে-ঘাটার একটা বস্তিতে। বারো ঘর এক উঠান। এক কামরার সংসার। পিঠামুলি ছ্যাঁচা-বাঁশের দেওয়াল—গঙ্গার পলিমাটি দিয়ে নিকানো। ঝাঁপের জানলা-দরজা। গোবরজলে নিকানো মেঝে। ছন্দার কিন্তু খারাপ লাগেনি। এ ঘরখানা ওর, ওর নিজের—না, ওদের দু জনের।

প্রায় সাত মাস ছিল টালির ঘরে। লক্ষ্মীর পট পেতেছিল। বৃহস্পতি-বারে পাঁচালি পড়ত। একা একাই। কমলেন্দু বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায় কাক-ডাকা ভোরে, ফেরে রাত করে। হপ্তা বারে মদ্যপান করে। কিন্তু ওপাশের ঘরের নেতাই-এর মতো হপ্তা বারে বউ ঠ্যাঙানোর বদভ্যাস নেই। ছন্দা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল অভ্যাসটা ছাড়াবার। পারেনি। ওর ফুলশয্যা হয়নি—মানে, ফুলে-ঢাকা-শয্যায় কুমারী জীবনের শেষরাত্রি থেকে সীমন্তিনীর সৌভাগ্যে উত্তরণ। কে পাতবে ফুলশয্যা? তা বলে যৌনরাজ্যে উপনীত হওয়াটা কি থেমে থাকবে? তা যদি বল, তাহলে ছন্দার বিয়ে দু দুবার। ওই কমলেন্দুর সঙ্গেই। হ্যাঁ, শুধু কালীঘাটের বিয়েতে কমলেন্দুর মন ওঠেনি। একদিন আবার ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়ে সই দিয়ে বিয়ে করতে হল। ছন্দা বলেছিল, কী দরকার?

কমলেন্দু শোনেনি, বলেছিল, এটা তোমার নিরাপত্তার জন্যে। কেউ না ভবিষ্যতে বলতে পারে—তুমি আমার বিয়ে করা বউ নও।

কমলের চটকলের দু-জন মজুর বিয়েতে সাক্ষী দিতে এল। তাদের কমলেন্দু প্রকাশ্যে, মানে ছন্দার উপস্থিতিতে মিষ্টি খাইয়েছিল, আড়ালে বেগুনি-ফুলুরি চাটযোগে কালীমাকা বোতলের অমৃত।

বিয়ের পরের মাসেই দু-জনে একটি জীবনবীমা করে। ওই যে দুই বন্ধু ওদের রেজিস্ট্রি-বিয়েতে সাক্ষী ছিল তাদেরই একজনের আগ্রহে। সে ছিল ইন্সিওরেন্স এজেন্ট। কমল প্রথমটায় কিছুতেই রাজি হয়নি, ছন্দার পীড়া-পীড়ীতে শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হয়। পলিসিটা হল 'জয়েন্ট' নামে অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর যৌথ জীবনবীমা। দু-জনেই দু-জনের নমিনি। যে কোনও একজনের মৃত্যু হলে অপর জন টাকাটা পাবে। বিপত্নীক হলে পাবে কমল, বিধবা হলে ছন্দা। পাক্কা দশ হাজার টাকা।

সাত মাসের দাম্পত্য জীবনে সে লজ্জায় কাকা-কাকি বা খুড়তুতো ভাই-বোনদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। রমাদিকে টেক্কা দিয়ে সে যে খুব কিছু জিতেছে তাও তখন মনে হোত না। রমাদির বিয়ে হয়ে গেল সু-পাত্রের সঙ্গে। গাড়ি-বাড়ি-টেলিফোন না থাক, পাকা ভাড়াটে বাড়ি, ভদ্র পরিবেশ, বাড়িতে টিভি। সরকারি কেরানি। পরম্পরায় খবর পেল। বিয়েতে এক-গা গহনাও পেয়েছে রমা। আর ছন্দার হয়েছে উলটো দশা।

কমলের পরামর্শে চার গাছা চুরি, গলার মালা আর কানের দুলটা খুলে রাখতে হয়েছে। সুটকেসে তালাবন্ধ করে। এগুলো ছন্দার মায়ের। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। গৃহত্যাগের রাত্রে গায়েই ছিল। কিন্তু এই বেলেঘাটার বস্তিতে সোনার গহনা পরে ঘোরাফেরা করার রেওয়াজ নেই। ছিনতাই পার্টির দৌরাত্ম্যে। কমল অবশ্য ওকে কাচের চুরি, নকলি সোনার দুল আর মঙ্গলসূত্র কিনে দিয়েছিল। এ পরিবেশে সেটাই স্বাভাবিক। সোনার গহনা সব রাখা ছিল সুটকেসে।

ঈশ্বর রক্ষা করেছেন—শুধু ঈশ্বর একাই নন, কমলও। সে এক-এক

পাত্তা কী যেন ট্যাবলেট নিয়ে আসত। দৈনিক একটা করে খেতে হোত। তার ফলে ওদের এক-কামরার খুপরিতে অবাঞ্ছিত তৃতীয় মানব শিশুর আবির্ভাব ঘটেনি।

তারপর একদিন ঘটল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

ভর দুপুরবেলা। কে যেন ওর ঘরে টোকা দিল। এখানে এমন ব্যাপার প্রায়ই ঘটে। সোমত্ত মেয়েরা তাই হুট করে দরজার হুড়কো খোলে না। আগে জানলা দিয়ে দেখে নেয়, আগন্তুক পরিচিত মানুষ কি না—আবার শুধু পরিচিত হলেই চলবে না। চেনা-জানা লোকও এই নিঝুম ভরদুপুরে —যখন মরদেরা যে-যার ধান্দায় বস্তিছাড়া—তখন সোমত্ত-মেয়ের দোর খোলা পেলে দ্যাখ-ন্য-দ্যাখ কাঁচাখেগো রাক্ষস হয়ে ওঠে। ছন্দা নজর করে দেখল— না, ভয়ের কিছু নয়। বাড়ি-উলি মাসি।

এই বারোঘর-এক-উঠানের মালকিন। কর্তা-মশাই ৺গঙ্গা পেয়েছেন। এই বিধবাই ওদের অভিভাবিকা। ছন্দা দোর খুলে দিয়ে বললে, কী মাসি? এই ভরদুপুরে?

—একটা প্রেয়জনে তোর কাছে এলুম, বৌমা। তোর ভাতারের কোনও ফটক আছে তোর কাছে?

—ফটক? মানে, ফটো? না তো! কেন গো মাসি?

—ওমা আমি কনে যাব! কালীঘাটে বে-করে সবাই যে জোড়ে ফটক তোলে। তোরা তুলিসনি?

ছন্দার মনে হল কথাটা ঠিক। ওদের একটা যুগলে ফটো তোলানো উচিত ছিল। আশ্চর্য! কমলেন্দুর কোনও ফটো যে ওর কাছে নেই এই অভাব-বোধটার সম্বন্ধেও সে সচেতন নয়। কেন হবে? গোটা মানুষটা যার মুঠোয় বন্দি, সে কেন দৌড়বে তার ছায়ার পিছনে? কিন্তু ওর ফটোর সন্ধান কেন করছে বাড়ি-উলি-মাসি? প্রশ্ন করে সেই মর্মে।

প্রৌঢ়া আর এক খিলি পান তার টোবলা গালে ঠেশে দিয়ে বললে, সে আর এক বেত্তান্ত। তোর শুনে কাজ নেই! যা, ঘরে গে খিল দে···

ছন্দার নজর হল, একটু দূরে একজন মাঝবয়সী মহিলা বাঁশের খুঁটিটা ধরে ওকেই দেখছেন, একদৃষ্টে। বছর চল্লিশ বয়স হবে তাঁর। সধবা না বিধবা ঠাওর হচ্ছে না, মাথায় সিঁদুর নেই, চোখে চশমা। চেহারায় একটা আভিজাত্য আছে, যা এই বস্তিতে অপ্রত্যাশিত।

ছন্দা প্রশ্নটা না করে পারে না: উনি কে, মাসি?

মাসি পিছন ফিরে দেখল। বাঁশের খুঁটি ধরে যে মহিলাটি দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি এক-পা এগিয়ে এলেন। মাসি তাঁকে ধমক দেয়, আপনি আবার এখানে এসে জুটলে কেন গো বাছা? বলনু তো, আমি শুধিয়ে এসে তোমারে বলব নে। তা তর সইল না?

মহিলাটি ততক্ষণে ওর দোর গোড়ায়। মাসিকে তিনি পাত্তাই দিলেন না। ছন্দাকে বললেন, আপনার সঙ্গে কয়েকটা গোপন কথা ছিল।

—আমার সঙ্গে ? কী কথা ?

শেষ প্রশ্নটা উপেক্ষা করে উনি শুধু বললেন, হ্যাঁ, আপনারই সঙ্গে। আপনার এবং আমার স্বার্থে। ভিতরে আসব ?

ছন্দা স্তম্ভিত হয়ে যায়। সাত মাসে তার দুনিয়াদারীর অভিজ্ঞতা অনেক বেড়েছে। এই বস্তিতে নানান ঘটনা ঘটতে দেখে। অচেনা-অজানা কোনও মানুষকে, সে পুরুষ স্ত্রী যাই হোক, হঠাৎ ঘরের ভিতর ঢুকতে দিতে নেই। কমল ওকে একথা পাখিপড়া করে শিখিয়েছে। কিন্তু এই সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা-টিকে সে প্রত্যাখ্যান করে কীভাবে ?

ছন্দা জানতে চাইল, আপনি কি একাই এসেছেন ?

—না, আমার একজন পুরুষ 'এস্কর্ট' সঙ্গে এসেছেন। তবে এটা মেয়েলি ঘরোয়া ব্যাপার তো, তাই বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষা করছেন। আপনারই নাম ছন্দা বিশ্বাস তো ?

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কোথা থেকে আসছেন ?

—বলব ভাই, সব কথাই খুলে বলব। কিন্তু জনান্তিকে। প্রাইভেটলি।

ছন্দা মনস্থির করে। বাড়িউলি মাসির দিকে ফিরে বলে, ঠিক আছে মাসি। তুমি এস এখন। শুনি, এ ভদ্রমহিলা আমাকে কী বলতে চান। তবে, একটু সজাগ থেকো। ডাকলে, যেন সাড়া পাই।

মাসির বামগণ্ড স্ফীত ছিলই। পান ঠাশা। ধীরে সুস্থে আঁচলের খুঁট খুলে জর্দার কৌটটি বার করল। আপন মনে বললে: গুবান কতা। ভদ্দর-মইলা। বেলেঘাটার বস্তিতে।

তারপর জর্দার টিপ্‌টা রক্তরাঙা মুখ-গহ্বরে নিক্ষেপ করে একটি 'শোলক' শুনিয়ে দিল, 'দেক্‌চি কত দেক্‌ব আর। চিকার গলায় চন্দ্রহার।'

বোঝা গেল, চার দশক বেলেঘাটা বস্তিতে বাস করে কলকাত্তাইয়া লব্‌জে রপ্ত হলেও হেইপার-বাঙলার বাল্যস্মৃতি একেবারে মুছে যায়নি মাসির।

মহিলাটি ভিতরে এলেন। ছন্দা একটা মাদুর বিছিয়ে দিয়ে বলল, বসুন।

মহিলাটি সাবধানী। দরজার হুড়কোটা টেনে দিয়ে বসলেন। বললেন, তোমাকে 'তুমিই' বলছি ভাই, কিছু মনে কর না। প্রথমে এক গ্লাস জল খাওয়াও।

ছন্দা বললে, তাই তো বলবেন, বয়সে আপনি কত বড়ো।

বেচারির ঘরে বাতাসা ছাড়া আর কিছু ছিল না। দু-খানা বাতাসা পেতলের রেকাবিতে সাজিয়ে জল দিল। উনি নিঃসঙ্কোচে বাতাসা মুখে দিয়ে ঢকঢক করে জলটা খেলেন। মুখটা মুছে নিয়ে বললেন, তোমার স্বামীর ছবি দেখতে চাওয়ায় তুমি খুব অবাক হয়ে গেল, তাই না, ছন্দা।"

ছন্দা বলল, তাই তো হবার কথা। কেন দেখতে চাইছেন ?

—না, ছন্দা। আমি তোমার সংসার ভাঙতে আসিনি। আমি তোমার কোনও ক্ষতিই করব না। কিন্তু তুমি সত্য কথা বললে আমার অপরিসীম উপকার হবে। তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে ?

ছন্দা বুদ্ধিমতী। বললে, তার আগে আপনার পরিচয় দিন। আপনি কে? হঠাৎ এমন ভরদুপুরে একজনের ঘরে চড়াও হয়ে তার স্বামীর ফটো দেখতে চাইছেনই বা কেন।

—সঙ্গত প্রশ্ন। বেশ আমি সব কথা খুলে বলছি। সব শুনে তুমি আমাকে বল, নিজের ক্ষতি না করে আমাকে সাহায্য করতে রাজি আছ কি না।

—বলুন?

ভদ্রমহিলার নাম শকুন্তলা দত্ত। বি. এ. বি. টি। বরিষা-বেহালায় নিস্তারিণী সেকেণ্ডারি গার্লস স্কুলের অঙ্কের মাস্টার। অ্যাসিস্টেন্ট হেড-মিসট্রেস। ওই স্কুলের কাছেই একটা দু-কামরার ভাড়াবাড়িতে থাকেন। মাত্র দুটি প্রাণী। উনি আর ওঁর ছোটো বোন অনসূয়া বিবাহিতা। কিন্তু স্বামীত্ত। বয়সে ওঁর চেয়ে ষোলো বছরের ছোটো; নিজেরই বোন। বাবা মা মারা যাবার সময় উনি নিজে ছিলেন বি. এ. ক্লাসের ছাত্রী। অনুসূয়া স্কুলে পড়ল। প্রায় মেয়ের মতো অনুকে মানুষ করেছেন। কিন্তু ওঁর মতের বিরুদ্ধে এক অজ্ঞাতকুলশীলকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে বসল অনু। দু বছর বিবাহিত জীবনের পর আবার কাঁদতে কাঁদতে একদিন ফিরে এলো দিদির কাছে। ওর স্বামী ওর সর্বস্ব হাতিয়ে নিয়ে নগদ টাকাকড়ি গহনা সব কিছু নিয়ে—ওকে ফেলে পালিয়ে গেছে। সে আজ বহু বছর আগেকার কথা। মেয়ের মতো এতদিন মানুষ করেছেন ওকে। ফেলতে পারলেন না। আবার লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু অনু উৎসাহ পেল না। ইতিমধ্যে একটি ছেলে ওর প্রেমে পড়েছে—ওই যে ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে উনি আজ এসেছেন বরিষা-বেহালা থেকে এই বেলেঘাটার বস্তিতে। কিন্তু প্রথম বিবাহটার বিচ্ছেদ না হলে ওরা বিয়ে করতেও পারে না। আইনে বলে সাত-সাতটা বছর ন্যাকি অপেক্ষা করতে হয়। অর্থাৎ ওদের আরও দু-দুটি বছর অপেক্ষা করে থাকতে হবে। এমন সময় খবর পেলেন—অনুর পলাতক স্বামী বেলেঘাটার বস্তিতে একটি মেয়েকে নিয়ে থাকে। সংবাদদাতা নাকি স্বচক্ষে দেখেছে। অনুসূয়ার স্বামী কমলাক্ষ করকে সে দেখেছে, আবার বেলেঘাটা বস্তিতে ছন্দার স্বামীকেও দেখেছে। দু-জনে নাকি হুবহু একরকম দেখতে। অঙ্কের দিদিমণি জানেন দুটো বাহু সমান হলেই দু-টি ত্রিভুজ অভিন্ন হয় না। তাদের অন্তর্নিহিত কোণটাও সমান হওয়া দরকার। তাই যাচাই করতে এসেছেন ছন্দার গৃহকোণে। না, ছন্দার সংসার ভাঙতে নয়, কোনও ক্ষতি করতে নয়—যদি দেখা যায় যে, ছন্দার স্বামী আর অনসূয়ার স্বামী একই ব্যক্তি—অভিন্ন—তাহলে তাকে বাধ্য করতে হবে অনসূয়াকে ডিভোর্স দিতে। ব্যস্। আর কিছুই না। টাকা বা গহনা চুরির দায়ে ওকে দায়ী করতে চান না শকুন্তলা দেবী। তিনি শুধু ভিক্ষা করছেন তাঁর কন্যা-প্রতিম ভগ্নির মুক্তি।

শুনতে শুনতে ছন্দা পাথর হয়ে গেল। কোনও ক্রমে বলল, কিন্তু দিদি ওঁর কোনও ফটো তো আমার কাছে নেই।

—বুঝলাম না।

—দশ-হাজার টাকার জয়েণ্ট ইন্সিওরেন্স করেছিলি, মনে নেই? দুর্ঘটনাটা কীভাবে ঘটবে এটুকুই স্থির করা বাকি ছিল। এর মধ্যে আচমকা শকুন্তলা দেবী এসে পড়ায় ও ওই কণ্ঠ-ভরি গহনা হাতিয়ে পালিয়ে গেছে।

ছন্দা প্রতিবাদ করতে পারেনি। বুঝতে পারে, গহনা খুইয়ে সে জীবন পেয়েছে।

কাকা বললেন, কী করবি ঠিক করেছিস?

—কী বলব? আমি তো পথের ভিখারী!

—কে বললে? দাদার পলিসিটা ম্যাচিওর করার পর তোর নামে ফিক্সড-ডিপজিট করেছিলাম মনে নেই। সুদে-আসলে এখন তা প্রায় পনেরো হাজার টাকা। সে টাকা তো তোর। আমার কাছে গচ্ছিত আছে—নিয়ে যা, নতুন করে বাঁচবার চেষ্টা কর!

ছন্দা একটু ভেবে নিয়ে বলেছিল, না কাকু টাকাটা আমি নেব না!

—কেন রে? এ তো তোরই টাকা···

—সেজন্যে নয়। বিচার করে দেখ, তোমার বাড়িতে আমার থাকা চলে না। সমাজে তোমার মাথা হেঁট হবে—রেবা-রেখার বিয়ে দেওয়া মুশকিল হয়ে পড়বে। ফলে আমাকে পথে নামতেই হবে। তুমি তো জানোই কাকু—নিজের দেহটাকে বাঁচাতেই আমার জান নিকলে যাবে—তারপর ওই বোঝার উপর এই শাকের আঁটি আমার সইবে না।

—তাহলে তুই কী করতে চাস?

ছন্দা একেবারে আচমকা একটা প্রস্তাব দিল। সে কোনও নার্সিং ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি হবে। কোনও ওয়ার্কিং গার্লস হস্টেলে অর্থাৎ ভদ্র নিরাপদ পরিবেশে থাকবে। ওর থাকা-খাওয়া-ট্রেনিং-এর যাবতীয় খরচ যোগাবেন কাকু, ওই পনেরো হাজার টাকা থেকে। মাস মাস কিছু হাত খরচাও নেবে। ট্রাম বাস-ভাড়া, জামা-কাপড় ইত্যাদি বাবদ।

কাকা ওর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন। কাকিমাও চোখের জলে ভেসে ওকে বিদায় দিতে বাধ্য হলেন। রেবা-রেখার সঙ্গে ও দেখাই করেনি।

পাশ করে বের হবার আগেই শুভ্রার সঙ্গে ওর আলাপ হয়। পাশ করার পর তার রুমমেট হয়ে পড়ে। শুভ্রা তার অতীত জীবনের বিষয়ে কিছুই জানতে পারেনি। ও কাজ করত ডাক্তার ব্যানার্জির নার্সিংহোমে। কী বিচিত্র ঘটনাচক্র! সেখানে একদিন এক মানসিক রোগীর নার্সিং করতে করতে সব কিছু গুলিয়ে গেল ওর। কোটিপতি বিজনেসম্যানের একমাত্র পুত্র যখন ওর হাত দুটি ধরে বলেছিল, যে ওকে জীবনসঙ্গিনী করতে চায়—বাবাকে না জানিয়ে রেজিস্ট্রি মতে—তখন ছন্দার সে কথা বিশ্বাসই হয়নি! অথচ সেই সুখের সপ্তমস্বর্গেই অনায়াসে পৌঁছে গেল সে।

আর ঠিক তখনই ফিরে এল ওর জীবনের শনিগ্রহ: কমল।

নামটা সে বারে বারে বদলেছে, নতুন নতুন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করার আগে কিন্তু বদলেছে শুধু পদবীটা। এমনভাবে, যাতে আচমকা কেউ পিছন থেকে ওকে নাম ধরে ডাকলে কারও সন্দেহ হবে না : কমলেন্দু, কমলাক্ষ, কমলেশ— সবারই ডাক নাম কমল! যেমন বলা যায় : হলাহল, জহর, গরল, কালকূট যেটাই সেবন কর ; ফল হবে এক : বিষক্রিয়া! মৃত্যু!

॥ সাত ॥



পরদিন। শনিবার। বাইশে জুন, সূর্যোদয়ের পূর্বেই প্রতিদিনের মতো বাসু-সাহেব প্রাতঃভ্রমণে গিয়েছিলেন। সচরাচর উনি মর্নিং-ওয়াক সেরে ফিরে এলে সবাই জমায়েত হয় প্রাতরাশের টেবিলে। আজও ফিরে এসে দেখলেন বাড়িশুদ্ধ ডাইনিং-টেবিলে উপস্থিত। কিন্তু কেউই মুখ তুলে তাকাল না। সবাই হুমড়ি খেয়ে ইংরেজি-বাংলা খবরের কাগজগুলো ভাগাভাগি করে পড়ছে। বাসু বলেন, কী ব্যাপার? কাগজে জব্বর খবর কিছু ছাপা হয়েছে মনে হচ্ছে?

রানু মুখ তুলে তাকালেন। বলেন, হ্যাঁ, কাল মাঝ রাতে কমল খুন হয়ে গেছে!

—কে? কমল? মানে···

—হ্যাঁ তাই। ছন্দার প্রথম পক্ষের স্বামী।

বাসু ধীরে ধীরে বসে পড়েন একখানা চেয়ারে। অস্ফুটে বলেন, এমন একটা আশঙ্কা অবশ্য ছিলই···কিন্তু এত তাড়াতাড়িই যে···

অন্যমনস্কভাবে হাতটা পকেটে চলে যায় পাইপ-পাউচের সন্ধানে।

সচরাচর প্রাতরাশান্তে কফির কাপে চুমুক দেবার আগে উনি পাইপ ধরান না। আজ তার ব্যতিক্রম হল।

ভিতরের দরজা দিয়ে বিশে উঁকি মারল। রানু আর সুজাতার মাঝে দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবির দিকে তাকিয়ে ছুঁড়ে দিল তার প্রশ্নটা : টেবিল লাগাব? টোস্ট হয়ে গেছে।

সুজাতা বলল, একটু পরে।

—না, একটু পরে কেন? লাগা!—বললেন বাসু। সুজাতার দিকে ফিরে বললেন, কমলেশ, কমলাক্ষ, কমলেন্দু—নাম যাই হোক, হতভাগাটা তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছে। আর তার অভাবে দুনিয়ায় কেউ এখন কাঁদছে বলেও তো মনে হচ্ছে না। অহেতুক গরম টোস্ট ঠাণ্ডা করব কেন? দাও কাগজটা দাও—

প্রথম পাতার নিচের দিকে খবরটা ফলাও করে লেখা হয়েছে : 'রাতের-অতিথির ডাণ্ডায় সমাজবিরোধী ঠাণ্ডা'।

তারাতলার অসমাপ্ত প্রাসাদ মা-সন্তোষী অ্যাপার্টমেন্ট-এর মেজানাইন

ফ্লোরে গতকাল মধ্য রাত্রে এক নৃশংস নাটক সংঘটিত হয়ে যায়, যার ফলে প্রকাণ্ড প্রাসাদের একমাত্র বাসিন্দা কমলেশ বিশ্বাস নিজ গৃহে খুন হয়েছেন। কর্পোরেশন আপত্তি করায় আদালতের আদেশে এই বহুতল-বিশিষ্ট প্রাসাদটি দীর্ঘদিন অসমাপ্ত হয়ে পড়ে ছিল। কমলেশবাবু ছিলেন সেই নির্জন প্রাসাদ-কঙ্কালের রক্ষক। তাঁরই মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে তাঁর ঘরে। পুলিস মৃতদেহ শনাক্ত করেছে। কমলেশ একজন বিবাহ-বিশারদ সমাজবিরোধী। বস্তুত সে চার্লি চ্যাপলিনের বিখ্যাত চলচ্চিত্র মঁসিয়ে ভার্দুর প্রেরণায় তার জীবিকা বেছে নিয়েছিল কি না বলা কঠিন ; তবে তার উপার্জনের কাঠামোটা ছিল প্রায় একই রকম। কমলেশ বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিচয়ে একাধিক বিবাহ করেছে। কখনো কুমারী, কখনো বিধবা কিন্তু তারা একেবারে নিঃস্ব নয়। দু-একটি বধূ হত্যার দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছে। কিন্তু প্রমাণাভাবে মুক্তিও পেয়েছে। দু-চারটি ক্ষেত্রে নবপরিণীতা বধূর অলঙ্কার ও নগদ অর্থ আত্মসাৎ করে উধাও হয়েছে। ফলে প্রত্যাশিত ভাবেই কমলেশবাবুর শত্রু সংখ্যা যথেষ্ট। পুলিসের অনুমান তাদেরই ভিতর কেউ এসে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে গেছে।

"রাত প্রায় একটা সাতাশ মিনিটে স্থানীয় পুলিস স্টেশনে একটি টেলিফোন আসে। থানা থেকে রেডিও মেসেজে ভ্রাম্যমান একটি পুলিস-পেট্রল-কারকে তৎক্ষণাৎ জানানো হয়। অকুস্থলে উপনীত হতে পুলিস আন্দাজ সাত মিনিট সময় নেয়। সদর দরজা বন্ধ ছিল, যদিও নিহতের মেজানাইন-ফ্লোরের দরজা ছিল খোলা। ভূলুণ্ঠিত কমলেশ তখন জীবিত, কিন্তু জ্ঞানহীন। আহতের ঘরে গাদা করে রাখা ছিল গৃহ-নির্মাণের নানান সরঞ্জাম। তার ভিতর একটি পৌনে এক মিটার দীর্ঘ গ্যালভানাইজড্ লোহার বিশ মি. মি. ব্যাসের পাইপ পড়ে ছিল আহত ব্যক্তির পাশেই। তাতে রক্তের দাগ। পুলিশ প্রায় নিঃসন্দেহ —সেটা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত। আততায়ী আচমকা সেটাই তুলে নিয়ে গৃহস্বামীর মাথায় সজোরে বসিয়ে দিয়েছিল।

"অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা, নিহত ব্যক্তির হিপ-পকেটে ছিল একটি লোডেড রিভলবার। যে কোনো কারণেই হোক কমলেশ সেটা পকেট থেকে বার করার সুযোগ পায়নি। অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথে কমলেশ মারা যায়। [এরপর পাঁচের পাতায়]।"

বাসু পাতা উলটে পঞ্চম পৃষ্ঠায় উপনীত হলেন। সেখানে নিজস্ব সংবাদদাতার সরেজমিন-তদন্তের কিছু তথ্য। মধ্য রাত্রে পুলিসের উপস্থিতিতেই সংবাদদাতা অকুস্থলে উপনীত হয়ে কয়েকটি বিচিত্র সংবাদ সংগ্রহ করেন। প্রথম কথা, পুলিসকে টেলিফোনটা করেছিলেন প্রতিবেশী বটুকনাথ মণ্ডল। মা-সন্তোষী অ্যাপার্টমেন্টের পাশেই, বিশ ফুট গলি-পথের ও-প্রান্তে একটি ত্রিতল বাড়ির মেজানাইন-ফ্লোরে সস্ত্রীক বাস করেন বটুকনাথ। তিনি পুলিসকে জানিয়েছেন যে, মাঝ রাত্রে টেলিফোন বাজার শব্দে ওঁর ঘুম ভেঙে যায়। দেখেন, তাঁর স্ত্রীর নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে পূর্বেই। ওঁরা বুঝতে

পারেন, টেলিফোন বাজছে ঠিক পাশের বাড়ির মেজানাইন-ফ্লোরে। অর্থাৎ ওঁদের শয়নকক্ষ থেকে সাত-আট মিটার তফাতে। ভ্যাপ্‌সা গরম ছিল। দু-বাড়ির রুদ্ধ-রুদ্ধ জানলা খোলাই ছিল। ওঁদের জানলায় পর্দা আছে, সামনের বাড়িতে পর্দার বালাই নেই। ওঁরা দেখতে পেলেন, প্রতিবেশি কমলেশ-বাবু রিসিভার থেকে টেলিফোনটা উঠিয়ে কথাবার্তা শুরু করলেন। তখন রাত কত তা ওঁরা বলতে পারেন না। কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল না, তবে দু-জনের মনে হয় কমলেশ টেলিফোনে বলেছিলেন, 'বলছি তো, টাকাটা আমি এক সপ্তাহের মধ্যে মিটিয়ে দেব !...কী ? চন্দ্রা কাল সকালেই দু-হাজার দেবে...' এই কথাগুলি বটুকের স্ত্রীও শুনেছেন, তবে তাঁর বিশ্বাস কমলেশ 'চন্দ্রার' কথা বলেননি, বলেছিলেন 'সন্ধ্যা' ! সে যাই হোক, তারপর ওঁরা দু-জনেই আবার ঘুমোবার চেষ্টা করেন এবং ঘুমিয়েও পড়েন। কতক্ষণ ঝিমিয়েছেন বা ঘুমিয়েছেন তা বলতে পারবেন না, তবে হঠাৎ তন্দ্রা ভাবটা ছুটে যায় কিছু উচ্চকণ্ঠস্বরে। এবারও মনে হল শব্দটা আসছে প্রতিবেশি কমলেশবাবুর ঘর থেকে।

এই পর্যায়ে ওঁরা শুনতে পান, পাশের বাড়ির মেজানাইন ঘরে কিছু কথা-কাটাকাটি হচ্ছে। তার একটি পুরুষকণ্ঠ, অন্যটি স্ত্রীলোকের। দু-জনেই জোর গলায় কথা বলছিলেন ; কিন্তু কী কথোপকথন হচ্ছিল তা বোঝা যাচ্ছিল না ; কারণ ঠিক একই সময়ে ওই কমলেশেরই কলবেলটা একটানা বেজে চলেছিল। অর্থাৎ সদরের বাইরে দাঁড়িয়ে কেউ কল-বেল-এর পুশ-বাটন টিপে ধরছিল। সেটা একটানা বেজেই চলছিল। ওঁরা জানতেন ও বাড়িতে ওই ঘরে কমলেশ একাই থাকেন। ফলে মধ্য রাত্রে সে-ঘরে নারীকণ্ঠ শুনে প্রতিবেশি হিসাবে কৌতূহলী হয়ে পড়েন বটুকনাথ। বিছানা থেকে উঠে জানলা পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই মনে হল ও-ঘরে কী একটা শব্দ হল। কেউ আহত হয়ে অথবা ধাক্কা খেয়ে ধরাশায়ী হল। বটুকনাথ দ্রুত পদক্ষেপে জানলার কাছে সরে যান ; কিন্তু উনি দৃক্‌পাত করার পূর্বেই ও ঘরের বাতিটা নিবে যায়। লোডশেডিং নয়, কারণ তখনো কল-বেলটা একটানা বেজে চলেছে। ইতিমধ্যে বটুকবাবুর স্ত্রীও এসে ঘোর অন্ধকারে জানলার ধারে দাঁড়িয়েছেন। আন্দাজ মিনিট-খানেক পরে কলবেল বাজানো বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ যে লোকটা ভিতরে আসতে চাইছিল সে ওই প্রয়াসে ক্ষান্ত দেয়। তারও মিনিট-তিনেক পরে দূরে বড়ো রাস্তায় একটা গাড়ির স্টার্ট নেবার শব্দ হয়। অবশ্য মিসেস্ মণ্ডলের ধারণা ওটা মটরগাড়ি নয়, মটরসাইকেল। তারপর সব সুন্‌-সুন্‌।

বটুক মিনিট-পাঁচেক অপেক্ষা করেন। কিন্তু পাশের বাড়িতে কোনো সাড়াশব্দ জাগে না। বাতিও জ্বলে না। উনি কমলেশবাবুর নাম ধরে বার-কতক ডাকাডাকি করেন। কেউ সাড়া দেয় না। বটুকনাথের একটি বড়ো পাঁচসেল এভারেডি টর্চ আছে। এবার তিনি সেটার সাহায্যে পাশের বাড়ির গবাক্ষপথে আলোকপাত করেন। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল মেজেতে কোনো

মানুষ পড়ে আছে। পুরুষ মানুষ। তার একটা অনড় পা শুধু দেখা যাচ্ছিল। এবার উনি ঘড়ি দেখেন। রাত তখন ঠিক একটা পঁচিশ। বটুক-নাথ তাঁর প্রতিবেশী ডাক্তার নবীন দত্তকে ঘুম থেকে টেনে তোলেন। ডাক্তার দত্ত দ্বি-তলে বাস করেন। তাঁর বাড়িতে টেলিফোন আছে। ডাক্তার দত্ত নিচের মেজানাইন ঘরে এসে টর্চের আলোয় ভূশয্যালীন ব্যক্তির অনড় একটি পা দেখে মনে করেন ঘটনাটা পুলিসে জানানো উচিত। ওঁরা থানায় ফোন করেন।

অচিরেই পুলিস অকুস্থলে পৌঁছোয়। ইন্সপেক্টার মুখার্জির ঘড়িতে তখন একটা বিয়াল্লিশ। সামনের দরজাটিতে গোদরেজের 'ইয়েল-লক' লাগানো। অর্থাৎ আততায়ী পালাবার সময় দরজার পাল্লাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে গেছে। তা আর বাইরে থেকে চাবি ছাড়া খোলা যাবে না।

পুলিস বহুক্ষণ 'কলবেল' বাজায়। ভিতরে কোনো সাড়াশব্দ শোনা যায় না। তখন একজন পুলিস ভারা বেয়ে দ্বি-তলে উঠে গ্রিলহীন জানলার ফোকর দিয়ে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে সদর দরজা খুলে দেয়। টর্চের সাহায্যে ওঁরা সিঁড়ি দিয়ে দেড়-তলার মেজনাইন-ঘরে উপনীত হন। সুইচটা খুঁজে পেয়ে বাতি জেবলে দেন। দেখেন, কমলেশ অজ্ঞান অবস্থায় মেজেতে পড়ে আছে। ডাক্তার দত্ত তাকে পরীক্ষা করে বলেন যে, বেঁচে আছে। আহতের ঘরে টেলিফোন ছিল। রুমাল জড়ানো-হাতে পুলিস-সার্জেন্ট অসীম মুখার্জি তখন টেলিফোনটা তুলে নেয়, একটা আম্বু-লেন্সের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছোনোর পূর্বেই কমলেশ মারা যায়।

তার পরে তল্লাসির সময় পুলিস মেজেতে একটা ছোটো চামড়ার কেস-এ চাবির রিং আবিষ্কার করে। তাতে তিন-তিনটি চাবি। পুলিসের ধারণা আততায়ী মহিলা, বড়ো ঘরের মহিলা। কারণ চাবির রিঙে আছে তিনটি চাবি। একটা নবতাল তালার। বাকি দুটি মটরগাড়ির 'ডোর-কী'। মেক ও মডেল দেখে পুলিসের ধারণা একটি চাবি 'মারুতি-সুজুকি'র অপরটি 'অ্যাম্বাসাডার'-এর। তাহলে, নবতাল তালাটি সম্ভবত গ্যারেজের। নিহত কমলেশ বিশ্বাসের কোনো গাড়ি নেই। ফলে পুলিসের ধারণা, মধ্য রাত্রের অতিথিই অসাবধানে ওই চাবির গোছা ফেলে গেছে। এখানে তিনটি চাবির ফটো দেওয়া হল। দুটি দামি গাড়ির চাবি যাঁর রিং-কেস-এ থাকে (যে রিং-কেস-এ দামি ফরাসি সুগন্ধীর সুবাস) তাঁকে খুঁজে বার করা হয়তো কঠিন হবে না। পুলিস সাঁড়াশি অভিযান চালাচ্ছে। এক দিকে নিহত বিবাহ-বিশারদের পরিত্যক্ত পত্নীদের পরিচয়; অপরদিকে 'মটর-ভেহিক্‌লস্'-এ এমন দম্পতীর সন্ধান, যাঁরা ওই দুই মেক এর গাড়ির মালিক-মাল্‌কিন…

প্রাতরাশ শেষ হতে-না-হতেই বাইরের বারান্দায় 'কল-বেল' বেজে উঠল। বাসু ঘড়ি দেখলেন। সকাল সাতটা। সচরাচর উনি চেম্বারে এসে বসেন বেলা

আটটায়। কম্বাইণ্ড-হ্যান্ড বিশ্বনাথ বাইরের দরজা খুলে দেখে এল। ফিরে এসে নিঃশব্দে একটি আইভরি-ফিনিশড্ দামি ভিজিটিং কার্ড টেবিলে নামিয়ে রাখল : ত্রিদিবনারায়ণ রয়।

রানু প্রশ্ন করেন, কী? দেখা করবে? নাকি, ঘণ্টা-খানেক পরে ঘুরে আসতে বলব?

—না, আজ বরং একঘণ্টা আগেই দপ্তর খোলা যাক। তুমি আগে যাও। রেজিস্টারে নাম ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার আর ওর স্বাক্ষর…

বাধা দিয়ে রানু বলেন, আমার কাজ আর নতুন করে আমাকে শেখাতে হবে না। এস তুমি—

একটু পরে বাসু গিয়ে বসলেন নিজের ঘরে, রানুদেবী বাইরের রিসেপশান কাউণ্টার পাক মেরে এসে উপস্থিত হলেন তাঁর হুইল-চেয়ারে।

বাসু নিম্নকণ্ঠে জানতে চাইলেন, ছন্দার দু-নম্বর তো?

—হ্যাঁ। খুবই উত্তেজিত মনে হচ্ছে।

—হঠাৎ 'পর্বতোবহ্নিমান' কেন? 'খুনাৎ'? এক নম্বর খুন হয়েছে বলে? ও কী জানে?

—কী জানি! ঘরময় পায়চারী করছে, আর একটার পর একটা ইণ্ডিয়া কিং ধরাচ্ছে। দু-টান দিয়েই অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিচ্ছে। বেশিক্ষণ ওভাবে চালালে আমার কার্পেটটা পুড়িয়ে ফেলবে।

—কী চায় তা কিছু বলেছে?

—না। তোমার সাক্ষাৎ চায় শুধু। ব্যাপারটা নাকি 'জীবন-মৃত্যু' নিয়ে।

—ঠিক আছে। ডেকে দাও। দাঁড়াও…এবারও রিটেইনার নাওনি তো?

রানু হাসলেন। বললেন, আবার? তোমাকে না জিজ্ঞেস করে?

রানু বাইরের দিকের দরজাটা খুলে দ্বারপথে ও-কক্ষে কাকে যেন সম্বোধন করে বললেন, আসুন মিস্টার রাও, মিস্টার বাসু আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

একটি সুসজ্জিত এবং সুদর্শন যুবক প্রবেশ করল চেম্বারে। সুদর্শন, কিন্তু পৌরুষ বা ব্যক্তিত্বের কোনো ব্যঞ্জনা নেই তার দেহাকৃতিতে। উজ্জ্বল গৌর বর্ণ, মাঝারি উচ্চতা, কৃশকায়। কথা যখন বলতে শুরু করল তখন মনে হল আপার-প্রেপ্ এর কোনো ছাত্র 'মিস্' কে পড়া মুখস্ত হয়েছে কি না প্রমাণ দিচ্ছে :

আমার নাম শ্রীত্রিদিবনারায়ণ রাও। আমরা শক্তাবৎ। আমার পিতৃদেব হচ্ছেন স্বনামধন্য ধনকুবের শ্রীত্রিবিক্রমনারায়ণ রাও অফ নাসিক। আপনি তাঁর নাম শুনে থাকবেন।

বাসু মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

—আপনি আজ সকালে কাগজ দেখেছেন, স্যার? আই মিন সংবাদপত্র?

—আটোমুটি। এ কথা কেন?

ত্রিদিব বসেছিল ডান পায়ের উপর বাঁ পা-টা তুলে। এবার সে ভঙ্গিটা বদলাল। বাম-চরণের উপর উঠল দক্ষিণ ঠ্যাঙ। নড়াচড়ায় তার কপালের সামনের দিকে একগুচ্ছ চুল চোখের উপর এসে পড়ল। ত্রিদিব বাঁ-হাতে অশান্ত চুলের গোছা কপালের উপর দিয়ে ঠেলে দিয়ে বললে: খুনের খবরটা দেখেছেন? তারাতলায়? ৺মা সন্তোষী অ্যাপার্টমেন্ট-এ?

বাসু যেন একটু চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, হ্যাঁ, প্রথম পাতায় নিচের দিকে ওই রকম কী নিউজ আছে বটে। ডিটেইল্‌সে পড়িনি। কিন্তু সে-কথাই বা কেন?

হঠাৎ ত্রিদিব ঘনিয়ে এল ওঁর দিকে। ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল, ওই খুনের মামলায় আমার 'ওয়াইফ'-এর জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা! আই মিন, অচিরেই ওই খুনের দায়ে সে গ্রেপ্তার হতে চলেছে।

বাসুও ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে জানতে চান, আপনার স্ত্রীই কি খুনটা করেছেন?

—না! নিশ্চয় না! সে এ কাজ করতেই পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে বিশ্রীভাবে কেসটায় জড়িয়ে পড়েছে! কিছুটা নির্বুদ্ধিতা, কিছুটা অসাবধানতা বাকিটা ওর চরিত্র দোষে। আমি অস্বীকার করব না—মানে, ও হয়তো জানে খুনটা আসলে কে করেছে। আমার অবশ্য ধারণা সে নিশ্চিত জানে। আই মিন, তার চোখের সামনেই খুনটা হয়েছে। আর দুর্ভাগ্যবশত আমার ওয়াইফ জেনেশুনে হত্যাকারীকে আড়াল করতে চাইছে। লোকটাও অদ্ভুত! কাপুরুষের অধম। একজন অবলা মহিলার আঁচলের তলায় লুকিয়ে ওকেই বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দেখুন স্যার, আপনি না বাঁচালে…

বাধা দিয়ে বাসু বলে ওঠেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও। খুনটা হয়েছে রাত দেড়টা নাগাদ। তখন কি তোমার স্ত্রী বাড়িতে ছিল না?

—না! ছিল না!

—তুমি কেমন করে জানলে?

—সে এক দীর্ঘ কাহিনী। আমাকে তাহলে প্রথম থেকে বলতে হয়।

—বল না! তাই বল। প্রথম থেকেই। না হলে আমি বুঝব কী করে?

ত্রিদিব আবার আরাম করে গুছিয়ে বসল। দক্ষিণ ও বাম ঠ্যাঙ তাদের অবস্থান বদলালো। চোখের উপর ঝুলে-পড়া চুলের গোছা অশান্ত হাতে সরিয়ে দিয়ে বলল, আমার নাম শ্রীত্রিদিবনারায়ণ রাও। আমার বাবা হচ্ছেন নাসিকের ধনকুবের শ্রীত্রিবিক্রমনারায়ণ রাও। আমরা…

—জানি, শক্তাবৎ। এ কথা তুমি আগেই বলেছ। তারপরের কথাটা কী?

—আমি কলকাতাতেই পড়াশুনা করেছি। আলিপুরে আমাদের একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট আছে। জাস্ট একটা গ্যারেজ আর একটু দূরে এক কামরার একটা রেসিডেন্সিয়াল য়ুনিট। ওখানে ভবিষ্যতে একটা মালটিস্টোরিড অ্যাপার্টমেন্ট হাউস হবে। আপাতত ওই এক কামরার ঘরে থেকেই আমি কলকাতায় ল' পড়ছিলাম। গত বছর পাশ করেছি। বছরখানেক আমি য়ুরোপ-আমেরিকা

ঘুরতে গেছিলাম। মাস-তিনেক আগে ফিরে আসি। তারপর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ি। বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে একটি নার্সিং হোমে ভর্তি হই। আমার বাবা তখন বিদেশে। আমেরিকায়। ওই নার্সিং হোমে যে নাইট-নার্স ছিল তার নাম ছন্দা বিশ্বাস।

এই পর্যন্ত বলে ত্রিদিব মৌন হল। তাকিয়ে রইল ঘূর্ণ্যমান সিলিং ফ্যানটার দিকে।

বাসু বলেন, শুনলাম। তারপর?

—আমি ছন্দা বিশ্বাসকে বিয়ে করে ফেললাম!

আবার থামল সে। যেন, একটা জঘন্য অপরাধের স্বীকারোক্তি করেছে! এখন তাই একটু দম নিচ্ছে!

বাসু বললেন, ও!

যেন, নার্সিং হোমে রুগীরা সচরাচর নাইট-নার্সকে বিয়ে করে যুগলে বাড়ি ফেরে। এটাই প্রথা!

ত্রিদিব সোজা হয়ে উঠে বসে। বলে, আপনি ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারছেন না, স্যার। আমরা 'রাও', মানে চিতোরের শক্তাবৎ রাও! আমি আমার স্বনামধন্য পিতা শ্রীত্রিবিক্রমনারায়ণ রাওয়ের একমাত্র পুত্র—আর আমি কিনা খানদানের কথা ভুলে গিয়ে, বংশমর্যাদার কোনো তোয়াক্কা না রেখে, বেমক্কা বিয়ে করে বসলাম একজন নার্সকে! আমার স্বনামধন্য পিতৃদেব এটাকে কী ভাবে নেবেন···

—তা নিয়ে তোমার কেন মাথাব্যথা? দেখ ত্রিদিব, জীবনটা তোমার। জীবনসঙ্গিনীও তুমি নিজে নির্বাচন করেছ···

—আপনাকে আমি কেমন করে বোঝাই? বাবামশাই আমেরিকা থেকে ফিরে এসে দেখলেন আমার টেলিগ্রাম তাঁর অপেক্ষায় রাখা আছে! আমি বিবাহিত! আমি একটি সামান্য নার্সকে বিবাহ করেছি। যে মেয়েটি অন্যপূর্বা এবং বয়সে আমার চেয়ে বড়ো।

—'অন্যপূর্বা' মানে?

—ছন্দা বিশ্বাস বিধবা!

—তাতে কী হল? বিদ্যাসাগর মশায়ের আমল থেকে বিধবা-বিবাহ তো সিদ্ধ।

—আপনাকে আমি কেমন করে বোঝাই?

—ও প্রসঙ্গ থাক। তুমি কী একটা খুনের কথা বলতে চাইছিলে না?

—হ্যাঁ খুন। এই দেখুন···

কোটের পকেট থেকে সে একটি দৈনিক পত্রিকার কর্তিত অংশ বার করে আনল। ভাঁজ খুলে সেটি পেতে দিল ওঁর গ্লাস-টপ টেবিলে। কাগজটার মাঝখানে একটা চাবির আলোকচিত্র—বস্তুত তিন-তিনটি চাবি।

ত্রিদিব তার হিপ-পকেট থেকে একটা চামড়ার 'কী-কনটেনার' বার করে টেবিলে রাখল। তাতে তিন-তিনটি চাবি। বললে, মিলিয়ে নিন, স্যার?

কাগজে অবশ্য 'রিডিউস্‌ড-স্কেলে' ছাপা হয়েছে, তবু শনাক্ত করতে কোনো অসুবিধা হল না। বাসু-বললেন, এটা কেমন করে হল? আমার ধারণা এ চাবির গোছাটা তো আছে পুলিসের হেপাজতে।

ত্রিদিব মাথা নাড়ল। বলল, আজ্ঞে না। এ থোকাটা আমার। পুলিসের কাছে যেটা আছে সেটা আমার ওয়াইফ-এর। যেটা সে কাল রাত্রে অকুস্থলে অসাবধানে ফেলে এসেছে। যখন ওই লোকটা খুন হয়—তা সে যেই করুক।

—তোমার স্ত্রী যে সে সময় অকুস্থলে ছিল তা তুমি কেমন করে জানলে?

ত্রিদিব কপাল থেকে চুলের গোছাটা সরিয়ে বলল, তাহলে আপনাকে গল্পটা গোড়া থেকে বলতে হয়।

বাসু বিরক্ত হয়ে বললেন, না। গোড়ার দিকটা আমার জানা। তোমার নাম, তোমার বাবার এবং স্ত্রীর নাম এবং তোমরা শক্তাবৎ। এখন শুধু বল, তুমি কেমন করে জানলে যে তোমার স্ত্রী কাল গভীর রাত্রে তারাতলায় ছিল?

ত্রিদিব চাবির থোকাটা তুলে নিয়ে বলল, এই চাবিটা মারুতির ফ্রন্ট-ডোর কী, যেটা আমার ওয়াইফ চালায়, এটা আমার অ্যাম্বাসাডারের। আর এই নবতালটা হচ্ছে গ্যারেজের চাবি। ডবল গ্যারেজ। ইগনিশান কী সচরাচর গাড়িতেই লাগানো থাকে। পাশাপাশি দুটি গাড়ি থাকে। সামনে স্লাইডিং-ডোর। একই তালায় দুটো গাড়ি লক করা থাকে। তাই সুবিধার জন্য আমরা তিন সেট চাবি বানিয়েছি। একটা থাকে আমার কাছে। একটা ছন্দার কাছে, তৃতীয়টা আমাদের ড্রয়ারে। আমি আপনার কাছে আসার আগে দেখে এসেছি, ড্রয়ারের চাবি স্বস্থানে আছে। আমার চাবি তো আমার পকেটে। দেয়ারফোর, পুলিস যেটা খুঁজে পেয়েছে সেটা আমার ওয়াইফের চাবির থোকা।

—আই সি। তা তুমি যে এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছ সে-কথা কি তোমার স্ত্রীকে জানিয়ে এসেছ?

—না।

—কেন?

—সে অনেক কথা। শি ট্রায়েড টু ড্রাগ মি।

—সে কী করতে চেয়েছিল?

—কাল রাত দশটা নাগাদ আমাকে জোরালো ঘুমের ওষুধ খাইয়ে রাতে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চেয়েছিল।

—কেন?

—না হলে তার নৈশ-অভিসারে ব্যাঘাত হত যে।

—নৈশ-অভিসার! তার মানে?

—সে কথাই তো বলতে চাইছি।

—তাহলে বল। সবটা গুছিয়ে নিয়ে বল?

ত্রিদিবের সে ক্ষমতা নেই। তার কথাবার্তা আর চিন্তার ঠিক পারম্পর্য নেই। অনেক খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বাসু-সাহেব তার কাছ থেকে যে ঘটনাপরম্পরা

আবিষ্কার করলেন তা এই রকম :

গতকাল রাত্রি দশটা নাগাদ ওরা টি. ভি. বন্ধ করে দ্বৈতশয্যায় শয়ন করতে যায়। ছন্দা এই সময় ত্রিদিবের কাছে জানতে চায়, শোবার আগে সে একটু হট চকলেট খাবে কি-না। ত্রিদিব রাজি হয়। সে প্রায়ই শয়নের পূর্বে গরম চকলেট পান করে। এক-কামরার ফ্ল্যাট। সংলগ্ন বাথরুম এবং এক প্রান্তে কিচেনেট। ত্রিদিব শোবার ঘরে, প্যান্ট বদলে পা-জামা পরছিল, আর ছন্দা সংলগ্ন কিচেনেটে গরম চকলেট বানাচ্ছিল। ছন্দা ছিল ত্রিদিবের দৃষ্টিসীমার বাইরে, কিন্তু দরজাটা এমনভাবে আধখোলা অবস্থায় ছিল যে, দ্বারের সংলগ্ন-আয়নায় অন্ধকার শয়নকক্ষ থেকে আলোকিত কিচেনে ছন্দাকে দেখা যাচ্ছিল। ত্রিদিব লক্ষ্য করে,ছন্দা তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলেএকটা ছোট্ট শিশি বার করে। শিশিটা পরিচিত। ওতে থাকে একটা ঘুমের ওষুধ ঃ 'ইপ্রাল'! হাসপাতালে থাকতে প্রতি রাত্রে ওই ওষুধ খেতে হত। এখন খায় না! ত্রিদিব অবাক হয়ে দেখল, ছন্দা বেশ কয়েকটা ট্যাবলেট ওর চকলেটে মিশিয়ে দিল। তারপর এ ঘরে এসে ত্রিদিবের হাতে গ্লাসটা ধরিয়ে দিল।

—তারপর? তুমি ওকে জিজ্ঞাসা করলে না? কেন সে তোমাকে না জানিয়ে তোমার চকলেটে ঘুমের ওষুধ মেশালো! অথবা কটা ট্যাবলেট সে মিশিয়েছে?

—আজ্ঞে না। আমি জিনিসটা খতিয়ে দেখতে চাইছিলাম।

—তাহলে ঠিক কী করলে তুমি?

ত্রিদিব চকলেটটা হাতে নিয়ে বাথরুমের দিকে চলে যায়। ভাবখানা সে ইউরিনাল ব্যবহার করতে যাচ্ছে। দরজাটা বন্ধ করে সে চকলেটটা কমোডে ঢেলে দিয়ে ফ্লাস টেনে দেয়। তারপর গরম জলের ট্যাপটা খুলে গ্লাসে গরম জল ভরে নেয়। এ ঘরে চলে আসে। ধীরে ধীরে সিপ করে গরম জলটা এমনভাবে পান করতে থাকে যাতে মনে হয় সে গরম চকলেটই খাচ্ছে।

—তারপর?

—তারপর আমি নিজেই গ্লাসটা বেসিনে ধুয়ে আনলাম, যাতে ও দেখতে না পায় তলানিটা কী জাতের। একটু পরে ওকে বললাম, আমার দারুণ ঘুম পাচ্ছে। ও একটা বই পড়ছিল। বলল, তাহলে শুয়ে পড়। আমি শুয়ে পড়লাম। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ার ভান করলাম। তার একটু পরে ছন্দাও শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুমালো না। রাত সওয়া বারোটায় ও নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। অন্ধকারেই সে নাইটি পালটে শাড়ি পড়ল। সাজ-পোশাক বদলালো। তারপর নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

—দরজা খোলাই পড়ে রইল?

—আজ্ঞে না। আমাদের দরজায় 'ইয়েল-লক' লাগানো। ছন্দা যাবার সময় অতি সাবধানে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল, যাতে শব্দ না হয়।

—তারপর কী হল?

ত্রিদিব আবার উলটো পালটা ভাবে ঘটনা পরম্পরার বর্ণনা দিতে থাকে।

পর্যায়ক্রমে সাজালে সেটা এই রকম দাঁড়ায় :

বিছানায় শুয়ে শুয়েই ত্রিদিব শুনতে পায় গ্যারেজের স্লাইডিং দরজাটা খোলা হল। মধ্যরাত্রে ওটা নিঃশব্দে খোলা যায় না। পাশাপাশি সমান্তরাল লোহার চ্যানেলে দুটি লোহার পাল্লা। গ্যারেজটায় দুটি গাড়িই পাশাপাশি থাকে। সচরাচর অ্যাম্বাসাডারটা ডাইনে, মারুতি বাঁয়ে। ফলে, ছন্দা নবতাল প্যাডলক খুলে খুব ধীরে ধীরে—যাতে শব্দ কম হয়—বাঁ-দিকের পাল্লাটা ডানদিকে নিয়ে আসে। ওই সময় ত্রিদিব বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। জানলার কাছে সরে এসে পর্দা সরিয়ে দেখতে থাকে। দেখে, ওর স্ত্রী মারুতি গাড়িখানা বার করে আনল। আবার মারুতির দিকের লোহার পাল্লাটা ঠেলে ঠেলে স্ব-স্থানে টেনে আনল। তারপর স্টার্ট দিল গাড়িতে। কম্পাউণ্ডের গেট খুলে বাইরে গেল। গেট বন্ধ করে রাস্তায় নামল। বাঁকের মুখে মিলিয়ে গেল। রাত তখন বারোটা পঁয়ত্রিশ···

এই পর্যায়ে বাসু সাহেব বাধা দিয়ে বললেন, একটা কথা। তোমার স্ত্রী কি রওনা হবার আগে গ্যারেজের 'নবতাল' প্যাডলকটা বন্ধ করে দেয়নি?

ত্রিদিব বলল, নিশ্চয় দিয়েছিল।

—তুমি অতদূর থেকে সেই ব্যাপারটা দেখতে পেলে?

—আজ্ঞে না, স্বচক্ষে দেখিনি। এটা আমার আন্দাজ। দারোয়ানজি ছুটিতে ছিল তো? গ্যারেজটা লক্ না-করে গেলে অ্যামবাসাডার গাড়িটা অরক্ষিত হয়ে থাকত। তাই আন্দাজ করছি···আর তা ছাড়া আমরা দু-জনেই সব সময় গাড়ি নিয়ে বার হলেই গ্যারেজ-দরজা তালা বন্ধ করে যাই··· ছন্দাও নিশ্চয় তা করেছিল···

বাসু বলেন, সে-ক্ষেত্রে ফিরে এসে সে গ্যারেজ খুলল কী করে? তোমার ধারণায় তো চাবিটা তার আগেই খোয়া গেছে তারাতলায়?

—তার কারণ ট্রিবলিকেট চাবিটাও ওর কাছে ছিল।

—ট্রিবলিকেট চাবি! মানে?

—আপনাকে আগেই বলেছি, স্যার, আমাদের তিন-সেট চাবি আছে। একটা থাকে আমার কাছে, একটা আমার ওয়াইফের কাছে, তৃতীয় সেটটা থাকে ওর ড্রেসিং টেবিলের টানা-ড্রয়ারে। ছন্দা রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি তৈরি হয়ে নিই। ওকে 'ফলো' করব বলে। পা-জামা ছেড়ে প্যাণ্ট পরি, আর হাওয়াই শার্ট। কিন্তু আমার চাবির থোকাটা খুঁজে পাই না। সচরাচর যেখানে থাকে সেখানে নেই। খুঁজতে খুঁজতে মিনিট তিনেক দেরি হয়ে যায়। তখন মরিয়া হয়ে আমি টানা ড্রয়ার খুলে ট্রিব্লিকেট চাবিটা নেবার চেষ্টা করি। কিন্তু ড্রয়ার খুলে দেখি নির্দিষ্ট স্থানে চাবির থোকাটা নেই···

বাসু জানতে চান, তার মানে?

—তার মানে ছন্দারও হয়েছিল ঠিক আমার অবস্থা। আমাকে নিথর হয়ে ঘুমাতে দেখে সে নিঃশব্দে উঠে পড়ে। অন্ধকারেই নাইটি ছেড়ে শাড়ি পরে; কিন্তু তার চাবির থোকাটা খুঁজে পায় না। বাধ্য হয়ে নিশ্চয় সে ওই ড্রয়ারের

তৃতীয় চাবির থোকাটাই নিয়ে যায়। আসলে ওর নিজের চাবি-সেটটা ছিল ওর লেডিজ ব্যাগেই। যেটা সে তারাতলায় ফেলে এসেছে ; কিন্তু তাতে বাড়ি ফিরতে তার অসুবিধা হয়নি।

—তারপর ? বলে যাও…

ত্রিদিব আবার বলতে থাকে।

ড্রয়ারের থার্ড-সেট চাবিটা না পেলেও মিনিট পাঁচেক পরে সে তার নিজের থোকাটা খুঁজে পায়। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। স্ত্রীকে ফলো করা আর সম্ভবপর নয়। তবে ত্রিদিব আন্দাজে বুঝতে পেরেছিল তার স্ত্রী কোথায় নৈশ-অভিসারে গেছে। অর্থাৎ কোন্ ভাগ্যবান তার সদ্যপরিণীতা সহধর্মিণীর প্রাকবিবাহযুগের প্রণয়ী। ও সেখানেই ফোন করে…

আবার বাধা দিয়ে বাসু বলেন, সে লোকটা কে ?

—যে কমলেশকে খুনটা করেছে, এখন দোষটা আমার ওয়াইফের ঘাড়ে চাপাতে চাইছে…

বাসু বিরক্ত হয়ে বললেন, আঃ ! সে লোকটার পরিচয় কী ? তার পিতৃ-দত্ত নাম ?

ত্রিদিব মুখটা নিচু করল। রুমাল বার করে মুখটা মুছল। তারপর বলল, ডক্টর প্রতুলচন্দ্র ব্যানার্জি, এম. আর. সি. পি.।

—ডক্টর ব্যানার্জি ? তোমার স্ত্রীর প্রাকবিবাহযুগের প্রণয়ী ?

—শুধু প্রাকবিবাহ নয় স্যার, আমার অনুমান বিবাহোত্তর জীবনেও।

—তুমি বলতে চাও তোমার স্ত্রী মধ্যরাত্রে ডক্টর ব্যানার্জির বাড়িতে গেছিল ?

ত্রিদিব গম্ভীরভাবে বলল, হ্যাঁ এবং না।

—তার মানে ?

—ছন্দা ওই ডাক্তার বাঁড়ুজ্জের কাছেই গেছিল। তবে তাঁর বাড়িতে নয় !

—তুমি কেমন করে জানলে ?

—তাহলে আপনাকে সবটা গুছিয়ে বলতে হয়।

বাসু এবার আর বিরক্ত হলেন না। বুঝতে পারছেন, এটাই ওর কথা বলার ধরন। বললেন, তাই বল ?

—ওকে ফলো করা যখন অসম্ভব হয়ে গেল তখন আমি ডাক্তার ব্যানার্জির বাড়িতে একটা ফোন করি। রাত তখন পৌনে একটা।

—বাড়িতে না নার্সিং হোমে ?

—আজ্ঞে না। বাড়িতে। ওঁর বাড়ি ওই নার্সিং হোম-এরই তিন-তলায়। উনি ব্যাচিলার। একটি ওড়িয়া কম্বাইন্ড-হ্যান্ডকে নিয়ে ওই নার্সিং-হোমেরই তিন-তলায় দু-কামরার ফ্ল্যাটে থাকেন।

—ঠিক আছে। তারপর ?

—বেশ অনেকক্ষণ রিঙিং টোনের পর টেলিফোনটা তুলল ওঁর কম্বাইন্ড হ্যান্ড। জানাল যে, ডাক্তারবাবু বাড়ি নেই। তাকে আমি বলেছিলাম,

একটা জরুরী কেসে ডাক্তারবাবুকে খুঁজছি। তাঁকে কি নার্সিং-হোমের নাম্বারে পাওয়া যাবে? লোকটা জানাল—না। ডাক্তারবাবু গাড়ি নিয়ে কোথায় যেন বেরিয়ে গেছেন।

—তুমি কি তোমার নাম জানিয়েছিলে?

—না। আমি গোটা ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছিলাম, আড়াল থেকে।

—অল রাইট। আড়ালে থেকে তুমি গোটা ব্যাপারের কী বুঝলে শেষ পর্যন্ত?

—সবটা বুঝিনি। যেটুকু বুঝেছি তা এই: আমার ওয়াইফ আমাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ডাক্তার ব্যানার্জির কাছে যায়। তারপর দু-জনে একসঙ্গে যায় তারাতলায়। খুন ঐ ব্যানার্জিই করেছে আর ছন্দা বোকামি করে তার চাবিটা ফেলে এসে ভীষণ বিপদে পড়ে গেছে।

বাসু বললেন, একটা কথা বুঝিয়ে বল তো। তুমি সরাসরি তোমার স্ত্রীকে এসব প্রশ্ন করছ না কেন? কেন সে তোমাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়েছিল। কেন মধ্যরাত্রে তোমাকে না-জানিয়ে শয্যাত্যাগ করে গাড়ি নিয়ে বার হয়েছিল এবং কীভাবে খবরের কাগজে তার চাবির ফটোটা ছাপা হয়েছে।

ত্রিদিব সোজা হয়ে বসল। কপালের চুলটা সরিয়ে দিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, তা আমি জানতে চাইতে পারি না।

—কিন্তু কেন?

—যেহেতু আমার ধমনীতে বইছে শক্তাবৎ রাজরক্ত। আমরা এভাবে কারও ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারি না।

বাসু বিরক্ত হয়ে বলেন, লুক হিয়ার, ইয়াং ম্যান। তুমি অহেতুক, ঈর্ষান্বিত হয়ে এসব আজগুবি কথা ভাবছ। রাত দেড়টার সময় ডাক্তার ব্যানার্জি বাড়িতে না-থাকায় এটা মোটেই প্রমাণিত হয় না যে, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কোথাও রাদেভুঁ ছিল। তোমার স্ত্রী যদি অভিসারে যেতে চায় তাহলে ডাক্তার ব্যানার্জির ফ্ল্যাটেই যেতে পারত। আসলে ব্যানার্জি হয়তো কোনো রুগি দেখতে গেছিলেন। আবার তোমার স্ত্রীর চাবির থোকা ওই বাড়িতে আবিষ্কৃত হওয়ার অর্থও এ নয় যে, খুনের সময় সে সেখানে ছিল। হয়তো কমলেশকে সে চিনত, দিনের বেলা তোমার স্ত্রী তার সঙ্গে দেখা করতে গেছিল।

—ফর য়োর ইনফরমেশন, স্যার, কমলেশ আমার ওয়াইফের প্রথম পক্ষের স্বামী।

—আই সী। আর একটা কথা বুঝিয়ে বল তো। তুমি তখন একজন দারোয়ানের ছুটি নেবার কথা বললে। ওই দারোয়ান কতদিন ও বাড়িতে চাকরি করছে আর কবে থেকে ছুটিতে আছে।

—মহাদেব প্রসাদ আমার পিতাজির একজন বিশ্বস্ত কর্মী। আমি যখন কলকাতার কলেজে পড়তে আসি তখন সে নাসিক থেকে চলে আসে। সে ঠিক দারোয়ান নয়, অল্প বয়সে সে বস্তুত আমার লোকাল-গার্জেনও ছিল। আমার

রান্নাবান্নাও সে করে দিত। আমি বিয়ে করার পর সে ছুটি নিয়ে দেশে চলে যায়—

—ছুটি সে চেয়েছিল, না তুমিই তাকে তাড়ালে ? নাকি তোমার স্ত্রী···

—ইন ফ্যাক্ট, পিতাজি আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পরেই তাকে তাড়া করেন। ও নাসিকে যায়। সেখান থেকে দেশে চলে যায়।

—তার মানে কাল গভীর রাত্রে তোমার স্ত্রী যে গাড়ি নিয়ে বাইরে গেছিল এ কথা তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না—তাই তো ?

—সম্ভবত তাই। অন্তত আমি এখনও কাউকে বলিনি।

—সেক্ষেত্রে তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে : তোমাদের গ্যারেজের ওই 'নবতাল' তালার পরিবর্তে অন্য একটি বড়ো তালা ওখানে ঝোলানো। তাহলে হয়তো পুলিসের নজর তোমাদের দিকে আদৌ পড়বে না।

—এ-কথা কেন বলছেন ?

—সেটাই স্বাভাবিক। পুলিস মোটর-ভেহিক্‌লস-এ গিয়ে খবর নেবে একই পরিবারভুক্ত কয়টি ক্ষেত্রে ডব্‌ল্‌-লাইসেন্স আছে—একটি মারুতি এবং একটি অ্যামবাসাডার। কলকাতা শহরে এমন পাঁচ-দশটা কেস তারা হয়তো প্যাবে—কিন্তু প্রত্যেকটি সম্ভ্রান্ত পরিবার। দু-দুটো গাড়ি বড়োলোক ছাড়া কেউ পোষে না। ফলে পুলিস গোয়েন্দা নিয়োগ করবে। যে সব পরিবারের নামে জোড়া লাইসেন্স আছে সেখানে গিয়ে খবর নেবে কার গ্যারেজে 'নবতাল' তালা আছে ? তারপর যে নবতাল-তালার চাবিটা পুলিসের হেপাজতে আছে···

ত্রিদিব বাধা দিয়ে বলল, আপনি কি আমাকে এভিডেন্স ট্যাম্পার করতে পরামর্শ দিচ্ছেন ?

বাসু ওর চোখের দিকে পুরো দশ-সেকেন্ড নির্বাক তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, তুমি কি চাও পুলিস খুঁজতে খুঁজতে ওই 'নবতাল' তালাটা আবিষ্কার করুক ? সাত দিনের ভিতর ?

ত্রিদিব দৃঢ়স্বরে বলল, সাত দিন কেন ? আজই পুলিস তা জানবে।

—মানে ?

—কারণ আপনার এখান থেকে আমি সরাসরি পুলিস-স্টেশানে যাব। আমি যা দেখেছি, যা জানি, যা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে কর্তৃপক্ষকে জানানো উচিত তা অকপটে এজাহারে জানাব।

বাসু চমকে ওঠেন : গুড গড ! কেন ? কেন এ কাজ করবে তুমি ?

—যেহেতু এটাই আমার শিক্ষা। এটাই আমার খানদান। আমার ধমনীতে বইছে শক্তাবৎ রাজপুত রাজরক্ত।

বাসু অসহায়ভাবে মাথা নাড়েন। বলেন, কিন্তু তোমার স্ত্রী তো খুনী নাও হতে পারে।

—অফ কোর্স শি ইজ ইনোসেন্ট। খুন সে করেনি। করেছে ডাক্তার ব্যানার্জি। এখন সে পরস্ত্রীর পেটিকোটের আড়ালে লুকাতে চাইছে।

আপনি কেন এই সহজ ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না, স্যার ? রাত বারোটা পঁয়তাল্লিশে ডাক্তার ব্যানার্জি বাড়িতে অনুপস্থিত। ছন্দা তার নৈশ অভিসারে বার হল তার ঠিক দশ মিনিট আগে, বারোটা পঁয়ত্রিশে। রাত একটা কুড়িতে তারাতলায় খুন হল কমলেশ। আর তারাতলা থেকে গাড়িতে মাঝ রাত্রে আসতে যে পনেরো মিনিট লাগে, সেই সময়ের ব্যবধানে ছন্দা ফিরে এল কাঁটায় কাঁটায় একটা পঁয়ত্রিশে। হিসাবটা তো জলের মতো পরিষ্কার। খুনটা করেছে ব্যানার্জি, কিন্তু ছন্দার উপস্থিতিতে। আর এখন চাবিটা ফেলে আসায় সবটা দোষ চাপছে আমার ওয়াইফের ঘাড়ে। ওকে বাঁচাতেই হবে, স্যার···

বাসু বললেন, তোমার স্ত্রী যে ঠিক একটা পঁয়ত্রিশে ফিরে এসেছে তা তুমি জানলে কী করে ?

—ঘড়ি দেখে। আমি জেগেই ছিলাম। গাড়ির শব্দ পেয়ে জানলার ধারে এগিয়ে এলাম। দেখলাম স্বচক্ষে। ছন্দা তালা খুলল। পাল্লাটা ঠেলে দিয়ে গাড়ি গ্যারেজ করল। তারপর এগিয়ে এল বাড়ির দিকে। আমি তৎক্ষণাৎ বিছানায় শুয়ে পড়লাম···

—জাস্ট এ মিনিট। ছন্দা গাড়ি গ্যারেজ করার পর আবার পাল্লাটা ঠেলে বন্ধ করল না ? 'নবতাল' তালাটা লাগাল না ?

ত্রিদিব একটু চিন্তা করে বলল, না। যদ্দুর মনে পড়ছে—না !

—কেন ?

—কারণ আজ সকালে যখন আমি নিঃশব্দে বেরিয়ে আসি, তখন গ্যারেজের পাল্লাটা খোলাই ছিল।

—তা নয়। আমি জানতে চাইছি, ছন্দা কী কারণে গ্যারেজ বন্ধ করে তালা লাগাল না ?

—গ্যারেজটা মাপে একটু ছোটো। অ্যামবাসাডারটার সই-সই। কখনও কখনও রাস্তায় ভারি ট্রাক গেলে গ্যারেজটা কাঁপে। তখন অ্যামবাসাডার গাড়িটা একটু সড়ে-নড়ে যায়। সেক্ষেত্রে পাল্লাটা বন্ধ হয় না। তখন অ্যামবাসাডারটাকে সামনের দিকে একটু এগিয়ে নিতে হয়। ছন্দা সে রিস্ক নেয়নি। কারণ অ্যামবাসাডারটা স্টার্ট নেবার সময় বেশ শব্দ হয়। ওর আশংকা হয়েছিল হয়তো আমার ঘুম ভেঙে যাবে।

—আজ সকালে তুমি যখন আমার কাছে চলে আস তখন তোমার স্ত্রী কী করছিল ?

—অঘোরে ঘুমাচ্ছিল।

—ও জানে না, তুমি উঠে চলে এসেছ ?

—নাঃ !

—আশ্চর্য ! কেন ? ওকে না জানিয়ে এভাবে চলে এলে কেন ?

—কেন নয় ? আমার ওয়াইফ যদি আমাকে না জানিয়ে মধ্যরাত্রে শয্যা-ত্যাগ করতে পারে, তাহলে সূর্যোদয়ের পর···

—তা বটে। তা এত সকালে কোথায় যাচ্ছিলে তুমি ?

—তা বলতে পারব না। তবে ওর সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে থাকতেও পারছিলাম না। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েই দেখি কাগজওলা বারান্দায় ছুঁড়ে কাগজ ফেলে গেছে। সেটা খুলে পড়তেই দেখি প্রথম পাতায় বার হয়েছে কমলেশ বিশ্বাস খুন হয়েছে। আমি জানতাম, ছন্দার প্রথম পক্ষের স্বামীর নাম 'কমলেশ বিশ্বাস'; কিন্তু আমার ধারণা ছিল সে মৃত। কাগজের পঞ্চম পৃষ্ঠাটা খুলেই বুঝতে পারলাম, বাস্তবে কী ঘটেছে। ব্যানার্জি আর ছন্দা কাল রাত্রে কমলেশকে খুন করতে গেছিল। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে ড্রয়ারটা টেনে দেখি তাতে এক সেট চাবি রয়েছে; দ্বিতীয় সেট আমার পকেটে। ফলে বুঝতে অসুবিধা হল না, কাগজে যে ছবিটা ছেপেছে তা ছন্দার চাবির গোছা। তখনই গ্যারেজ থেকে গাড়িটা বার করে আপনার কাছে চলে এলাম···

—তুমি আমার বাড়ি চিনতে ?

ত্রিদিব একটু ভেবে নিয়ে বলল, হ্যাঁ চিনতাম।

—কীভাবে ?

আবার একটু ভেবে নিয়ে বলল, সরি স্যার! ঠিক বলতে পারব না। স্বীকারই করি—আমি ডাঃ ব্যানার্জীর নার্সিং'হোমে ভর্তি হয়েছিলাম মানসিক রোগী হিসাবে। সব কথা আমি সব সময় মনে করতে পারি না।

—অল রাইট! তুমি আমার কাছে কেন এসেছিলে ? ঠিক কী চাও ?

—আমার ওয়াইফকে বাঁচাতে। আমার খানদানকে বাঁচাতে!

—তা যদি বাঁচাতে চাও ত্রিদিব, তাহলে তুমি নিজে থেকে কিছুতেই পুলিসে যেতে পার না!

—দ্যাটস্ ইম্‌পসিব্‌ল, স্যার! আমি রাঠোর রাজপুত! শক্তাবৎ!

—আই সি! কিন্তু তুমি যে আমাকে নিয়োগ করতে চাও তাতে আমার জানা দরকার আমার ক্লায়েন্ট কে ? তুমি না তোমার স্ত্রী ?

—অফ্ কোর্স আমার ওয়াইফ! আর যদি সম্ভবপর হয় তাহলে এই খুনের মামলায় যেন আমাদের খানদান'টা জড়িয়ে না পড়ে। আমার বাবার নামটা···

—তোমার বাবার নামটা তো তুমি নিজেই জড়াচ্ছ। পুলিসে গিয়ে এজাহার দিতে গেলে প্রথম পংক্তিতেই তো তোমার বাবার নামটা বলতে হবে।

ত্রিদিব গুম মেরে বসে থাকল।

—দ্বিতীয়ত, তোমার বাবাকে আমার দরকার 'ফি'টা মেটানোর জন্য। আমার এটাই তো পেশা···

—আই নো, আই নো,। কিন্তু সে প্রয়োজনে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা বৃথা। তিনি আমার ওয়াইফকে বাঁচানোর জন্য একটা পয়সাও খরচ করবেন না!

—কেন ? সে তাঁর পুত্রবধূ! 'খানদান'-এর ঐতিহ্যটা বাঁচাতে হলে তাঁর পক্ষে পুত্রবধূকে রক্ষা করাই তো স্বাভাবিক।

—আজ্ঞে না। তাহলে আপনাকে ব্যাপারটা গোড়া থেকে বুঝিয়ে বলতে হয়।

—থাক ত্রিদিব। আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে না। শুধু একটা কথা বল: তোমার বাবার সুনাম, তোমাদের 'খানদান' ইত্যাদির খাতিরে তুমি কি পুলিস-স্টেশানে যাবার ইচ্ছাটা আপাতত মুলতুবি রাখবে? আর 'নবতাল' তালাটা বদলে দেবে?

ত্রিদিব উঠে দাঁড়াল। বলল, সরি স্যার। আপনি আমাকে ঠিক চিনতে পারেননি। এভিডেন্স নষ্ট করা অথবা সত্য গোপন করা সাত শতাব্দী ধরে কোনো শক্তাবৎ রাজপুত করেনি। আমিও করতে পারব না।

মাথা খাড়া রেখেই গট গট করে বেরিয়ে গেল সে। শুধু দরজার কাছে একবার থমকে দাঁড়াল। পিছন ফিরে বলল, আপনার বিলটা আমাকে পাঠিয়ে দেবেন, স্যার। দরকার হয় ঘড়ি-আংটি বেচে আমি আপনার ফি-টা মেটাব। আর তাছাড়া জানেন নিশ্চয়—আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রটা বাঙালীদের মতো দায়ভাগের নয়। মিতাক্ষরা সূত্রে।

বাসু বললেন, মনে আছে। তুমি বলেছিলে যে, তুমি ল-পাস।

॥ আট ॥



শক্তাবৎ রাজপুতের নাটকীয় প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ে তিনজনে—সস্ত্রীক কৌশিক আর রানু।

রানুই তাদের যৌথ জিজ্ঞাসাটা বাঙ্ময় করে তুললেন: কেন এসেছিল? ওই শক্তাবৎ রাজপুত্র?

—আমাকে কিছু আইনের পরামর্শ দিতে!

—তোমাকে! আইনের পরামর্শ! কী সেটা?

শক্তাবৎ রাজপুতদের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সূত্রটা মিতাক্ষরা আইনে, ভেতো-বাঙালিদের মতো 'দায়ভাগ' সূত্রে নয়।

ওঁরা তিনজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন।

বাসু বলেন, ওসব আইনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূত্র তোমরা বুঝবে না। রানু, দেখ তো ত্রিদিব নাম-ঠিকানার সঙ্গে ওর টেলিফোন নাম্বারটা রেখে গেছে কি না। থাকলে ইমিডেটলি ফোন কর। ছন্দা বাড়িতে আছে। বোধহয় এখনো ঘুমাচ্ছে। তাকে আমার দরকার।

বেলা তখন আটটা। তবু ছন্দা ঘুমোচ্ছিল। শেষ রাতে কড়া ঘুমের ওষুধ খাবার ফলে। বেশ কিছুক্ষণ রিঙিং-টোনের পর ঘুম-জড়ানো কণ্ঠে সাড়া দিল সে। বাসু বললেন, ছন্দা? এখনো ঘুম ছোটেনি? শোন! যা বলছি মন দিয়ে শোন!

—আপনি কি, স্যার, বাসু-সাহেব বলছেন?

—তাই বলছি! কাল রাত্রে কী ঘটেছে তা তুমি জান! আমিও জানি!

ও-প্রান্তে ছন্দা একটা চাপা আর্তনাদ করে উঠল। বোঝা গেল, এতক্ষণ সে ছিল আধোঘুমের ঘোরে। গত রাত্রের বিভীষিকাটা ওর স্মৃতিপথে ছিল না। এতক্ষণে সে পুরোপুরি জেগে উঠল, সচেতন হল। লক্ষ্য করে দেখল, পাশের বিছানাটা খালি। কণ্ঠস্বরে সংযম এনে বলল, আমি···আমি বুঝতে পারছি না, আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন? কাল রাত্রে···মানে, কী এমন ঘটেছে?

—লুক হিয়ার, ছন্দা। তোমার ওসব পুরনো প্যাঁচ শিকেয় তুলে রাখ। তোমাকে যা বলছি তা বিনা প্রশ্নে অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। কেন তা করতে বলছি, সে-কথা যখন দেখা হবে তখন বুঝিয়ে বলব। এখন নয়। ফলো?

—বলুন?

—মিনিট পনেরোর ভিতর মিসেস্ সুজাতা মিত্র অফ 'সুকৌশলী' তোমার কাছে যাবে। এই পনেরো মিনিটের ভিতর একটা ওভার-নাইট ব্যাগে তোমার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভরে তৈরি হয়ে থেকো, যাতে সুজাতা পৌঁছানো মাত্র, তার আইডেন্টিটি প্রমাণ করা মাত্র, তুমি ওর সাথে রওনা হতে পার। দু-চার দিনের জন্য তোমাকে হয়তো অন্যত্র যেতে হবে। তোমার স্বামীর জন্যে···সে এখন ঘরে নেই তা আমি জানি—কোনো নোট রেখে যাবার প্রয়োজন নেই···

ছন্দা প্রতিপ্রশ্ন না করে পারে না, ও কোথায়?

—পাঁচ মিনিট আগেও আমার চেম্বারে ছিল। এখন নেই। প্লিজ! কোনো প্রশ্ন টেলিফোনে কর না। ঠিক যা যা বলছি তাই করো, সুজাতা তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবে।

ছন্দা আরও কিছু বলতে চাইছিল, পারল না,—কারণ বাসু-সাহেব লাইন কেটে দিয়ে সুজাতার দিকে ফিরলেন, শোনো সুজাতা। ত্রিদিব থানায় গিয়ে এজাহার দেওয়ামাত্র তার ফ্ল্যাট রেইড হবে। হয়তো মিনিট কুড়ি-পঁচিশ সময় আছে। তোমাকে কী কী করতে হবে তা তুমি নিজেই স্থির করে নিও। আমি কিছু ইনস্ট্রাকশন দেব না, দিতে পারি না। আমি শুধু আমার সমস্যাটার কথা তোমাকে বলছি। প্রথম কথা: ছন্দা আমার ক্লায়েন্ট, তার পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস আমি জানব, এটাই স্বাভাবিক; কিন্তু দু-তিন দিনের জন্য সে যদি কোথাও বেড়াতে যায়—আমাকে না জানিয়ে—তাহলে তার ঠিকানা আমার জানার কথা নয়। পুলিসে জানতে চাইলে আমি নাচার। তবে আমি আশা করি—যেহেতু ছন্দা বুদ্ধিমতী—তাই কোনো হোটেলে গিয়ে উঠলে স্বনামেই রেজিস্ট্রি খাতায় সই করবে। কারণ অন্যথায় মনে হতে পারে যে, আইনের হাত থেকে সে পালাতে চাইছে। সে দোষী, অন্তত জ্ঞান-পাপী! সে তাই নয়! তোমার কী মনে হয়?

সুজাতা কোনো জবাব দিল না। রানুর দিকে ফিরে বলল, মামিমা আমি একটু বেরুচ্ছি। রাতে না ফিরতে পারলে চিন্তা করবেন না।

কৌশিক মানিব্যাগ খুলে এক বাণ্ডিল নোট ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল।

সুজাতা সেটা ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

বাসুও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, কৌশিক তুমি দেখ রবির কাছ থেকে পুলিস-ইনভেস্টিগেশনের আর কিছু ডিটেইলস পাওয়া যায় কি না। তাছাড়া পত্রিকা-অফিসের ওই নিজস্ব সংবাদদাতার তোলা ফটোর কপিগুলো পাওয়া যায় কি না। চিফ নিউজ-এডিটার আমাকে খুবই খাতির করে।

কৌশিক জানতে চায়, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

—একবার তারাতলা ঘুরে আসি। ঘটনাটা যেখানে ঘটেছে।

রানু জানতে চান, দুপুরে বাড়িতে কে-কে লাঞ্চ করছ?

বাসু বলেন, সুজাতা বাদে আমরা তিনজনই।

তারাতলার অসমাপ্ত সন্তোষী-মা অ্যাপার্টমেন্টের সামনে টুলে বসে দুই সেপাই আপনমনে হাততালি দিচ্ছে। গাড়িটা কাছাকাছি এসে পড়ার পর বোঝা গেল, ওদের করধ্বনি কারও সাফল্যজনিত হেতুতে নয়—তারা দুজন মৌজ করে খৈনি বানাচ্ছে। বাসু-সাহেবকে গাড়িটা পার্ক করে নেমে আসতে দেখে তারা চঞ্চল হল না। টুলে বসে বসেই প্রশ্ন করল, ক্যা চাহিয়ে সাব?

—এ বাড়ির দেড়তলায় যিনি থাকতেন—কমলেশ বিশ্বাস···

—হুঁ। তিনি গুজর গিয়েসেন, মানে-কি ফৌত হইয়েসেন। আখবরে দেখেন নাই?

—হ্যাঁ, খবরের কাগজে দেখেই তো খোঁজ নিতে এসেছি।

—অখন কী তালাশ নিবেন? মুর্দা তো লাশকাটা ঘরে চালান হইয়ে গেল।

—সেটা আন্দাজ করেছি। আমি কি একবার ওর ঘরটা দেখে আসতে পারি, সেপাইজী? তোমাদের সঙ্গেই—মানে, কালও আমি এসেছিলাম কমলেশের কাছে, একটা জিনিস ভুলে ফেলে গেছি···

—কুঞ্চি? এক রিংমে তিনঠো চাবিকা বাৎ বোল্‌তে ক্যা?

—না, না, চাবি নয়। একটা নোটবই, মানে ডায়েরি।

—মাফ কিজিয়ে সাব। বিনা-পারমিট ভিতর-যানা মানা হৈ!

অগত্যা বাসু-সাহেব এপাশে ফিরলেন। বটুকনাথ দুলে দুলে বিড়ি বাঁধছে, কিন্তু নজর ছিল এদিকেই। বাসু-সাহেবের গাড়ি এ গলিতে ঢোকার পর থেকেই। বাসু ওর দোকানের দিকে এগিয়ে গেলেন। বটুক বিনা বাক্যব্যয়ে তার উপস্থিত খদ্দেরকে পান দিল নোট নিয়ে রেজগি দিল। তারপর দোকানটা ফাঁকা হতেই টিনের কৌটা খুলে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে বাড়িয়ে ধরল বাসু-সাহেবের দিকে। বললে, একটা দেশলাইয়ের দাম মিটিয়ে দেবেন স্যার, নিন ধরুন!

—তার মানে?

—কাল রাতভোর ধকল গেছে! কী কুক্ষণে থানায় টেলিফোন করার দুর্মতি যে হল! জবানবন্দি দিতে দিতে জান নিকলে গেছে। একবার পুলিস, একবার খবরের কাগজ···

—সে তো বুঝলাম। টেলিফোনটা করে তুমি নাগরিকের কর্তব্য পালন করেছ, বটুক। তা ভালো কাজ করলেই নাকাল হতে হয়। এটাই হচ্ছে দুনিয়ার নিয়ম, কিন্তু ওই নোটটা আমাকে ফেরত দিচ্ছ কেন?

—দারোগাবাবু যাবার আগে হুকুম দে' গেলেন, আমাদের যা বললে তা যদি বাইরের কোনও মনিষ্যিকে বল তাইলে সোজা হাজতে ঢুকিয়ে দোব। ইদিকে আপনার কাছ থেকে আগাম নে বসি আছি, উদিকে আমি ছা-পোষা মনিষ্যি।

বাসু পাইপটা ধরাতে ধরাতে বললেন, যদিও তুমি ঠিক ছা-পোষা মানুষ এখনো হওনি, তবে মাস-ছয়েকের ভিতরেই তা হতে চলেছ। আমি তোমার সমস্যাটা বুঝতে পারছি, বটুক। ঠিক আছে, তোমার কাছে কিছু জানতে চাইব না। তবে আমারও মুশকিল কী জান? যাকে যা দিই তা আর ফেরত নিই না। ওটা তোমার কাছেই থাক। আচ্ছা চলি···

বাসু পিছন ফিরলেন। বটুক নোটটা হাতে নিয়ে বিহ্বল হয়ে বসে রইল। আবার এদিক ফিরে বাসু বললেন, তুমি শুধু একটা কথা স্মরণ রেখ, বটুক—টাকাটা তোমাকে আমি দিয়েছিলাম ঘটনা ঘটে যাবার অনেক আগে। পুলিসের সাক্ষী ভাঙাতে ঘুষ দিইনি আমি। তাই না? তোমার তীক্ষ্ন দৃষ্টি আর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে খুশি মনে দেশলাই কিনে ভাঙানিটা ফেরত নিইনি। ঠিক বলছি তো, বটুক?

এতক্ষণ নজর হয়নি—দোকানের পিছন দিকে অন্ধকারে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল একজন। সে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। একপা এগিয়ে এসে বটুকের হাত থেকে পঞ্চাশ টাকার নোটখানা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে বাসু-সাহেবের দিকে ফিরল। মাথার উপর ঘোমটা টেনে দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললে, আমার নাম সদু···সোদামিনী, আজ্ঞে। আমারে দারোগবাবু শাসায়ে যায়নি। গ্যালেও আমি কান দিতাম না। এই ভিতুর ডিম মুখে কুলুপ আঁইট্রে রাখতে চায় তো রাখুক। ভীমা কৈবর্তের মাইয়া কারুরে ডরায় না। কী জিগাইবেন জিগান! পঞ্চাশ ট্যাহা বর্শকিস্ দেবার মতো হিম্মৎ কইলকাত্তা শহরে আছে কয়জন ভদ্দরলোকের? শহরের সব বীরপুরুষই তো প্যাটের তলায় ন্যাজ স্যাঁদায়ে···

শেষ দিকের বাক্যটা সে তার মরদের দিকে ফিরে বলছিল। হঠাৎ বটুক যেন সংবিৎ ফিরে পেল। কঠিন স্বরে তার ধর্মপত্নীকে প্রথমেই একটা ধমক দিল, তুই ঘর যা কেনে! সাহেবরে আমিই সব বুলব অনে? হল তো?

সোদামিনী হাসল। বিজয়িনীর হাসি। মরদের আদেশটা সে নিষ্কথায় মেনে নিল। তবে অন্ধকারে পিছন দিকে মিলিয়ে যাবার আগে বাসু-সাহেবের দিকে হেসে যুক্তকরে প্রণাম জানাতে ভুলল না। আর বলা বাহুল্য: যাবার আগে তার বিজয়িনীর ট্রফিটা—যেটা এতক্ষণ ধরাই ছিল তার দু-আঙুলে—আঁচলের খুঁটে বেঁধে নিতেও ভুল হল না।

বাসু বাধা দিয়ে বললেন, না বটুক! তোমাকে বিপদে ফেলব না আমি।

দারোগাবাবুর আদেশ না মানলে তোমাদের মত দোকানদারের কী হাল হয় তা আমার জানা। আমার বিশ্বাস, তুমি যা দেখেছ যা বুঝেছ তা সবই বলেছ পুলিসকে এবং খবরের কাগজকে। তুমি শুধু বল, তুমি কি এমন কোনো তথ্য পুলিসে বা খবরের কাগজের বাবুকে জানিয়েছ যা সংবাদ পত্রে ছাপা হয়নি।

—আজ্ঞে না, স্যার। তবে দু-একটা কথা আমি ওদের আদৌ বলিনি।

—কী কথা তা আমি জানতে চাইছি না ; কিন্তু কেন বলনি ?

—দেখুন, স্যার—পুলিসের উপর আমার একটুও বিশ্বাস নেই। ওরা আসে শুধু মানুষজনেরে হয়রান করতে, আর টাকা খেতে। বেশ বুঝতে পারছি—ওই বিশ্বাসবাবু ছিল একটি হাড়-হারামজাদা মনিষ্যি! অনেক-অনেক মেয়েরে সে ফাঁসায়েছে। তাদেরই বাপ-ভাইয়ের কেউ একজন হয়তো ওরে খুন করে গেছে! আপনি বলবেন, আইন নিজের হাতে নেওয়ার হক কারও নেই! ভালো কথা, কিন্তু আইন ওই কমলেশকে কি অ্যাদ্দিন অপকর্ম থেকে ঠেকাতে পারছিল ? আমি যদি হক কথাটা বলি, তাহলে বেহুদ্দো আমার কয়েকজন খদ্দেরের পিছনে লাগবে ওরা। তাতে আমার লাভ তো অষ্টরম্ভা, লোকশানই ষোলোকলা।

বাসু বললেন, বুঝলাম। এবার বল, কথাটা কী ? কী দেখেছ তুমি, যা পুলিসকে বা কাগজের লোককে জানাওনি।

বটুক চারিদিকে একবার দেখে নিয়ে নিম্নকণ্ঠে বলে, টর্চের আলোয় মেজেয় লুটিয়ে পড়া মানুষডার একটা ঠ্যাঙ দেখে আমি সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যাই ডাক্তারবাবুরে ডাকতে। তা সেই দেড়তলা থেকে দোতলায় উঠবার সময় সিঁড়ির জানলা দিয়ে আমি দেখতে পাই গলি দিয়ে পর পর দু-খানা গাড়ি হুস্ হুস্ করে বার হয়ে গেল। আমাদের বাড়িতে সিঁড়ি ঘরের বাইরের দিকে কাচের টানা জানলা আছে—তা দিয়ে গলি তো বটেই, তারাতলা রোডটাও দেখা যায়। আমি দেখলাম, গলি দিয়ে যে দু-খানা গাড়ি বার হয়ে গেল, তার একটা মোটরসাইকেল, একটা মারুতি ভ্যান। আর ঠিক তার পরেই—বলা যায় লগে-লগেই—গলির-মুখে-দাঁড়ানো একটা গাড়ি স্টার্ট নিল। সে বাইরের দিকে মুখ করেই ছিল। কী গাড়ি কইতে পারব না।

—গাড়ির ভিতরে যারা ছিল তাদের দেখতে পাওনি ?

—আজ্ঞে না। পেলেও ঘোর আঁধারে চেনা যেত না। তবে···

—কী তবে ?

—বলাটা উচিত হবে কি না তাই ভাবছি!

—আমি তো পুলিস নই, খবরের কাগজেরও কেউ নই।

—তাইলে আপনারই বা এত উতাধাই কেন, তা আমারে আগে বোঝান।

এই 'উতাধাই' শব্দ-প্রয়োগেই বাসু-সাহেব বটুকচন্দ্রের জাতি নির্ণয় করে ফেলেন। এ গলিতে সে হাফ-প্যান্ট পরে মার্বেল খেলে থাকতে পারে। কিন্তু সে অথবা তার পিতৃদেব এককালে নির্ঘাৎ ওপার-বাঙলা থেকে এ-দেশে

এসেছেন। এপার বাঙলায় কেউ 'কৌতূহল' শব্দের সমার্থ হিসাবে 'উত্তাধাই' বলবে না। মায় 'সমার্থ-শব্দকোষ' লেখক অশোক মুখুজ্জে পর্যন্ত না।
বাসু বলেন, শোন বটুক। আমার এক মক্কেল ওই বিবাহ-বিশারদ কমলেশের পরিত্যক্তা স্ত্রী! তার গহনাগাটি নিয়ে লোকটা সটকেছিল। আমার আশঙ্কা পুলিস সেই নিরপরাধিনীর ঘাড়ে হত্যার অপরাধটা চাপাতে চাইবে। তাই তাকে বাঁচাবার জন্য আমি অগ্রিম সন্ধান নিয়ে চলেছি।

—তাহলে আমি আপনার লগে আছি। সব রকম সাহায্য করতে রাজি। আমি আন্দাজ করেছি, কে খুন করেছে। সে আপনার মক্কেল নয়। সে পুরুষ মানুষ।

—তুমি তাকে চেন?

—স্যার, সে-কথা জিগাবেন না। আপনার মতো সেও আমারে কিছু আগাম দে' গেছে। সন্ধে রাতে মোটর সাইকেলে চেপে—তারে তো আপনি চেনেনই—সেই বাবু আবার আমার কাছে এয়েছিল। আন্দাজ তখন সাতটা। তখনো কমলেশবাবু ফেরেনি। তার কথা আপনারে কেমন করে বলি, বলুন? আমি তো তারও নিমক খায়ে বসি আছি।

—বুঝেছি বটুক! আর কিছু বলতে হবে না তোমাকে।

* * *

তারাতলা থেকে ডায়মণ্ড-হারবার রোডে পৌঁছে বাসু-সাহেব গাড়িকে পার্ক করলেন। একটা পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে বাড়িতে ফোন করলেন। ধরলেন রানু। বাসু জানতে চাইলেন, সুজাতা কি তোমাকে ফোন করে কিছু জানিয়েছে? নিউ আলিপুরের লেটেস্ট নিউজ কী?

রানু জবাবে বললেন, আজ্ঞে না, মিস্টার বাসু কাজে বেরিয়েছেন, অ্যারাউণ্ড একটা নাগাদ লাঞ্চে আসবেন।

বাসু ধমক দিয়ে ওঠেন, কাকে কী বলছ গো? আমি তোমার কর্তাই বলছি। সুজাতা কি কোনো…

কথাটা শেষ হয় না, তার আগেই রানু বলে ওঠেন, বেশ তো কাল সকালে আসুন। আমি ওঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্যাডে লিখে রাখছি!

এবার মালুম হল। বাসু বলেন, তোমার সামনে কেউ বসে আছে? তাই ক আবোল-তাবোল বকছ?

—এক্‌জ্যাক্টলি!

—পুলিস ইন্সপেক্টার? আমার সন্ধানে এসে ঠায় বসে আছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠিকই বলেছেন!

—বুঝেছি। এবার এমনভাবে প্রশ্ন করছি যাতে তোমার উত্তর 'হ্যাঁ-না'-র মধ্যে রাখতে পার। সুজাতা কি সফলকাম হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—ওরা দুজনে কোথায় গিয়ে উঠেছে তা তুমি জান না, কেমন

—ঠিক তাই।

—তোমার সামনে যে লোকটা বসে আছে সে কি হোমিসাইড-স্কোয়াডের সতীশ বর্মন ?

—একজ্যাক্টলি।

—আর তাকে তুমি বলেছ আমি একটার সময় লাঞ্চ খেতে আসব ?

—হাঁ, তাই।

—অল রাইট, আমি আধঘণ্টার মধ্যেই আসছি।

* *

বর্মন অসহিষ্ণু হয়ে বলে ওঠে, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য, বাসু-সাহেব ? আপনার মক্কেলের স্বামী বলছেন, সকাল সাড়ে ছয়টার সময় তাঁর স্ত্রী ঘুমের ওষুধ খেয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছিলেন, আর বেলা আটটা বেয়াল্লিশে তিনি কর্পূরের মত উপে গেলেন ? স্বামীর জন্য একটা নোট পর্যন্ত না রেখে ?

বাসু বললেন, আমি তো আপনাকে কিছু বিশ্বাস করতে বলিনি। সব তথ্য তো আপনিই সরবরাহ করছেন।

—এগুলো ফ্যাক্ট। টেক ইট ফ্রম মি!

—নিলাম। কিন্তু আমার কাছে কী জানতে চাইছেন ?

—আপনার মক্কেল এখন কোথায় ?

—আমি জানি না।

—একথা আপনি আগেও বলেছেন। কিন্তু সেটা কি বিশ্বাসযোগ্য ? আফটার অল সে হল আপনার মক্কেল!

—তার স্বামী কোথায় ?

—আমাদের হেপাজতে।

—সে জানে না তার স্ত্রী কোথায় ? আফটার অল সে হল মেয়েটির স্বামী!

—তার মানে আপনি বলবেন না ?

—আজ্ঞে না। তার মানে, আমি জানি না। জানলে বলতাম। পুলিসের সঙ্গে আমি সব সময়েই সহযোগিতা করে চলি।

বর্মন উঠে দাঁড়ায়। উকিলী-কায়দায় একটা 'বাও' করে বলে, সে তথ্যটা আমি অস্থিতে-অস্থিতে জানি, য়োর অনার!

রাত আটটা নাগাদ ফিরে এল সুজাতা। ভগ্নদূতের মতো। বললে, মামিমা, রাতে খাব আর থাকব।

বাসু বলেন, কী ব্যাপার ? তুমি না বলে গেলে রাতে ফিরবে না।

—তাই বলেছিলাম। কিন্তু আপনি বোধহয় সান্ধ্য-এডিশান খবরের কাগজটা দেখেননি ? তাই নয় ?

—না দেখিনি। কিছু খবর বের হয়েছে ?

—তা হয়েছে। কীর্তিটা আপনার মক্কেলের শিভালরাস্ শস্তাবৎ মরদের। তার উদ্যোগে আজ একটি কাগজের সান্ধ্য-এডিশানে ছন্দার একটি ছবি ছাপা

হয়েছে। পুলিস ছবিটা ছেপে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে, এই মেয়েটিকে তারাতলা-হত্যা বাবদে পুলিসে খুঁজছে। আমরা সেটা জানতাম না ; কিন্তু যে হোটেলে ডবল-বেড রুম বুক করে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম সেই হোটেলের ম্যানেজার কাগজটা দেখে। ছন্দা স্বনামে ঘর নিয়েছিল। ফলে ম্যানেজার তাকে সহজেই শনাক্ত করে। থানায় ফোন করে। রাত সাতটা নাগাদ পুলিসভ্যান এসে পেঁছায়। বডি-ওয়ারেন্ট দেখায়। ওকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায়। বাধ্য হয়ে আমি চেক-আউট করে চলে আসি।

বাসু বললেন, বুঝলাম। সারাটা দিনে তুমি তাকে কতটা জানতে দিয়েছ আর কতটা জেনেছ ?

—আমাকে সে কিছুই বলেনি। ইন ফ্যাক্ট, বলতে চেয়েছিল, আমিই শুনতে রাজি হইনি। তাকে বলেছিলাম, আমাকে তুমি কিছু বোলো না। কারণ পুলিসে আমাকে 'সমন' করলে আদালতে সব কথা আমাকে স্বীকার করতে হবে। আমাকে যা বলবে তা প্রিভিলেজড-কম্যুনিকেশন নয়।

—ভেরি কারেক্ট। কিন্তু তুমি তাকে কতটা জানিয়েছ ?

সুজাতা বলে, আমি শুধু বলেছি যে, ত্রিদিবনারায়ণ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আর কিছু বলিনি। ...ও হ্যাঁ, আর তাকে বলেছিলাম, যদি ঘটনাচক্রে পুলিশে তাকে গ্রেপ্তার করে তাহলে সে যেন কোন অবস্থাতেই কোন জবানবন্দি না দেয়। পুলিস তাকে যে-কোন প্রশ্ন করলেই যেন সে বলে 'আমার অ্যাটর্নির অনুপস্থিতিতে আমি কিছুই বলব না।'

—গুড গ্যের্ল !

।। নয় ।।



পরদিন রবিবার। হেবিয়াস কর্পাস করা যাবে না। আদালত বন্ধ। কিন্তু বাসু-সাহেবকে নিষ্কর্মা বসে থাকতে হল না। বেলা সাড়ে-দশটা নাগাদ বর্মন টেলিফোন করে জানাল যে, বাসু-সাহেবের মক্কেল তাঁর উপস্থিতি ছাড়া কোনো কথারই জবাব দিচ্ছে না। উনি কি আসতে পারবেন হেড-কোয়ার্টার্সে ?

বাসু এলেন। বললেন, আমার মক্কেল জবানবন্দি দেবে কিন্তু তার পূর্বে আমি তার সঙ্গে নির্জনে সাক্ষাৎ করতে চাই।

সে ব্যবস্থাই হল। ছন্দাকে নিয়ে আসা হল ওঁর কাছে, বিশেষ সাক্ষাৎ কক্ষে। লেডি-মেট্রন অদূরে বসে রইল। শ্রুতিসীমার বাইরে, কিন্তু দৃষ্টি-সীমার নয়।

বাসু বললেন, আয়াম সরি ছন্দা ! তুমি প্রথম থেকেই আমাকে না জানিয়ে একের পর এক ভ্রান্ত পদক্ষেপ করছিলে। তবে তুমি এটা খুব বুদ্ধিমতীর মতো কাজ করেছ—মানে এই স্ট্যান্ডটা নিয়ে যে, তোমার অ্যাটর্নির

অনুপস্থিতিতে তুমি কোনো এজাহার দেবে না।

—সুজাতাদি আমাকে সে-কথা বলেছিল। একটা কথা বলুন তো: পুলিসে আমাকে সন্দেহ করল কী করে?

—তোমার কর্তা থানায় গিয়ে এজাহার দিয়েছিল বলে।

ছন্দা একটু অবাক হল। বললে, তা কেমন করে হবে? সে তো কিছুই জানে না। সে তো তখন ঘুমাচ্ছিল?

—না, ছন্দা। তুমি ওর গরম চকলেটে 'ইপ্রাল' ট্যাবলেট মিশিয়েছিলে এটা সে জানতে পেরেছিল। সে ওটা কমোডে ঢেলে দেয়। আদৌ পান করেনি। ঘুমের ভান করে পড়েছিল। তুমি কখন গাড়ি নিয়ে আলিপুর থেকে রওনা হয়েছ আর কখন ফিরে এসেছ, তা সে জানে।

ছন্দা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। কথাটা হজম করতে পারছিল না সে। তারপর কোনক্রমে বললে, ও জেগে ছিল? ঘুমায়নি? ও জানে যে, রাত্রে আমি গাড়ি নিয়ে···

কথাটা ওকে শেষ করতে দেন না বাসু। বলেন, এখন আমাকে সংক্ষেপে বল দিকি—কেন কাল মধ্য রাত্রে তারাতলায় গিয়েছিলে?

—কমলেন্দু আমাকে বাধ্য করেছিল। সন্ধ্যার অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ক্যানসেল করে টেলিফোনে পরে রাত একটায় ওর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করি। আমার আশা ছিল, ত্রিদিবকে ঘুম পাড়িয়ে আমি একা ওর কাছে যেতে পারব।

—তোমার বয়সী একটি মেয়ের পক্ষে একা ড্রাইভ করে অত রাত্রে ওখানে যাওয়া কি দুঃসাহসিকতা নয়? তোমার ভয় হল না?

—ভয়ের কী আছে? আমার সঙ্গে লোডেড রিভলভার ছিল। আপনি তো নিজেই সেটা আমাকে ফেরত দিয়েছিলেন। কোনো মস্তান বাঁদরামো করতে এলে তার খুলি উড়িয়ে দিতাম!

বাসু ম্লান হেসে বললেন, তোমার ধমনীতেও কি শক্তাবৎ রাজরক্ত বইছে, ছন্দা? কী দরকার ছিল এতটা ঝুঁকি নেবার?

—সে আপনাকে বোঝাতে পারব না। আমি···আমি একটা অপরাধ করেছিলাম। কমলেশ তা জানত! খবরটা সে পুলিসে জানালে আমার নির্ঘাৎ জেল হয়ে যেত! কী জানেন? আমি জানি যে, আমি অন্যায় করেছি, সেজন্য জেল খাটতেও আমি প্রস্তুত, কিন্তু ত্রিদিবের কথা ভেবে আমি প্রায়শ্চিত্তটা করতে পারছিলাম না। ওর বাবা—ত্রিবিক্রমের ধারণা: তাঁর পুত্র নিচু ঘরে বিয়ে করেছে, আমার 'খানদান' নেই—তা আমার নেই বটে, তেমনি আমি কিন্তু 'বর্ন-ক্রিমিনাল'ও নই। আমার জেল হলে ওর বাবা ওকে বলতেন 'দেখলে তো?'···সেটাই আমার সহ্য হচ্ছিল না। তাই আমার হাত-পা বাঁধা পড়েছিল। আমার উপায় ছিল না। কমলেশের হুকুম মতো রাত একটার সময়েই আমাকে তারাতলার মতো এলাকায় যেতে হয়েছিল, প্রচণ্ড বিপদ মাথায় করে।

—তুমি কি ওকে কিছু টাকা দিতে গেছিলে?

—আদো না ! টাকা কোথায় যে, দেব ? আমি শুধু কিছু সময় চাইতে গেছিলাম। হতভাগাটা কিছুতেই রাজি হল না।…আপনি জানেন, আমার ধারণা ছিল, সে বাস দুর্ঘটনায় মারা গেছে। আসলে হয়তো সে এ কয়বছর জেল খাটছিল—ঠিক জানি না—মোট কথা তার কোনো খবরই পাইনি বহু বছর ধরে।

—কাল রাত্রে কী ঘটেছিল ভাই বল। কোনো কথা বাদ দিও না, কোনো কথা গোপন কর না। যদি তুমি স্বহস্তে খুন করে থাক তাহলে অকপটে তা স্বীকার কর !

ছন্দা মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে পাঁচ সেকেন্ড নিথর হয়ে বসে রইল। তারপর ওঁর চোখে-চোখে তাকিয়ে বলল, আই কনফেস্, স্যার ! হ্যাঁ, আমিই ওকে খুন করেছি…নিজের হাতে…

বাসুও মিনিট-খানেক স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। তারপর বলেন, কিন্তু সেদিন তো তুমি আমাকে বলেছিলে ছন্দা, যে, ইঁদুর-কলে-পড়া ইঁদুরদেরও তুমি মারতে পারতে না—দূরে গিয়ে ছেড়ে দিতে। বলনি ?

—বলেছিলাম। সেদিন সত্যি কথাই বলেছিলাম, স্যার। কমলেশকে আমি ইচ্ছা করে খুন করিনি। নিতান্ত ঘটনাচক্রে…

—ঠিক কী ঘটেছিল বল দিকিন ?

—ওর সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটি থেকে ঝগড়া হচ্ছিল। ও বিশ্বাস করছিল না যে, সত্যিই দু-হাজার টাকাও আমার কাছে নেই। হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে ও একটা অশ্লীল গালাগাল দিয়ে আমার হাত চেপে ধরে। আমি ওকে ধাক্কা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিই। কী-একটা জিনিস—কাচের প্লাসই হবে বোধহয়—হাতের ধাক্কা লেগে ঝন্‌ঝন্ করে ভেঙে পড়ল। ও দু-হাত বাড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসে। যেন দু-হাতে আমার গলা টিপে ধরবে। আমি নিচু হয়ে হাতের কাছে যা পেলাম তাই কুড়িয়ে নিলাম। তখন বুঝতে পারিনি, এখন খবরের কাগজ পড়ে বুঝছি যে, সেটা একটা গ্যালভানাইজড কলের জলের শর্টপীস। হাত-দেড়েক লম্বা। আমি সেটা এলোপাতাড়ি ঘুরিয়ে ওকে দূরে হঠাতে চাইলাম। ঠিক তখনই ও মরিয়া হয়ে এগিয়ে আসে। পাইপটা ওর মাথায় লাগে। ও পড়ে যায়।

—তখনি তুমি ছুটে পালিয়ে গেলে ?

—না। ঠিক তখনি কে-যেন সুইচটা অফ্ করে দিল !

—সুইচটা 'অফ্' করে দিল ? কে ? ঘরে তো মাত্র তোমরা দুজন ? আর কমলেশ তো তখন মাটিতে পড়ে ?

—না ! ঘরে তৃতীয় আর এক ব্যক্তিও ছিল। সে যে কে বা কখন এসেছে, তা জানি না। কিন্তু সে-ই হঠাৎ সুইচটা অফ্ করে দেয়।

—ঠিক কখন ? আই মিন, কমলেশ মাথায় আঘাত পাওয়ার আগে, না পরে ?

—আগেও না, পরেও নয়। ঠিক একই সময়ে। কোনো ঘটনা আগুপিছু

ঘটে থাকলে তা স্প্লিট-সেকেন্ডের ব্যাপার !

—তাহলে এমনও হতে পারে যে, তোমার আঘাতে কমলেশ ভূতলশায়ী হয়নি। তোমার ঘূর্ণ্যমান ডাণ্ডাটা অন্য কিছুতে আঘাত করে থাকতে পারে ? ওই তৃতীয় লোকটাই…

—আপনি যদি সেই কথা আমাকে আদালতে বলতে বলেন, তবে আমি অবশ্য তাই বলব ; কিন্তু আমার দৃঢ়-বিশ্বাস আমিই তার মাথায় ডাণ্ডার বাড়ি মেরেছিলাম। ওই তৃতীয় ব্যক্তি নয়।

—কোনো তৃতীয় ব্যক্তি তো ঘরে নাও থাকতে পারে, ছন্দা। হয়তো ঘটনাচক্রে ঠিক তখনই বাল্‌বটা ফিউজ হয়ে যায়।

—না। তা যায়নি। এক নম্বর কথা : 'সুইচ অফ' হবার শব্দ আমি স্বকর্ণে শুনেছি। রাত তখন নিস্তব্ধ। দ্বিতীয়ত ঘর অন্ধকার হয়ে যাবার পর আমি দরজার আড়ালে সরে যাই। কমলেশ তখন নিথর হয়ে পড়ে আছে। সেই সময়ে ঘরে পর পর চার-পাঁচ বার কেউ একটা দেশলাই জ্বালাবার চেষ্টা করে। পারে না। দেশলাইটা বোধহয় ভিজে ছিল। যে জ্বালছিল সে দেশলাইয়ের দিকে তাকিয়েছিল, কিন্তু ক্ষণিক আলোর ঝলকানিতে আমি পালাবার পথটা দেখে নিয়েছিলাম। নিঃশব্দে আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলাম। ঠিক তখনই কলবেলটা একটানা বেজে উঠল।

—কলবেল ? কার কলবেল ?

—কমলেশেরই ডোরবেল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেউ 'কলবেল' বাজাচ্ছিল।

—ওই রাত দেড়টার সময় ?

—হ্যাঁ। লোকটা ভিতরে আসতে চাইছিল। ফলে, আমি অন্ধকারে সিঁড়ির মাঝামাঝি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। আমার মনে হয় যে-লোকটা আমার পিছনে দেশলাই জ্বালার চেষ্টা করছিল সেও থমকে থেমে পড়েছে, ল্যান্ডিঙের উপর। একটু পরে আমার নজর হয়—বাড়ির পিছনের ভারা বেয়ে কে-একজন নেমে যাচ্ছে! তার একটু পরেই রাস্তায় একটা মোটরবাইক স্টার্ট নেবার শব্দ হয়। তৎক্ষণাৎ ডোরবেল বাজানো বন্ধ হয়। আমি তখন বাকি কটা ধাপ নেমে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসি। আশ্চর্য ! তখনও আমার মনে হচ্ছিল আমার পিছনে মেজানাইন-ল্যান্ডিঙে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা আর একবার দেশলাই জ্বালাবার চেষ্টা করে। এবং এবার সে সফল হয়। ঠিক তখনি আমি সদর দরজা পার হই। আমি প্রায় দৌড়ে এসে গাড়িতে উঠি। স্টার্ট দিই…

—জাস্ট এ মিনিট। আলোটা নিবে যাবার কত পরে তুমি গাড়িতে স্টার্ট দাও ? হোয়াটস্ য়োর বেস্ট গেস্ ? পাঁচ-দশ সেকেন্ড, না দু-চার মিনিট ?

—মিনিট দুই-তিন হবে।

—কে ডোরবেল বাজাচ্ছিল, কে দেশলাই জ্বালবার চেষ্টা করছিল বা ভারা বেয়ে নেমে যায়, তা তুমি জান না ? আন্দাজও করতে পার না ?

—আজ্ঞে না।

—ওরা তিনজন ভিন্ন-ভিন্ন লোক ? নাকি একই লোককে…

—তা আমি জানি না। তবে ভারা বেয়ে যে নেমে যায় সে লোকটা দেশলাই জ্বালছিল না। কারণ সে ভারা বেয়ে নেমে যাবার পরেও এ লোকটা ল্যাণ্ডিঙে দাঁড়িয়েছিল।

—তোমার চাবির থোকাটা কখন পড়ে যায় ? খবরের কাগজে যে ছবিটা ছেপেছে…

—আমি জানি না। সম্ভবত ধস্তাধস্তির সময়।

—তাহলে তুমি গাড়ির দরজা খুললে কী করে ?

—আমি এত উত্তেজিত ছিলাম যে,কমলেশের বাড়ির সামনে গাড়িটা পার্ক করে আদৌ লক করিনি। দরজাটা খোলা রেখেই নেমে গেছিলাম।

—তাহলে ফিরে এসে গ্যারেজের তালাটা খুললে কী করে।

—ওটাও আমি বন্ধ করে যাইনি।

—তোমার স্পষ্ট মনে আছে ?

ছন্দা একটু ভেবে নিয়ে বলল, না। মনে নেই। তবে এ ছাড়া অন্য সমাধান নেই বলেই আমি ধরে নিচ্ছি যে, গ্যারেজের তালাটা আমি বন্ধ করে যাইনি।

—একটু বুঝিয়ে বল ?

—দেখুন, আমরা দুজনে একই ডব্‌ল্‌ গ্যারেজ ব্যবহার করি। যে-কেউ গাড়ি বার করলেই স্লাইডিং ডোরটা টেনে তালা বন্ধ করে দিই। এটা অনেকটা অভ্যাসবশত—প্রতিবর্তী প্রেরণায়। আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, স্লাইডিং ডোরটা আমি টেনে বন্ধ করেছিলাম; কিন্তু নবতাল-তালাটা নিশ্চয়ই লাগাইনি। কারণ সে-ক্ষেত্রে ফিরে এসে আমি গাড়ি গ্যারেজ করতে পারতাম না। কারণ তার আগেই তারাতলায় আমার চাবিটা খোয়া গেছে।

—কেন ? তোমার কাছে ট্রিপ্‌লিকেট-চাবিটা কি ছিল না ?

—ট্রিপ্‌লিকেট চাবি ? মানে যেটা আমাদের ড্রেসিং-টেবিলের ড্রয়ারে থাকে ? আপনি তার কথা জানলেন কেমন করে ?

—তোমার কর্তাই বলেছিল।

—না। সেটা যেখানে ছিল সেখানেই ছিল। কাল সারা দিনে-রাতে তাতে আমি হাত দিইনি।

—তুমি নিঃসন্দেহ ? অন্যমনস্কভাবে রাত্রে ড্রয়ার খুলে সেই তৃতীয় চাবির থোকাটা নিয়ে যাওনি ?

—নিশ্চয় না ! এ-কথা কেন ?

—অলরাইট। ফিরে এসে গাড়ি গ্যারেজ করার পর—তখন তো রাত পোনে দুটো। তুমি গ্যারেজে নবতাল তালাটা লাগাবার চেষ্টা করনি কেন ?

—সে প্রশ্নই ওঠেনি। কারণ ফিরে এসে আমি স্লাইডিং পাল্লাটা টেনে বন্ধ করতে পারিনি।

—সেটাই বা কেন ?

—কখনো কখনো অ্যাম্বাসাডার গাড়িটা একটু সরে নড়ে গেলে দরজাটা

বন্ধ হতে চায় না। তখন হয় অ্যাম্বাসাডারটাকে স্টার্ট দিয়ে সামনের দিকে দু-এক ইঞ্চি এগিয়ে নিতে হয়, নাহলে একজন বাম্পারটা ঠেলে ধরে অন্যজন দরজাটা বন্ধ করে। একা হাতে ওটা করা যায় না। তাই ফিরে এসে নবতাল তালা লাগানোর প্রশ্নই ওঠেনি। আর সেজন্যই রাতে আমি টের পাইনি যে, আমার চাবিটা খোয়া গেছে। তাছাড়া মানসিকভাবে আমি এতই উত্তেজিত ছিলাম যে, গাড়ি দুটোর নিরাপত্তার কথা আমার মনেই ছিল না।

—তারপর কী হল ?

—আমি ঘরে ফিরে এসে দেখলাম ও নিথর হয়ে ঘুমাচ্ছে। আমি নিঃশব্দে শাড়ি পালটে নাইট-গাউন পরে নিলাম। রিভলবারটা অন্ধকারে লুকিয়ে ফেললাম। ভীষণ নার্ভাস লাগছিল। কমলেশ বেঁচে আছে কি না আমি জানতাম না ; আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে, সে ওই সামান্য আঘাতে মারা যাবে! তবু আমি খুবই উত্তেজিত ছিলাম। তাই স্ট্রং ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়ি। ঘুম ভাঙল বেলা আটটায়, আপনি টেলিফোন করায়।

—তুমি যা বললে তা আদ্যন্ত সত্য ? কোনো কিছু গোপন করনি ?

—না। কিন্তু ফিরে এসে আমি গ্যারেজের দরজাটা যে বন্ধ না করেই শুতে গেছি, এ-কথা আপনি কী করে জানলেন ?

—তোমার স্বামী বলেছে। সে তো আক্ষরিক-অর্থে সাত-সকালে আমার বাড়িতে এসেছিল।

—কেন ? আচ্ছা এ-কথা কি সত্যি যে, পুলিসে সে নিজে থেকে গেছিল ?

—হ্যাঁ, সত্যি! ও নিজের ধারণা অনুযায়ী স্থির করেছিল যে, সে যা জানে তা পুলিসকে জানানো তার কর্তব্য!

—সেজন্য আপনি ওকে দোষ দিতে পারেন না। সেটাই ওর শিক্ষা! ইন ফ্যাক্ট, সেটাই ওর মানসিক অসুখ! আচ্ছা, ও কি আর কারও কথা আপনাকে বলেছে ?

—বলেছে। ওর ধারণা খুন করেছে অন্য একজন, যাকে তুমি বাঁচাতে চাইছ—

—সে কে ?

—ডক্টর প্রতুল ব্যানার্জি।

ছন্দা একটু চমকে উঠল। আমতা আমতা করে বললে, ও তাঁর সম্বন্ধে কী জানে ?

—তা আমি কেমন করে জানব ? তুমি বরং আমাকে বল, কাল রাত্রে ডক্টর ব্যানার্জি কি তারাতলায় ছিলেন—ওই গভীর রাত্রে!

—গুড হেভেন্স! নিশ্চয় নয়!

—তুমি নিঃসন্দেহ ?

—নিশ্চয়ই।

মেট্রন দূর থেকে বলে ওঠে, এক্সকিউজ মি, স্যার। সময় শেষ হয়ে গেছে। বাসু বলেন, অল রাইট, আর এক মিনিট!

ছন্দার দিকে ফিরে বলেন, কাল রাত্রে তুমি হাতে গ্লাভস্ পরে যাওনি নিশ্চয় ?

—আজ্ঞে না। হাতে পরার গ্লাভস্ আমার কাছে আদৌ নেই। হাসপাতালে ও. টি. তে গেলে পরি। নার্সিং-হোমের গ্লাভস্। একথা কেন ?

বাসু বলেন, সংক্ষেপে এবার বল, তুমি কী এমন অপরাধ করেছিলে যেজন্য তোমার জেল হতে পারত···নাউ লুক হিয়ার···আমি তোমার অ্যাটর্নি! আমাকে বললে তা প্রিভিলেজড কম্যুনিকেশন। তাতে তোমার কোনো ক্ষতি হতে পারে না। কিন্তু আমার জানা দরকার, কমলেশ তোমাকে কী নিয়ে ভয় দেখাচ্ছিল ?

ছন্দা দৃঢ়স্বরে মাথা নেড়ে বললে, সরি, স্যার! বিশেষ কারণে সে-কথা আপনাকে আমি জানাতে পারি না।

—তুমি কি বলতে চাও যে, সে গোপন কথাটা তোমার একার নয় ?

—আপনার সঙ্গে কথা চালানোই বিপদ।···ওই দেখুন মেট্রন এগিয়ে আসছে। আমার যা বলার ছিল, বলেছি।

—অলরাইট! এবার শেষ কথাটা বলি। আমার অনুপস্থিতিতে পুলিসের কাছে কোনও জবানবন্দি দেবে না। মনে থাকবে ?

—থাকবে!

॥ দশ ॥



পুরো দু-দুটি দিন বাসু-সাহেব ঘর ছেড়ে বার হলেন না। ক্রমাগত পাইপ টেনে গেলেন। মূল হেতু: ওঁর মক্কেল জামিন পায়নি। ওঁর মতে জামিন দেওয়া-না-দেওয়ার দায়িত্ব আইন যাঁর স্কন্ধে ন্যস্ত করেছিল তিনি অভিযুক্তের প্রতি অহেতুক নিষ্করুণ হয়েছেন। ছন্দা কিছু মস্তান পার্টির গুন্ডা নয়, পেশাদার সমাজবিরোধী নয়, এমনকি ব্ল্যাকমানির ধনকুবের নয় যে, জামিন পেলে সে পুলিস-কেসকে প্রভাবিত করতে পারে। নিহত ব্যক্তি স্বীকৃত সমাজবিরোধী, তার হিপ্-পকেটে রিভলবার ছিল। ছন্দারও যে তা ছিল, তা কেউ এখনো জানে না। ফলে আপাতদৃষ্টিতে এটা কিছুতেই ধরে নেওয়া যায়-না যে, ওই বয়সের একটি মেয়ে রাত একটার সময় অতখানি ড্রাইভ করে একা কারও বাড়িতে হানা দেবে—খুন করার পূর্ব-পরিকল্পনা নিয়ে। খুনের অস্ত্রটাও তো সে সঙ্গে করে নিয়ে যায়নি। বেশ বোঝা যায় যে, ঘটনার দ্রুত আবর্তনে সে হঠাৎ পাইপটা হাতে তুলে নিয়েছিল—নিঃসন্দেহে আত্মরক্ষার্থে! ফলে পুলিসের যা বক্তব্য—এটা 'হত্যা' বা 'মার্ডার', তা ধোপে টেকে না। বড়ো জোর বলা যায়, আত্মরক্ষার্থে অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনা: 'কাল্‌পেব্‌ল

হোমিসাইড। তাহলে জামিন কেন দিলেন না বিচারক?

তার একাধিক হেতু হতে পারে।

প্রথম কথা: বিচারক বিশ্বাস করেছেন আসামির স্বামীর জবানবন্দি। হয়তো তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল নিজের বিবাহের প্রথম সপ্তাহের কথা! একটি সদ্যোবিবাহিতা বিয়ের কনে—যার অষ্টমঙ্গলা পার হয়নি—সে তার বরকে কড়া ঘুমের ওষুধ খাইয়ে মধ্যরাত্রে অভিসারে—অভিসার নাই হোক—মধ্যরাত্রে 'গৃহত্যাগ' করবে এটাই যে অচিন্তনীয়।

দ্বিতীয় কথা: এটাও বিচারক বিশ্বাস করেছেন—স্বেচ্ছায়, অনিচ্ছায় বা আত্মরক্ষার্থে যাই হোক, মেয়েটির আঘাতে কমলেশ ভূতলশায়ী হয়। এ-ক্ষেত্রে অজ্ঞান অবস্থায় তাকে ফেলে পালিয়ে আসাটাও সমর্থনযোগ্য নয়। ছন্দা ওই ঘরেরই টেলিফোন ব্যবহার করে থানায়, হাসপাতালে বা কোনও অ্যাম্বুলেন্স-য়ুনিটে ফোন করে জানাতে পারত যে, ওই ঠিকানায় একজন অচৈতন্য মানুষ মাটিতে পড়ে আছে। তারপর অ্যাম্বুলেন্স এসে পড়ার আগে যদি সে পালিয়েও যেত তাহলে হয়তো তাকে ক্ষমা করা যেত! অন্তত জামিন দেওয়া।

অথবা হয়তো এসব কোনো হেতুই বিচারককে বিচলিত করেনি। ইদানীং সচরাচর যা হয়ে থাকে—তাই ঘটেছে। অর্থাৎ অত্যন্ত প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তি—রাজনৈতিক ক্ষমতাদর্পে হোক অথবা অর্থকৌলীন্যের কল্যাণেই হোক—নেপথ্য থেকে কলকাঠি নেড়েছেন। সংবাদপত্রে বাসুসাহেব দেখেছেন, ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের কলকাতা শাখা-অফিসে কী একটি সেমিনারে নাসিকের ধনকুবের ব্যবসায়ী ত্রিবিক্রমনারায়ণ রাও এ সপ্তাহে একটি বক্তৃতা দিয়েছেন। সংক্ষেপে, আসামির পূজ্যপাদ শ্বশুর-মহাশয় এখন কলকাতায় বর্তমান।

ইতিমধ্যে 'সুকৌশলী' গোয়েন্দা সংস্থা—অর্থাৎ সুজাতা আর কৌশিক যেসব তথ্য সরবরাহ করে চলেছে তাতে সমস্যার সমাধান তো 'দূর অস্ত' সেটা ক্রমশই জটিলতর হয়ে উঠছে।

এক নম্বর তথ্য: মৃত কমলেশের ঘরে পুলিস কোনো লেটেন্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট আবিষ্কার করতে পারেনি। সদ্য-লাগানো চকচকে ডোর-হ্যান্ডেলে নয়, টেলিফোনে নয়, প্লাসটপ টেবিলে নয়। কেন?

কোথাও কোনো আঙুলের ছাপ কেন নেই? যদি ধরে নেওয়া যায় যে, আততায়ী হাতে গ্লাভস্ পরে এসেছিল তাহলে তার আঙুলের ছাপ পাওয়া যাবে না। সেটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু গৃহস্বামীর আঙুলের ছাপ পাওয়া গেল না কেন? বাসু-সাহেব নিজেও তো ঘটনার দিন ওই বাড়ির হ্যান্ডেলে হাত দিয়েছিলেন, তাঁর আঙুলের ছাপই বা মুছে গেল কী করে? সম্ভাব্য উত্তর একটাই: অপরাধটা যে করেছে সে গৃহত্যাগের আগে প্রতিটি আঙুলের ছাপ রুমাল দিয়ে মুছে দিয়ে গেছে। অর্থাৎ আতঙ্কতাড়িতা পলায়নপরা কোনো যুবতী নয়, প্রফেশনাল খুনির স্থিরমস্তিষ্কের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

পুলিস এ তথ্যটা মেনে নিয়েছে, কিন্তু কিছু সংশোধিত আকারে : ফিঙ্গারপ্রিণ্ট মোছা হয়েছে রুমাল দিয়ে নয়, আঁচল দিয়ে।

দ্বিতীয় কথা : বটুক এবং তার স্ত্রী দু-জনেই শুনেছে ওই ঘরে যখন ঝগড়া মারামারি হচ্ছিল—ঝন্‌ঝন্‌ করে কাচের বাসনপত্র ভাঙছিল—তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেউ একজন কলবেল বাজাচ্ছিল। বাসু-সাহেবের সিদ্ধান্ত : সেই লোকটা ওই ঘরে আদৌ আসেনি। ফলে সে খুনি হতেই পারে না। কারণ কমলেশ যখন ভূতলশালী হয় তারপরও সে ডোরবেল বাজিয়ে চলেছিল। পুলিস বোধকরি তা মানে না। পুলিস মানতে রাজি নয় যে, ছন্দা একা এসেছিল। অত গভীর রাত্রে ওই বয়সের একটি মেয়ে কলকাতার রাস্তায় একা ড্রাইভ করে না—বিশেষ তারাতলার নির্জন ফ্যাক্টরি-অঞ্চলে। সেই তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিটাই দুর্ঘটনাকে—পুলিসের মতে—'ডেলিবারেট মার্ডার'-এর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

আরও একটা ব্যাপার ঘটেছে। ঘটনার পরদিন থেকে ত্রিদিব নিরুদ্দেশ! বস্তুত থানায় এজাহার দেওয়ার পর সে আর তার আলিপুরের বাড়িতে ফিরে যায়নি। কোথায় গেছে? কেউ জানে না। পুলিস বাদে। না হলে টি. ভি.-তে নিরুদ্দেশ-তালিকায় ধনকুবেরের একমাত্র পুত্রের ছবি দেখা যেত। বেশ বোঝা যায়, পুলিসের ব্যবস্থাপনায় সে লোকচক্ষুর অন্তরালে কোনও পাঁচতারা হোটেলে তোফা আরামে আছে। ব্যবস্থাপনা পুলিসের, কিন্তু খরচ সম্ভবত তার পিতৃদেবের।

কিন্তু কেন? ত্রিদিবকে লুকিয়ে ফেলার কী কারণ—জানতে চাইলেন রানু।

ওঁরা তিনজনে বসেছিলেন লিভিং-রুমে। কৌশিক আজ তিনদিন বেপাত্তা—কোথায়-কোথায় ঘুরছে কমলেশের পূর্বজীবনের ইতিহাস সংগ্রহ-মানসে। বাসু জবাবে বললেন, বুঝলে না? যাতে কারও প্রভাবে পড়ে ত্রিদিবনারায়ণ তার জবানবন্দিটা প্রত্যাহার করে না নেয়। যাতে কেউ তাকে কোনো প্রশ্ন না করতে পারে। বিশেষ করে খবরের কাগজের লোক।

সুজাতা জানতে চায়, আচ্ছা মামু, একটা জিনিস আমাকে বুঝিয়ে বলুন তো। আমি শুনেছি, ভারতীয় আইনে স্বামী তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অথবা স্ত্রী তার স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিতে পারে না—মানে ক্রিমিনাল কেস-এ! এটা সত্যি?

—হ্যাঁ সত্যি। তবে 'স্পাউস' অনুমতি দিলে, পারে।

—তাহলে এক্ষেত্রে ছন্দা যদি অনুমতি না দেয় তাহলে ত্রিদিব তো সাক্ষ্য দিতে পারবে না? ছন্দা যে তার স্বামীর চকলেটে ঘুমের ওষুধ মিশিয়েছিল, সে যে রাত সাড়ে বারোটায় গাড়ি নিয়ে আলিপুর থেকে রওনা হয়েছিল এসব তো ত্রিদিবের স্টেটমেন্টের উপর প্রতিষ্ঠিত?

বাসু বললেন, জবাবে তিনটে কথা বলব। প্রথম কথা : ছন্দা যে-মুহূর্তে বলবে যে, স্ত্রী হিসাবে সে দাবি করছে ত্রিদিব যা দেখেছে, যা জানে

তা আদালতে বলতে পারবে না, সেই মুহূর্তেই বিচারক ধরে নেবেন যে, তাহলে মেয়েটি ধোওয়া তুলসীপত্র নয়। অর্থাৎ তার স্বামী প্রথম এজাহারে যা বলেছিল—যা আদালতে পেশ করা গেল না—যার ক্রস-এগ্‌জামিন হল না—তার ভিতর অনেকটাই সত্য আছে। দ্বিতীয় কথা: পুলিস অসংখ্য সাক্ষী খাড়া করবে—যারা ত্রিদিবের না-বলা কথাটা প্রতিষ্ঠিত করবে। কেউ বলবে যে, রাত বারোটা পঁয়ত্রিশে সে ছন্দাকে ড্রাইভ করে তার আলিপুরের বাড়ি থেকে বার হতে দেখেছে। ত্রিদিবের কোনো বন্ধু হয়তো বলবে, ত্রিদিবনারায়ণ তাকে বলেছিল যে, ত্রিদিবের স্ত্রী তার স্বামীকে ওভারডোজের ঘুমের ওষুধ খাইয়ে 'হত্যা' করতে চেয়েছিল, তাই সে বাড়ি ছেড়ে হোটেলে আশ্রয় নিয়েছে।

সুজাতা বাধা দিয়ে বললে, কিন্তু আসামির অনুপস্থিতিতে ত্রিদিব আর তার বন্ধুর কথোপকথন 'হেয়ার-সে' হয়ে যাবে না?

—যাবে। আমি 'অব্‌জেকশান' দেব। বিচারক হয়তো তা 'সাস্‌টেইন'ও করবেন; কিন্তু সেই বিধিবহির্ভূত এভিডেন্স বিচারককে বিচলিত করবে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা: পুলিস এমন ব্যবস্থা করবে যাতে ছন্দার ওই সাংবিধানিক অধিকারটা কার্যকর করা না যায়। অর্থাৎ ছন্দাকে এমন প্যাঁচে ফেলা হবে যাতে সে ত্রিদিবের সাক্ষ্যদানে আদৌ আপত্তি করতে পারবে না।

—সেটা কীভাবে হতে পারে?—জানতে চান রানু।

—মামলাটা আদালতে ওঠার আগেই ওরা একটা পৃথক 'অ্যাক্‌শান' নেবে! আদালতে আবেদন করবে, যাতে ছন্দা এবং ত্রিদিবনারায়ণের রেজিস্ট্রি-বিবাহটা 'বাতিল' বলে ঘোষিত হয়।

—ডিভোর্স পিটিশান?

—না গো। ডিভোর্স আদৌ নয়। আদালত ওদের বিবাহ-বিচ্ছেদ অনুমোদন করলেও ত্রিদিবনারায়ণ তার ভূতপূর্বা-স্ত্রীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারবে না—কারণ ঘটনা যেদিন ঘটেছিল সেই 22. 6. 91 তারিখে ওরা ছিল বৈধ স্বামী-স্ত্রী! আমি বলছি, ওপক্ষ চেষ্টা করবে ওদের বিবাহটা সমূলে অবৈধ প্রমাণ করতে। অর্থাৎ প্রমাণ করা: ওরা দুজন—ওই ত্রিদিব আর ছন্দা কোনোদিনই স্বামী-স্ত্রী ছিল না। এক বিছানায় শুয়েছে এই পর্যন্ত! সে-ক্ষেত্রে ত্রিদিব সাক্ষ্য দিতে পারবে!

সুজাতা প্রতিবাদ করে, কিন্তু তা ওরা কীভাবে করবে? ত্রিদিব আর ছন্দা রীতিমতো রেজিস্ট্রি বিবাহ করেছে। সে বিয়ে নাকচ করা অতই সহজ?

—হ্যাঁ সহজ।

—এ-কথা কেন বলছেন?

—দ্য স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট নম্বর ফর্টিথ্রি অব নাইনটিন-ফিফ্‌টি ফোর-এর আন্ডার সেকশন ফোর-এ বলা হয়েছে: রেজিস্ট্রি-বিবাহ তখনই

সিদ্ধ যখন 'নাইদার পার্টি হ্যাজ এ স্পাউজ লিভিং'। অর্থাৎ রেজিস্ট্রি বিবাহকালে যদি মেয়েটির কোনো পূর্বতন স্বামী অথবা ছেলেটির পূর্বতনা স্ত্রী জীবিত থাকে, তাহলে সেই রেজিস্ট্রি-বিবাহ ভ্রমক্রমে লিপিবন্ধ হলেও তা শুরু থেকেই অবৈধ। ওরা সহজেই প্রমাণ করবে যে, 15. 6. 91 যখন ছন্দা বিশ্বাস ত্রিদিব-নারায়ণকে রেজিস্ট্রিমতে বিবাহ করে তখন ছন্দার পূর্বতন স্বামী কমলেশ বিশ্বাস জীবিত ছিল। ফলে শুরু থেকে ছন্দা-ত্রিদিবের বিবাহ 'নাল অ্যান্ড ভয়েড'! এককথায় 'অসিদ্ধ'।

এই সময়েই ডোরবেল বেজে ওঠে। বিশু গিয়ে সদর দরজা খুলে দিল। এল কৌশিক। হাতে স্যুটকেস। চেহারা ভগ্নদূতের।

বাসু বলেন, কী ব্যাপার ? কাউকে কিছু না বলে কোথায় চলে গেছিলে ?

কৌশিক একটা চেয়ার টেনে বসে। বলে, তা কেন ? সুজাতাকে তো বলে গেছি, দুর্গাপুর যাচ্ছি। আমি তো শকুন্তাবৎ রাজপুত নই যে, ধর্মপত্নীকে না জানিয়ে পালিয়ে যাব ?

—তা সেখানে কেন ? কিছু খবর পেলে ?

—পেয়েছি, মামু। মারাত্মক খবর। অবিশ্বাস্য!

—ফায়ার!

—ছন্দা দেবীর প্রথম পক্ষের স্বামী কমলেশ বিশ্বাস, ওরফে কমলাক্ষ, ওরফে কমলেন্দু গত শনিবার রাত্রে তারাতলায় আদৌ খুন হয়নি!

রানু আঁতকে ওঠেন : মানে ?

বাসু বলেন, মানে, কৌশিক বোধহয় বলতে চাইছে 'কমলেশ মরিয়াও প্রমাণ করিতে পারিল না যে, সে জীবিত ছিল।' তাই কি ?

—আজ্ঞে না। শনিবার যে মারা গেছে সে কমলেশের যমজ ভাই হতে পারে, কমলেশের ছদ্মবেশী হতে পারে, ছন্দা-কমলেশের যৌথ ধাপ্পাবাজি হতে পারে…

সুজাতা বলে, যৌথ ধাপ্পাবাজি মানে ?

—ওই খুন হয়ে যাওয়া লোকটা যে কমলেশ বিশ্বাস তা আমরা কী করে মেনে নিয়েছি ? একমাত্র ছন্দার স্টেটমেন্ট অনুযায়ী নয় কি ?

বাসু প্রতিবাদে বলেন, না! কাগজে লিখেছে পুলিস তাকে সনাক্ত করেছে বিবাহ-বিশারদ সমাজবিরোধী 'কমল' নামে। কমলেশ, কমলাক্ষ, কমলেন্দু নানান নামে সে কুমারী মেয়েদের ফাঁসিয়ে বিয়ে করত। একথা কাগজে যখন ছাপা হয় তখনো ছন্দা গ্রেপ্তার হয়নি। ফলে তোমার সংগৃহীত তথ্যটা দাঁড়াচ্ছে না। নাকচ হয়ে যাচ্ছে!

কৌশিক রুখে ওঠে, অল রাইট, মামু! এবার আমি যে তথ্য সংগ্রহ করে এনেছি সেটাকে নাকচ করুন।

বলো :

* * *

সুকৌশলীর উপর নির্দেশ ছিল 'কমল' নামধারী বিবাহ-বিশারদের

আদ্যোপান্ত ইতিহাসটা সংগ্রহ করা। কৌশিক ধাপে ধাপে তাই করছিল। ছন্দা তার এজাহারে বলেছিল, কমলেশের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে ওরা প্রথমে কালীঘাটে গিয়ে বিয়ে করে, কিন্তু বেলেঘাটায় ঘর নেওয়ার পর দ্বিতীয়বার রেজিস্ট্রি মতে বিয়ে করে। তারিখটা ছন্দাই জানিয়েছিল: সাতই ডিসেম্বর, 1983। কৌশিক তাই বেলেঘাটা অঞ্চলে একের পর একটি করে বিবাহ-রেজিস্ট্রেশন অফিসে খোঁজ নিতে থাকে। পঞ্চম কি ষষ্ঠ প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়। রেজিস্ট্রারের অনুমতি নিয়ে, যথাযথ ফি জমা দিয়ে একটা জেরক্স কপি সংগ্রহ করে। তাতে কমলের পিতার নাম এবং জন্মতারিখ পাওয়া যায়—সত্য হোক, মিথ্যা হোক—তা কমলেশের স্বীকৃতি-মোতাবেক। ওই বিবাহ-চুক্তিপত্রে দু-জন সাক্ষীর নাম-ঠিকানা ছিল। একজন বাঙালি, বিমল কর, একজন অবাঙালি। বাঙালি সাক্ষীর ঠিকানায় গিয়ে শোনা যায় সে এখন ওখানে থাকে না। কোথায় থাকে তা কেউ জানে না। অবাঙালি সাক্ষীর ঠিকানা ছিল দুর্গাপুরের 'জি-টাইপ' কোয়ার্টার্সের। কৌশিক খুঁজে খুঁজে লোকটির দেখা পায়। তার বাড়িতেই।

মহেশপ্রসাদ তিওয়ারি দুর্গাপুরের একজন নামকরা লেবার লিডার। সে কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করতে পারল না কোনো ছন্দা বা কমলেশ বিশ্বাসকে। কৌশিক তখন বিবাহের চুক্তিপত্রের জেরক্স কপিটা দেখায়। মহেশপ্রসাদ স্বীকার করে, জি হুঁ। সিগনেচর তো হমারই আছে! লেকিন হমার তো কুছু য়্যাদ হচ্ছে না।

কৌশিক জানতে চায়, বিমল করকেও কি আপনি চিনতে···

—নেহী নেহী। বিমলবাবু সিটু য়ুনিয়নে ছিলেন। তাঁকে পহ্‌ছাস্তে পারছি। লেকিন তিনি তো গুজর গিয়েসেন!

কৌশিক পুনরায় জানতে চায়, আপনাদের দু জনের মধ্যে একজন, আই মিন, ওই বিয়ের দু-জন সাক্ষীর মধ্যে একজন কোনো ইন্‌শিওরেন্স কোম্পানির এজেন্ট ছিলেন। কে? আপনি না বিমলবাবু?

—হামি। কেঁও?

—ছন্দা দেবী আমাকে বলেছেন যে, সেই এজেন্টের অনুরোধে ওঁরা স্বামী-স্ত্রী একটি যৌথ ইন্‌শিওরেন্স করেন, দশ হাজার টাকার!

—হাঁ—! আভি য়্যাদ হল। ঠাহ্‌রিয়ে বাবু-সাব। আরাম কিজিয়ে। ম্যয়-নে ঢুঁড়কে দেখুঁ!

তেওয়ারিজী ইন্‌শিওরেন্স কোম্পানির এজেন্ট হিসাবে যাঁদের জীবনবীমা করিয়েছেন তাদের নাম-ধাম-ইন্‌শিওরেন্স নাম্বার ইত্যাদি একটি মোটা খেরো খাতায় পর পর লিখে রেখেছেন। বার্ষিক যা কমিশন পান তার হিসাব মিলানোর জন্যই শুধু নয়, ইনকামট্যাক্স অফিসারকে সন্তুষ্ট করার জন্য। সেই খেরো-খাতা দেখে তেওয়ারিজী জানালেন, হ্যাঁ ছন্দা আর ওঁর সদ্য পরিচিত অর্থাৎ বিমলের বন্ধু কমলেশ বিশ্বাস একটি যৌথ পলিসি করেছিল বটে, জেনারেল ইন্‌শিওরেন্স কোম্প্যানিতে। দশ হাজার টাকার। একুশে

ডিসেম্বর, তিরাশি সালে। কিন্তু সে পলিসি এখন আর চালু নেই। তা থেকে তেওয়ারিজীর কোনো অর্থাগম বর্তমানে হয় না। তার কারণ 27.3.88 তারিখে কমলেশ বিশ্বাস মারা গেছেন এবং তাঁর স্ত্রী নমিনি হিসাবে দশ হাজার টাকা লাভ করেছেন।

কৌশিক যথারীতি আকাশ থেকে পড়ে। তবে সে কোনো বিস্ময় প্রকাশ করে না। ইন্‌শিওরেন্স কোম্পানির কলকাতা-অফিসের ঠিকানা আর পলিসি নাম্বারটা টুকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসে।

হাওড়া স্টেশান থেকে সে সরাসরি ওই ইন্‌শিওরেন্স কোম্পানির অফিসে যায়। এ-ঘর-ওঘর এ-সাহেব ও-সাহেব করতে করতে একসময়ে তথ্যটার হদিশ পায়। হ্যাঁ, বিমা কোম্পানি যথারীতি অনুসন্ধান চালিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে নমিনিকে টাকাটা মিটিয়ে দিয়েছে। কমলেশ বিশ্বাসের মৃত্যুর অবিসংবাদিত প্রমাণগুলিও ওই পলিসি-পেমেণ্ট ফাইলে গাঁথা আছে। 'সুকৌশলী'-র লিখিত আবেদন-মোতাবেক ইন্‌শিওর কোম্পানির এক বড়ো-সাহেব সেই প্রমাণের জেরক্স কপি ইস্যু করার অনুমতি দিলেন। কৌশিক এবার তার বাসু-মামুর সামনে একে-একে দাখিল করল তার কাগজপত্র : কমলেশ বিশ্বাসের ডেথ-সার্টিফিকেট, নার্সিং-হোমের ডিস্‌চার্জ বিল-ভাউচার, ক্রিমেটোরিয়ামের বিল! সবই 27. 3. 1988 তারিখের। বললে, এবার বলুন মামু, কমলেশ বিশ্বাসের কয়বার মৃত্যু বিশ্বাসযোগ্য ?

বাসু জবাব দিলেন না। সহধর্মিণীকে বললেন, সানি-সাইড নার্সিংহোমে একবার টেলিফোনে দেখ তো, ডাক্তার প্রতুল ব্যানার্জিকে পাওয়া যায় কি না।

টেলিফোন ধরল রিসেপশনিস্ট। মহিলা-কণ্ঠে শোনা গেল, ইয়েস! ডক্টর ব্যানার্জি আছেন ও. টি. তে। জানতে চাইল কে ফোন করছেন এবং কেন ফোন করছেন।

'বাসু বললেন,'একটা মেসেজ কাইণ্ডলি লিখে নেবেন ?

—বলুন ?

—আজ রাত নয়টার সময় আমি ডঃ ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করতে যাব। আমার নাম পি. কে. বাসু, অ্যাটর্নি।

মেয়েটি সবিনয়ে বললে, সরি, স্যার। রাত নয়টার সময় উনি নার্সিং-হোমে থাকেন না। বাড়িতে থাকেন।

—অল রাইট! বাড়িতেই যাব। সেটা তো ওই নার্সিং হোমের উপর-তলায়, তাই নয় ?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। বাট সরি স্যার, সন্ধ্যায় ওঁর আর কোনো অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে কি না তা তো আমি জানি না…

—কে জানে ?

—ডক্টর ব্যানার্জি হিমসেল্‌ফ্। কিন্তু তিনি এখন অপারেশন থিয়েটারে…

—আই নো! তাহলে মেসেজটাতে আরও লিখে রাখুন—অন্য কোনো

সান্ধ্য অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট থাকলে ডক্টর ব্যানার্জি যেন তা ক্যানসেল করে আমার জন্য অপেক্ষা করেন—অ্যাট নাইন পি. এম. শার্প।

মেয়েটির বোধকরি ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, বলল, আয়াম সরি এগেন, স্যার। ডক্টর ব্যানার্জি—আমি যতদূর জানি—কারও হুকুমে চলেন না।

বাসু বললেন, আপনি তো রিসেপ্শনিস্ট, দূত মাত্র : আপনি এত ঘনঘন 'সরি' হচ্ছেন কেন? যে মেসেজটা দিলাম সেটা ডক্টর ব্যানার্জির হাতে ধরিয়ে দেবেন। উনি অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে আসার পর এবং এক-কাপ স্টিমুলেণ্ট পান করার পর। ফলো?

মেয়েটি জবাব দেবার আগেই টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন।

।। এগারো ।।



ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম রাত আটটা আটান্ন মিনিটে বাসু-সাহেব নার্সিং হোমের উপরতলায় ডক্টর ব্যানার্জির ডোর-বেলটা টিপে ধরলেন। পাঁচ-সেকেণ্ডের ভিতর সেটা খুলে গেল। উজ্জ্বল গৃহাভ্যন্তরে একটি নার্স—বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বয়স হবে তাঁর—দরজা খুলে দ্বারপথে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলেন : ইয়েস?

—ডক্টর পি. ব্যানার্জি আছেন?

—আছেন। কে এসেছেন জানাব?

বাসু-সাহেব নিঃশব্দে মেয়েটির হাতে একটি ভিজিটিং কার্ড বাড়িয়ে ধরেন। দেখে নিয়ে মেয়েটি বললে, আই সি! আপনিই আজ সকালে টেলিফোন করেছিলেন, তাই নয়?

—হ্যাঁ, আপনার সঙ্গেই কথা হয়েছিল বুঝি?

—তাই হয়েছিল। আমিই সেই দূতী! তা আমি আপনার মেসেজটা ওঁকে পৌঁছে দিয়েছি : বাট, আয়াম সরি এগেন, উনি অন্য কাজে ব্যস্ত আছেন, আজ দেখা হবে না।

—বাড়িতে আর কে আছেন? মিসেস ব্যানার্জি?

—না, উনি ব্যাচিলার।

—তাহলে আমার ওই কার্ডখানা ওঁকে দেখান। আর ওঁকে বলুন যে, আমি এসেছি ওঁর পয়েণ্ট-থিটু-বোর কোল্ট অটোমেটিকটার বিষয়ে আলাচনা করতে, যার নম্বর থ্রি-সেভেন-ফাইভ-নাইন-সিক্স-টু-ওয়ান…ফলো?

মেয়েটি রীতিমতো ঘাবড়ে যায়। বিশেষ করে সাত-সাতটা সংখ্যায়।

বাসু-সাহেব বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে। অতগুলো সংখ্যা তোমার পর পর মনে থাকবে না মা, তুমি শুধু বল ডাক্তারবাবুর রিভলবারটার বিষয়ে। আর বল, আমি এখানে ত্রিশ সেকেণ্ড অপেক্ষা করব, তারপর দরজা খুলে ওঘরে যাব। ফলো?

নার্সটি এবার নিঃশব্দে পিছন ফিরল। ভিতরের দিকের দরজাটা খুলে

অন্দরমহলে ঢুকে গেল। দরজাটা সযত্নে বন্ধ করে দিয়ে। বাসু দাঁড়িয়েই রইলেন মণিবন্ধের ঘড়িটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। ত্রিশ সেকেণ্ড অতিক্রান্ত হতেই তিনি ভিতরের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। সৌজন্যমূলক মৃদু করাঘাত করে দরজাটা খুলে ভিতরে প্রবেশ করলেন। সেটি ডাক্তারবাবুর বেড-কাম-সিটিং রুম। সিঙ্গল-বেড বিছানাটা ঘরের ও-প্রান্তে। এখানে টেবিলে টেলিফোন, কাগজপত্র। ডাক্তারবাবু বসেছিলেন তাঁর চেয়ারে। নার্সটি পাশে দাঁড়িয়ে।

দু-জনেই মুখ তুলে এমন আতংকতাড়িত দৃষ্টিতে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যেন ম্যাকবেথের ডিনার-পার্টিতে অনিমন্ত্রিত ব্যাঙ্কোর ভূত বেমক্কা ঢুকে পড়েছে! যেন এখনি ডক্টর ব্যানার্জি আর্তনাদ করে উঠবেন: 'দাউ কান্সট সে দ্যাট আই ডিড ইট!'

বাসু তাঁর পিছনে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গম্ভীরভাবে বলেন, সময়ের দাম আপনার-আমার দু-জনেরই আছে। তাই সৌজন্যমূলক খেজুরে আলাপ বাদ দিয়ে সরাসরি প্রসঙ্গটার অবতারণা করতে চাই। তাছাড়া ভেবে দেখুন, ডক্টর ব্যানার্জি—আপনাকে ত্রিশ-সেকেণ্ডের চেয়ে বেশি সময় দিলেই আপনি একগাদা আজগুবি অবাস্তব কৈফিয়ত ভেবে-ভেবে বার করতেন। তাতে আমার দুজনেরই সময় নষ্ট হত—কারণ আমাকে প্রমাণ করতে হত কৈফিয়তগুলি অবাস্তব এবং আজগুবি, ধোপে টেকে না। শ্যাল আই স্টার্ট?

ডক্টর ব্যানার্জি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বলিষ্ঠ গঠন যুবাপুরুষ। যুবা ঠিক নয়, স্বাস্থ্যবান হলেও বোঝা যায়, মেঘে-মেঘে কিছুটা বেলা হয়েছে। কানের পাশে বড়ো বড়ো জুল্‌পিতে সাদা-আখরে সেই বার্তার ঘোষণা।

বজ্রনির্ঘোষে ডক্টর ব্যানার্জি বললেন, হু ডু য়ু থিংক য়ু আর? আপনি কে মশাই? কী চান? এভাবে আমার বাড়িতে চড়াও হয়েছেন কেন? এই মুহূর্তে যদি আপনি আমার ঘর ছেড়ে চলে না যান, তাহলে আমি পুলিস ডাকতে বাধ্য হব। আমিও আপনাকে ত্রিশ সেকেণ্ড সময় দিচ্ছি, অনধিকার-প্রবেশের মামলা থেকে বাঁচতে।

একটা হাত উনি বাড়িয়ে দিলেন টেলিফোনটার দিকে।

বাসু দু-পা ফাঁক করে রোডস্‌-দ্বীপের কলোশাস-মূর্তির মতো নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েকটা মুহূর্ত—তারপর বললেন, আপনি তিনটি প্রশ্ন করেছেন। ত্রিশ সেকেণ্ড সময়ও দয়া করে দিয়েছেন। তা আমার জবাবটা কি ওই ভদ্রমহিলার উপস্থিতিতেই দেব?

—ও আমার কন্‌ফিডেনশিয়াল নার্স! বলুন?

—টেলিফোনে পুলিস-স্টেশনকে ধরতে পারলে থানাকে ওই সঙ্গে জানিয়ে দেবেন যে, ছন্দা বিশ্বাসের হাতব্যাগে ঘটনার রাত্রে একটা পয়েণ্ট থ্রি-টু রিভলবার ছিল, যে-কথা পুলিস এখনো জানে না আর সে রিভলবারের কেরিয়ার লাইসেন্স ছন্দার ছিল না। এবং যার লাইসেন্স···

ডক্টর ব্যানার্জি স্থিরদৃষ্টিতে ওঁর দিকে পাঁচ সেকেণ্ড তাকিয়ে রইলেন।

তারপর পাশ ফিরে নার্সটিকে বললেন, তুমি বাইরের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা কর জবা। সি দ্যাট উই আর নট ডিস্টার্বড।

নার্সটি ভীত-চকিত দৃষ্টিপাত করে ধীরে ধীরে বাইরের ঘরে চলে গেল। তার সেই বিচিত্রদৃষ্টির মনস্তাত্ত্বিক-বিশ্লেষণ করলে শতকরা কত ভাগ ঘৃণা, কত ভাগ অপমানবোধ আর কতটাই বা আক্রোশের নির্যাস বার হবে সেটা অনুমান করা কঠিন।

ডক্টর ব্যানার্জির প্রশ্ন : এবার বলুন আপনি কে?

—ছন্দা বিশ্বাসের অ্যাটর্নি।

স্পষ্টতই একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল গৃহস্বামীর। বললেন, ছন্দা আপনাকে পাঠিয়েছে?

—না।

—ছন্দা এখন কোথায়?

—আপনি জানেন না? হাজতে। খুনের অপরাধে।

—না, জানতাম না। আমার ধারণা হয়েছিল সে জামিন পেয়েছে। যাই হোক, আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন? ওই রিভলবারটা ছন্দা তো ব্যবহার করেনি।

—রিভলবারটা গৌণ। আমি জানতে এসেছি অন্য একটা তথ্য। একটা ডেথ-সার্টিফিকেটের বৈধতার বিষয়ে···

ডাক্তার ব্যানার্জির মুখটা শাদা হয়ে গেল। ধীরে ধীরে চেয়ারে বসে পড়লেন তিনি। বললেন, বলুন। কার ডেথ-সার্টিফিকেট?

—সাম মিস্টার কমলেশ বিশ্বাস। লোকটা আপনার নার্সিং হোমে মারা যায়। ম্যালিগন্যান্ট টাইপ লাং-ক্যান্সারে। সাতাশে মার্চ, উনিশ-শ অষ্ট-আশি সালে···

ব্যানার্জি তাঁর বিশুষ্ক অধরের উপর জিবটা বুলিয়ে নিয়ে কোনোক্রমে বললেন, অষ্টাশি সাল। সে তো তিন বছর আগেকার কথা। কী নাম বললেন? বিশ্বাস? কমলেশ বিশ্বাস? আপনি কাল আসুন···আমি রেজিস্ট্রি খাতা খুঁজে···

বাসু ঝুঁকে আসেন একটু : নাউ, লুক হিয়ার, ডক্টর ব্যানার্জি। সওয়াল জবাব করাই আমার পেশা। সাক্ষীকে পাঁকাল মাছ হতে দেওয়া আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ। ছন্দা বিশ্বাসের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের কথা আমি জানি—না হলে ওকে নিজের রিভলবারটা ওভাবে ধার দিতেন না। রেজিস্ট্রি খাতা দেখার দরকার নেই—আমি মুখে মুখে বলে যাচ্ছি, শুনুন। বাইশে মার্চ আপনার নার্সিং-হোমে একটি মরণাপন্ন ক্যান্সার রোগী ভর্তি হয়। পাঁচদিন পরে সে মারা যায়। আপনি তার ডেথ-সার্টিফিকেট দেন। মনে পড়ছে?

ব্যানার্জি বলেন, দেখুন···কী বলব?···খাতাপত্র কিছু না দেখে···

বাসু পকেট থেকে একখণ্ড কাগজ বার করে ওঁর টেবিলে মেলে ধরেন। বলেন, দেখুন। এটা আপনার স্বাক্ষর? এই ডেথ-সার্টিফিকেটে? এবার

আমাকে বুঝিয়ে বলুন কীভাবে আপনার হসপিটাল-রেজিস্টারে এই রোগীর যাবতীয় তথ্য ছন্দার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর সঙ্গে হুবহু মিলে গেল ? নাম, বয়স, বাবার নাম, পার্মানেণ্ট অ্যাড্রেস এটসেট্রা, এট্‌সেট্রা…

পুনরায় ডক্টর ব্যানার্জি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। মিনিটখানেক কী ভেবে নিয়ে বললেন, আপনাকে একটা কথা বলব, বিশ্বাস করবেন ?

—কী কথা ?

—ছন্দাকে আমি ভালোবাসি…

—এ আর কী নতুন কথা ? আমিও তাকে ভীষণ ভালোবাসি। বিশ্বাস না হয় তার সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন। সে আমাকে মাত্র একশ টাকার রিটেইনার দিয়েছে, আর আমি ইতিমধ্যে তার পিছনে কয়েক হাজার টাকা খরচ করে বসে আছি।

—আমি সে অর্থে ভালোবাসার কথা বলিনি। আমি কেন একাজ করেছি তা আপনি বুঝবেন না। কারণ বুঝলে, এভাবে আমাকে ব্যঙ্গ করতেন না। আমি সত্যিই তাকে আমার প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি।

—কিন্তু ফলস ডেথ-সার্টিফিকেটটা সই করলেন কেন ?

—না হলে ছন্দা কিছুতেই প্রমাণ করতে পারত না যে, বাস-অ্যাক্সিডেণ্টে তার স্বামী মারা গেছে। ইন্সিওরেন্সের ন্যায্য টাকাটা সে কোনদিন আদায় করতে পারত না। ও নিজেকে মনে করত বিধবা ; কিন্তু আইনের চোখে সেটা প্রমাণ করা যাচ্ছিল না। এই সময় আমার মাথায় একটা আইডিয়া আসে। এক ভদ্রলোক তাঁর মেসের এক রুমমেটকে আমার নার্সিং-হোমে ভর্তি করাতে চাইলেন। লোকটার তিনকুলে কেউ নেই। কলকাতার একটা মেসে থেকে কী একটা কোম্পানিতে ভেণ্ডারের কাজ করত। নার্সিং-হোমে ভর্তি হবার মতো সঙ্গতি তার নেই। কোনো হাসপাতালেও ফ্রি-বেড পাচ্ছিল না। কারণ সব হাসপাতালই বলেছে 'কেস'টা অ্যাকিউট ক্যান্সারের। চিকিৎসার বাইরে। অথচ মেস-ম্যানেজার ওই মরণাপন্ন রোগীকে মেসেও রাখতে রাজি নয়। আমি ওর রুমমেটকে বললাম, আমি রুগিকে একটা ফ্রি-বেড দিতে পারি যদি সে আমার নির্দেশ মতো নাম ধাম লেখায়। রোগীর তখন বাকশক্তি লুপ্ত হয়েছে। তার রুমমেট নিকট আত্মীয়ের মিথ্যা পরিচয়ে রোগীর নাম-ধাম, বয়স ইত্যাদি খাতায় লিখিয়ে দিয়ে যায়। বিশ্বাস করুন মিস্টার বাসু, চিকিৎসার কোনো ত্রুটি আমরা কেউ করিনি। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই রোগীটি মারা গেল। আমি ডেথ-সার্টিফিকেট লিখে দিলাম। হিন্দু সৎকার-সমিতির গাড়ি আনিয়ে দিলাম। ওর রুমমেট রুগিটিকে ভর্তি করিয়ে দিয়ে সেই যে কেটে পড়ল আর এ দিকে ভেড়েনি। হয়তো তার ভয় ছিল মিথ্যা নাম-ধাম লেখানোর জন্য। যাই হোক, আমি আমার দুই স্ট্রেচার বেয়ারা আর ছন্দা সৎকার সমিতির গাড়িতে করে হতভাগ্যকে ক্যাওড়াতলা ক্রিমেটোরিয়ামে পুড়িয়ে দিয়ে এলাম। বিশ্বাস করুন মিস্টার বাসু, শ্মশানে ছন্দা হাউ-হাউ করে কাঁদছিল। আমাকে বললে, মনে হচ্ছে আমি দ্বিতীয়বার বিধবা হলাম।

—তারপর ছন্দা দশ হাজার টাকা আদায় করল ?

—তা করল। আমার ওই ডেথ-সার্টিফিকেটের বলে !

—আপনি কতদিন ধরে ওকে চেনেন ?

—ও পাস করার পর থেকে—প্রায় ছয় বছর। এখানে কাজ করতে আসে যখন, তখন ওঁর সিঁথিতে সিঁদুর ছিল। এখানে কাজ করতে করতেই খবর পায় বাস-দুর্ঘটনায় ওর নিরুদ্দিষ্ট স্বামী মারা গেছে। তারপর এখানেই কাজ করতে থাকে নার্স হিসাবে।

—ও বিধবা হবার পর আপনি কি ওকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন ?

ডাক্তার ব্যানার্জির মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে। মুখ তুলে বলেন, এসব প্রশ্নের কি কোনো প্রয়োজন আছে ?

—আছে। বলুন ?

—হ্যাঁ, চেয়েছিলাম। সে রাজি হয়নি।

—কেন সে আপনাকে ভালোবাসতে পারল না, তা আন্দাজ করতে পারেন ?

—কে বললে সে আমাকে ভালোবাসতে পারেনি ? আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল সম্পূর্ণ অন্য কারণে। ও স্থির করেছিল আবার বিয়ে করবে না। পুরুষ মানুষকে আর সে বিশ্বাস করতে রাজি ছিল না—অন্তত স্বামী হিসেবে নয়।

—তারপর হঠাৎ একদিন সে ধনকুবেরের একমাত্র পুত্রটিকে রাতারাতি বিয়ে করে বসল !

—আদালত আর অপরাধ জগতের বাইরে আপনি যে কিছুই বোঝেন না, সে-কথা আপনার এই মন্তব্যে বোঝা যায় !

—কোনটা ভুল বলেছি ? ত্রিদিবনারায়ণ ধনকুবেরের একমাত্র সন্তান নয় ? নাকি মাত্র এক সপ্তাহের কোর্টশিপে ওদের বিয়েটা হয়নি।

—কথাটা তা নয়। প্রতিটি নারীর আদিম প্রেরণা : মাতৃত্ব। এটা জীববিজ্ঞানসম্মত, বিবর্তনবাদ সম্মত। তার যে মোহিনীরূপ, পুরুষকে ভালোবাসা, পুরুষকে কাছে পেতে চাওয়া, তারও মূল প্রেরণা ওই 'সারভাইভাল অব দ্য স্পেসিস্'। কমলেশের বিশ্বাসঘাতকতায় ওর মনের একটা দিক থেঁতলে গেছিল। কিন্তু তার মাতৃত্বকামনাটাকে কমলেশ মাড়িয়ে যেতে পারেনি। ত্রিদিবের মধ্যে ছন্দা সেই অনুভূতিটা চরিতার্থ করতে চেয়েছিল। ত্রিদিব ওকে আঁকড়ে ধরেছিল, ভেবেছিল সে নিজে ছন্দার প্রেমে পড়েছে—আসলে সে শুধু বাঁচতে চেয়েছিল। যেন ডুবন্ত মানুষের কাছে ছন্দা একটা ভেসে যাওয়া কাঠ। আর ছন্দা চেয়েছিল তার অপূর্ণ মাতৃত্ব-কামনাকে চরিতার্থ করতে। আমি মনস্তত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা করেছি। তাই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু ছন্দাকে বুঝিয়ে দিতে পারিনি। সে মনে করেছিল, আমি ত্রিদিবকে ঈর্ষা করছি অহেতুক।

—তারপর কি আপনার সঙ্গে ছন্দার মনান্তর হয় ?

—মোটেই নয়। আমরা দু-জনে দু-জনের বন্ধু। ছন্দার রেজিস্ট্রি বিয়েতে আমিই একমাত্র কনের তরফের বন্ধু হিসাবে উপস্থিত ছিলাম।

—তারপর হঠাৎ কমলেশের আবির্ভাব ঘটল ?

—হ্যাঁ! হঠাৎ আকাশ ফুঁড়ে সে এসে উপস্থিত। বোধকরি ইনশিওর কোম্পানিতে খোঁজ নিয়ে সে জানতে পেরেছিল ছন্দা কীভাবে টাকাটা আদায় করেছে।

—আপনাকে ব্ল্যাক-মেইল করার চেষ্টা করেনি ?

—না! ডেথ-সার্টিফিকেট কে দিয়েছে, তা ও জানতে পারেনি। ও আমাকে চিনত না। ও শুধু ছন্দার কাছেই টাকা চেয়েছিল।

—কত টাকা ?

—তৎক্ষণাৎ দু-হাজার আর এক মাসের মধ্যে দশ হাজার।

—ছন্দার কাছে অত টাকা ছিল না ?

—না, ছিল না। আমি ধার দিতে চেয়েছিলাম। সে রাজি হয়নি ? বলেছিল, এভাবে ব্ল্যাকমেলারকে রোখা যায় না। কমলেশ ওকে চব্বিশঘণ্টা সময় দিয়েছিল।

—সেজন্যই ওকে রিভলবারটা দিয়েছিলেন ?

—ঠিক সেজন্যই নয়। ও যাতে আত্মরক্ষার্থে ব্যবহার করতে পারে তাই ওটা ছন্দাকে রাখতে দিয়েছিলাম।

—আপনি তাহলে জানতেন যে, শনিবার রাত একটার সময় ছন্দা ওই কমলেশের সঙ্গে দেখা করতে যাবে ? তারাতলায় ?

—হ্যাঁ, জানতাম। ছন্দা আমাকে বলেছিল।

—সেই জন্যেই আপনি রাতে তারাতলায় যান ?

—আমি ? তারাতলায় ? শনিবার রাতে ? নিশ্চয় নয়!

—শনিবার রাত একটার সময় আপনি কোথায় ছিলেন ?

—ন্যাচারালি বাড়িতে। ঐ সিঙ্গল-বেডখাটে অঘোর ঘুমে অচেতন।

—আপনার কোনো সাক্ষী বা প্রমাণ আছে ?

—এর আবার কী প্রমাণ থাকবে ?

—আপনার বাড়িতে একজন ওড়িয়া চাকর আছে। আপনার কম্বাইণ্ড-হ্যাণ্ড। সে কোথায় ?

—আপনি কী করে জানলেন ?

—তাকে ডাকুন। আমি জানতে চাই শনিবার রাত দেড়টার সময় টেলিফোন ধরে কেন সে মিথ্যা কথা বলেছিল ?

—গদাধর ? কী বলেছে গদাধর ?

—'ডাক্তারবাবু গাড়ি নিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেছেন!' কেন ? আপনি ফিরে আসার পর সে আপনাকে বলেনি যে, একটা টেলিফোন কল এসেছিল রাত বারোটা তেতাল্লিশে ?

—গুড গড! আপনি···আপনি ঘটনার আগে কেমন করে আমাকে

ফোনে…

—আপনি যখন সাক্ষী দিতে উঠবেন তখন পুলিসের কাউন্সেল ওই প্রশ্নটা করবে। আপনি কোথায় রোগী দেখতে গেছিলেন, শনিবার রাত বারোটা তেতাল্লিশে।

—আমি…আমি কেন সাক্ষী দিতে যাব ?

—যেহেতু আপনি সমন পাবেন। শুনুন ডক্টর ব্যানার্জি, আপনাকে বিপদে ফেলা আমার উদ্দেশ্য নয়। ছন্দা আমার ক্লায়েণ্ট; ন্যাচারালি ছন্দার বন্ধুদের উপকারই আমি করব। পরিবর্তে তাদের সহযোগিতাও প্রত্যাশা করি আমি। আপনি আদ্যন্ত সত্য কথা খুলে বলবেন ? ওই শনিবার রাত্রির ঘটনাটা ?

এক মুহূর্তে চিন্তা করে রাজি হয়ে গেলেন ডাক্তারবাবু। বলে গেলেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা :

হ্যাঁ, উনি জানতেন যে, ছন্দা রাত একটার সময় কমলেশের বাড়িতে যাবে বলে কথা দিয়েছে। ছন্দার ইচ্ছে ছিল কমলেশকে বুঝিয়ে বলবে যে, তার অনেক কীর্তি-কাহিনীর কথা ছন্দাও জানে। একটা মুখোমুখি ফয়শলা করতে চেয়েছিল সে। ডাক্তারবাবু ওকে আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসাবে আগ্নেয়াস্ত্রটা দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ছন্দা ওঁকে বলেছিল যে, জীবনে সে পিস্তল ছোঁড়েনি। প্রয়োজনে সময় মতো সেটা ব্যবহার করতে পারবে কি না তার নিজেরই সন্দেহ আছে। রাত বারোটা নাগাদ উনি উঠে পড়েন। গাড়িটা গ্যারেজ থেকে বার করে চলে আসেন তারাতলায়। কমলেশের বাড়িটা উনি চিনতেন। প্রায় একশ গজ দূরে গাড়িটা পার্ক করে উনি হেঁটে চলে আসেন। তখন কমলেশের ঘরে আলো জ্বলছিল। রাস্তার ধারে ছন্দার মারুতি গাড়িটাকে পার্ক করা অবস্থায় দেখতে পান। কিছু দূরে একটা মোটর সাইকেলও দাঁড় করানো ছিল। বাড়ির কাছাকাছি এসে ওঁর মনে হল দেড়তলার মেজানাইনে একটা বচসা হচ্ছে। তারপরেই কাচের কিছু একটা ভেঙে যাবার শব্দ আর সঙ্গে সঙ্গে বাতিটা নিবে গেল। ডক্টর ব্যানার্জি তখন ডোরবেলটা টিপে ধরেন।

কেউ সাড়া দেয় না। হঠাৎ রাস্তায় একটা বম্ এক্সপ্লোশান হল যেন। উনি ছুটে পালিয়ে গেলেন কিছু দূরে। সেখান থেকে পিছন ফিরে দেখেন— না, শব্দটা মোটর-বাইক স্টার্ট হবার। উনি দাঁড়িয়ে পড়েন। বোধহয় মিনিটখানেক পরে কমলেশের সদর দরজা খুলে যায়। ছন্দা ছুটে বেরিয়ে আসে। গাড়িতে উঠে বসে। স্টার্ট দেয়। ছন্দা পালিয়ে আসতে পেরেছে দেখে উনি নিশ্চিন্ত হন। উনিও নিজের গাড়িতে উঠে স্টার্ট দেন। পিছনে কী ঘটল তা আর দেখেননি।

—আপনি আর কোনো লোককে দেখেননি ?

—কোথায় ?

—ধরুন, ওই বাড়ির কাছে-পিঠে বা বাঁশের ভারা বেয়ে নামতে ?

—না।

—আর কোনো গাড়ি কি পার্ক করা ছিল। রাস্তার ধারে?

—তা হয়তো ছিল। আমি নজর করিনি।

বাসু-সাহেব দশ সেকেণ্ড চিন্তা করে বললেন, এবার আমি আপনাকে একটা খুব গোপন কথা বলতে চাই। যদি আপনি কথা দেন যে, কথাটা, পাঁচ কান করবেন না।

—কী কথা?

—আমি বলতে চাইছিলুম যে, আপনাকে খুব সুস্থ বোধ হচ্ছে না।

—এই আপনার গোপন কথা? আমার যা মানসিক অবস্থা তাতে আমাকে কেমন দেখানোর কথা? খুব সুস্থ? হেইল অ্যাণ্ড হার্টি?

—তা নয়, মানে এই রকম শারীরিক, এমন মানসিক অবস্থায় সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে···

—সাক্ষী! আমি কেন সাক্ষী দিতে যাব? ছন্দার পক্ষে? আপনি 'সমন' করবেন?

—না, আমি করব না। আপনার সাক্ষ্য তো ছন্দার ক্ষতিই করবে শুধু। আমার মনে হয় ছন্দার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার জন্য আপনার ডাক পড়বে, পুলিসের তরফ থেকে। পুলিস যখনই আবিষ্কার করবে যে, ছন্দা ওই ইনশিওরেন্স-এর টাকাটা তার স্বামীর জীবিতকালে নিয়েছে তখনই আপনাকে তলব করবে। প্রমাণ করতে যে, মেয়েটি পাকা ক্রিমিনাল,—আগেও তঞ্চকতা করেছে! আপনাকেও এ মামলায় তারা জড়াতে চাইবে—ফল্‌স ডেথ সার্টিফিকেট দেবার জন্য।

ডাক্তারবাবু অসহায় ভঙ্গিতে বাসুর দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

—তাই তো বলছিলাম, আপনাকে খুবই অসুস্থ লাগছে! আপনার কোন্নো পেশেণ্ট যদি এমন অবস্থায় পড়ে তখন আপনি তাকে কী পরামর্শ দেন? একজন স্পেশালিস্টকে দিয়ে দেখাতে। তাই নয়? আমার কথায় কিছু করে বসবেন না। তবে স্পেশালিস্টের কাছে আপনি জানতে চাইতে পারেন এ অবস্থায় বায়ু পরিবর্তনে কোনো উপকার হতে পারে কি না। আই মিন···

—কী বলছেন আপনি! ছন্দার এই বিপদ, আর আমি তাকে ফেলে এখন বেড়াতে যাব?

—তা যদি বলেন ডক্টর ব্যানার্জি, তা হলে বলি—আপনার কলকাতায় উপস্থিতিটাই ছন্দার সর্বনাশের কারণ হতে পারে। অবশ্য আমি শুধু স্বাস্থ্যের কারণে আপনাকে রাতারাতি চেঞ্জে যেতে বলছি, তার সঙ্গে ছন্দার কোনো সম্পর্ক নেই। সেটা শুধু আপনার স্বাস্থ্যের কারণে। অবশ্য আমি তো ডাক্তার নই। আপনি কোনো স্পেশালিস্টের পরামর্শ মতো যদি···

হঠাৎ দাঁড়িয়ে ওঠেন ডক্টর ব্যানার্জি। বাসু-সাহেবের দুটো হাত চেপে

ধরে বলে ওঠেন, থ্যাংকস কাউন্সেলার! কথাটা অনেক আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল। কাল সকালেই···

—আপনার অবসর বিনোদন কালের ঠিকানাটা···

—না, না, নিশ্চিন্ত থাকুন। জবাকেও তা জানিয়ে যাব না। এ মামলা না মেটা পর্যন্ত···অল রাইট, অল রাইট! এসব কথা আলোচনা করাও মূর্খতা। আই নো!

—বঁ ভয়েজ!—বাসুও উঠে দাঁড়ান!

যেন ডাক্তারবাবু এখনই রওনা দিচ্ছেন।

।। বারো ।।



পরদিন সকালবেলা ব্রেকফাস্ট টেবিলে কৌশিক বললে, একটা দুঃসংবাদ আছে, মামু। বলেন তো সবিনয়ে নিবেদন করি।

বাসু-সাহেব পট থেকে কাপে কফি ঢালতে ঢালতে বলেন, এমন কোনো সুপ্রভাতের কথা তো স্মরণ করতে পারছি না কৌশিক, যেদিন প্রাতরাশ টেবিলে দিনটা বিষিয়ে দেবার সুব্যবস্থা তুমি করনি। বল! আমি কর্ণময়। ইদানীং নীল-কণ্ঠও হয়ে গেছি! সব জাতের হলাহলই হজম করতে পারছি।

কৌশিক বললে, আপনার মক্কেল আপনার পরামর্শে কান দেয়নি, ফার্স্টক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখিত জবানবন্দি দিয়ে বসেছে।

—আরক্ষা-বিভাগের এই সুরক্ষিত গোপন তথ্য তুমি কেমন করে সংগ্রহ করলে?

—সুকৌশলী আবার কী করে জানবে? সুকৌশলে: পুলিস বিভাগের একাংশ অর্থমূল্যে খবর বিক্রি করে থাকে। আপনি শোনেননি?

—বুঝলাম। জবানবন্দিতে ছন্দা কী বলেছে?

—বলেছে, কমলেশ তাকে ব্ল্যাকমেলিঙের চেষ্টা করছিল। বস্তুত কমলেশ এতদিন আত্মগোপন করে বসেছিল, অপেক্ষা করছিল কত দিনে ছন্দা দ্বিতীয়-বার বিয়ে করে। ত্রিবিক্রমনারায়ণের একমাত্র পুত্রকে সে বিয়ে করেছে এই খবর পেয়েই কমল সবিক্রমে আত্মঘোষণা করতে উদ্যোগী হয়েছিল। বার-কয়েক ছন্দা নাকি টেলিফোনে কমলেশের সঙ্গে কথা বলে। ছন্দা ওকে উলটে ধমক দেয় যে, যে-মুহূর্তে সে আত্মঘোষণা করবে সেই মুহূর্তেই নানান ব্যক্তি তাকে আক্রমণ করবে—যাদের কন্যা বা ভগ্নীকে ফাঁসিয়ে এতদিন সে আত্মগোপন করে ছিল। এ আশংকা কমলেশের নিজেরও ছিল। তাই সে একটা মাঝামাঝি রফা করতে চেয়েছিল। ছন্দা রাজি হয় যে, শনিবার রাত একটায় সে তারা-তলায় তার প্রথম স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবে। বস্তুত ত্রিদিব ঘুমিয়ে পড়ার পর সে গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে তারাতলায় চলে আসে। গাড়িটা

পার্ক করে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে সে লক্ষ্য করে যে, কমলেশের ঘরে আলো জ্বলছে। ভিতর থেকে একটা বচসার শব্দ ভেসে আসছে। ছন্দা ওই সময় 'কলবেল'টা বাজায়। কিন্তু কেউ সাড়া দেয় না। এই সময় ঝন্‌ঝন্‌ করে কাচের কিছু বাসনপত্র ভেঙে যাবার শব্দ হয় আর তৎক্ষণাৎ বাতিটা নিবে যায়। ঠিক তার পরেই ছন্দার নজরে পড়ে দেড়তলার ঘর থেকে কেউ বাঁশের ভারা বেয়ে নেমে আসছে। লোকটার পরনে শার্ট-প্যান্ট, মাথায় লোহার হেলমেট। ছন্দা আত্মগোপন করে। একটু পরেই সে শুনতে পায় একটা মোটর সাইকেলের চলে যাবার শব্দ। ছন্দা এরপর নিজের গাড়িতে উঠে বাড়ি ফিরে আসে। —এই হচ্ছে তার জবানবন্দির চুম্বকসার।

—কমলেশের বাড়ির কাছাকাছি অন্য কোনো পরিচিত গাড়িকে সে কি পার্ক করা অবস্থায় দেখেছে? সে-সব কথা কথা কিছু বলেছে?

—না।

—তারপর বোধকরি পুলিস-অফিসার ওর নাকের ডগায় একটা চাবির-রিং দুলিয়ে প্রশ্ন করেছিল: এটা তাহলে কী করে ঘরের ভিতর পাওয়া গেল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা করেছিল। ছন্দা তার জবাবে বলেছে যে, সে বিকালের দিকে তারাতলায় একবার এসেছিল। কমলেশের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে; কিন্তু বেশিক্ষণ বসতে পারেনি। চাবিটা হয়তো তখনই ওর ভ্যানিটি-ব্যাগ থেকে পড়ে যায়।

বাসু ম্লান হেসে বললেন, কেউ নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল চালায়, কেউ কুড়ুলটা খাড়া করে পেতে তাতে পদাঘাত করে। ফল একই!

রানু জানতে চান, এ কথা কেন বলছ?

—হতভাগীকে পই-পই করে বলে এলাম যে, পুলিস তোমাকে নানান জাতের রাঙামুলো দেখাবে। লোভে পড়ে কোনোটা গিলতে যেও না। আমার অনুপস্থিতিতে কোনো স্টেটমেন্ট দিও না। তা শুনল না মেয়েটা। প্রথম থেকেই দেখছি—বড্ড একবগ্‌গা! নিজে যা ভালো বোঝে তাই করবে।

কৌশিক সায় দেয়, ঠিক তাই। পুলিস নানা সার্কামস্ট্যান্সিয়াল এভিডেন্স থেকে প্রমাণ করবে যে, শনিবার বিকাল থেকে রাত একটা পর্যন্ত ছন্দার কাছে চাবির থোকাটা ছিল। এরমধ্যে হয়তো দু-একবার গ্যারেজের তালা বন্ধ করেছে ত্রিদিব। ছন্দা তা খুলেছে। হয়তো কোনো পেট্রোল পাম্পের 'বয়' আদালতে উঠে সাক্ষী দেবে ওই মেমসাহেব রাত আটটার সময় তাদের দোকান থেকে পেট্রোল খরিদ করেছেন—চাবির থোকাটা ওই ছোকরার হাতে দিয়েছেন পেট্রোল ট্যাংক খুলতে। সেই পেট্রোল পাম্পের মালিক ভাউচারের কাউন্টার ফয়েলে হয়তো ওই মারুতি গাড়ির নম্বরটা এস্‌ট্যাব্লিশ করবে।

বাসু বলেন, এসব অনেক অনেক সাক্ষীর সম্ভাবনা তো আছেই। তা ছাড়াও কিছু প্রত্যক্ষ বিপদের সম্ভাবনা আছে। বাস্তবে কে যে কলবেলটা বাজিয়েছে তা আমরা জানি না, কিন্তু ঘটনাস্থলে ওই সময়ে আরও দু-জন বা তিনজন ব্যক্তির উপস্থিতির কথা অনুমান করা যাচ্ছে। যে লোকটা ভারা

বেয়ে নেমেছিল, যে-লোকটা দেশলাই জ্বালাচ্ছিল, যে-লোকটা মোটর বাইকে করে পালায় এবং নিজ স্বীকৃতি মতে ডক্টর ব্যানার্জি। পুলিস যদি কোনো-ক্রমে ব্যানার্জির সন্ধান পায় এবং তাঁকে কাঠগড়ায় তোলে তাহলে তিনিই দাবি করবেন যে, কল-বেলটা তাঁরই আঙুলের ছোঁয়ায় বেজেছিল...

সুজাতা বলে, ছন্দা ওই জবানবন্দি দিয়েছে জেনেও—

বাসু বলেন, প্রথম কথা তিনি যদি সত্যিই কলবেল বাজিয়ে থাকেন তাহলে হলফ্ নিয়ে তিনি মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারেন না, এমন কি ছন্দাকে বাঁচানোর জন্যও নয়। দ্বিতীয় কথাঃ পুলিস যদি ওই ফলস্ ডেথ-সার্টি-ফিকেটের অস্তিত্ব টের পায় তাহলে ডাক্তারবাবু নিতান্ত বেকায়দায় সাক্ষীর মঞ্চে উঠে দাড়াবেন। পুলিস যে-ভাবে চাইবে সেভাবেই তাঁকে সাক্ষী দিতে হবে।

কৌশিক বলে, তাছাড়া ওই মোটর-বাইকের আরোহী, সম্ভবত যে ভারা বেয়ে নেমে এসেছিল তাকেও যদি পুলিস পাকড়াও করে তাহলে সেও ওই সুযোগটা চাইতে পারে। কারণ বোঝা যাচ্ছে, কলবেলটা যে বাজিয়েছেন সে ভিতরে ঢোকেনি।

* * *

বাসু-সাহেবের চেম্বারে দিনের প্রথম সাক্ষাৎপ্রার্থী একজন স্বনামধন্য বিশিষ্ট ব্যক্তি। রানু তাঁর আগমনবার্তা ইণ্টারকমে জানালেন না। সাক্ষাৎ-প্রার্থীকে রিসেপশান-কাউণ্টারে বসিয়ে নিজেই চাকা-লাগানো চেয়ারে পাক খেয়ে এঘরে চলে এলেন। বাসু কী একটা নোট দেখছিলেন। চোখ তুলে তাকিয়ে বলেন, কী ব্যাপার? কেউ দেখা করতে চায়?

—তা চায়। ভি. আই. পি. ভিজিটার। স্বয়ং শ্বশুর মহাশয়!

—মানে? কার শ্বশুর?

—কার আবার? তোমার মক্কেলের!

—আই সি! স্বনামধন্য বাণিজ্যচুম্বক ত্রিবিক্রমনারায়ণ? ঠিক আছে। পাঠিয়ে দাও। তাঁকে আমার দরকার। এই বিপুল খরচের ব্যয়ভার মেটানোর জন্যে...

—তুমি কি আশা করছ পুত্রবধূর মামলায় উনি খরচ করবেন?

—তা তো করতেই হবে। 'খানদান' বলে কথা! শক্তাবৎ রাজপুত রাও পরিবারের বধূমাতা হত্যার অপরাধে কাঠগড়ায় দাঁড়াবেন অথচ তার শ্বশুর-মশাই খরচ করবেন না? একি হয়?

—আমি বাজি ধরতে পারি, তুমি ওঁর কাছ থেকে একটা পয়সাও আদায় করতে পারবে না।

—আমি তোমার বাজিটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারছি না রানু, সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। তুমি জিতলে অথবা হারলে টাকাটা আমাকেই মিটিয়ে দিতে হবে—যেহেতু আমাদের জয়েণ্ট-অ্যাকাউণ্ট। মহান অতিথিকে আর বেশিক্ষণ বসিয়ে রেখ না। পাঠিয়ে দাও।

রানু দুই ঘরের দরজাটা খুলে নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, আসুন

রাও-সাহেব। মিস্টার বাসু আপনার প্রতীক্ষা করছেন।

রাও ত্রিবিক্রমনারায়ণ ঘরে প্রবেশ করলেন। 'বাও' করলেন, মৃদু হাসলেন। কিন্তু করমর্দনের জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিলেন না।

বাসু দাঁড়িয়ে পড়েছেন। হাত বাড়িয়ে একটি চেয়ারকে নির্দেশ করলেন। উভয়েই উপবেশন করলেন। নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন মিসেস বাসু। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

ত্রিবিক্রম বললেন, আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন কেন এই আন্-অ্যাপয়েণ্টেড সাক্ষাৎকার?

বাসু সহাস্যে বলেন, আমি বস্তুত প্রতিদিনই আপনাকে প্রত্যাশা করছি। কাগজে যখন দেখলাম, আপনি ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সে বক্তৃতা দিতে কলকাতায় এসেছেন।

—সেটা গৌণ কারণ, ব্যারিস্টার-সাহেব। আমাকে নাসিক থেকে উড়ে আসতে হয়েছে আমার 'খানদান'-এর খাতিরে।

—বুঝেছি। আপনার পুত্র ত্রিদিবের সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছে? কলকাতায় আসার পর? শুনেছি, সে সেই রবিবার সকাল থেকে আর আলিপুরের ঠিকানায় থাকে না?

ত্রিবিক্রম হাসলেন। বলেন, ব্যারিস্টার-সাহেব, আমার মনে হয় আমি যে উদ্দেশ্য এসেছি, যে প্রস্তাবটা পেশ করতে চাই, তা প্রথমে দাখিল করি। তারপর আপনি আপনার সওয়াল শুরু করবেন…

—ঠিক আছে। বলুন, কী আপনার প্রস্তাব?

—দেখুন বাসু-সাহেব, আমি খোলা কথার মানুষ। শুনেছি, আপনিও তাই। আমি পেশাগতভাবে একজন 'ফিনানশিয়ার'। টাকা খাটাই। দৈনিক লাখ লাখ নয়, কোটি টাকা হাত ফিরি হয়। সবই যে আমার টাকা তা নয়, তবে আমার হাত দিয়ে যায়। এর ফলে বেশ কিছু সুদক্ষ আইনজীবীকে আমি মাস-মাহিনায় রাখতে বাধ্য হয়েছি। তবে তারা সবাই করপোরেশন—বা কমার্শিয়াল-ল-এর বিশেষজ্ঞ। সবাই দেওয়ানি আদালতের। আপনিই আমার 'কর্মজীবনে' প্রথম ক্রিমিনাল ল-ইয়ার, যাঁর সঙ্গে আমাকে কারবার করতে হচ্ছে।…আমি জানি, দেওয়ানি আদালতের ওই সব গয়ংগচ্ছ আইন-বিশারদের মতো গদাই-লস্করি চাল আপনাদের পোশায় না। আপনাদের অত্যন্ত দ্রুত অথচ নির্ভুল বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়—কারণ ভুল হলে আপনার মক্কেল গাঁটগচ্চা দিয়েই নিষ্কৃতি পাবে না; তাকে জেল খাটতে হবে বা ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হবে…

বাধা দিয়ে বাসু বলেন, আপনি কিন্তু কাজের কথায় এখনও আসেননি। ভূমিকাটা সংক্ষেপ করলে দু-পক্ষেরই সুবিধা।

—ধন্যবাদ। আমার পুত্র আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে প্রথম সুযোগেই। সে তার সহধর্মিণীকে বাঁচাতে চায়—খুবই স্বাভাবিক প্রেরণা। কিন্তু যেহেতু তার ধমনীতে শক্তাবৎ-রাজবংশের রক্ত বইছে, যেহেতু সে রাঠোর রাজপুত,

তাই সে মিথ্যার সঙ্গে আপোষ করতে অসম্মত। স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ বা সহানুভূতি তাকে কিছুতেই সত্য থেকে বিচলিত করবে না। এই তার খানদান।

বাসু পাইপে আগুন দিতে দিতে বলেন, আপনি কিন্তু ভূমিকা পর্যায়েই আটকে আছেন এখনও। আমাকে নতুন কোনো তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি।

—আমি আমার বক্তব্যের বনিয়াদটা বানাচ্ছিলাম।

—সেটা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। আপনার পুত্র তার নিদ্রাগতা ধর্মপত্নীকে ত্যাগ করে স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে আমার সঙ্গে এবং থানা অফিসারের সঙ্গে দেখা করে ইতিপূর্বেই 'ফাউণ্ডেশনটা' বানিয়ে ফেলেছে। আপনি সরাসরি সুপার-স্ট্রাকচারের বক্তব্যে আসতে পারেন।

—ঠিক আছে। বক্তব্যটা এই : আমার পুত্র আপনাকে নিয়োগ করেছিল তার স্ত্রীর তরফে। সে কোনো 'রিটেইনার' দিয়ে যায়নি। আমি জানি, অগ্রিম না পাওয়া সত্ত্বেও আপনি ত্রিদিবের স্ত্রীর জন্য অনেক ছোটাছুটি করছেন, অনেক খরচও ইতিমধ্যে করে বসে আছেন। আমি এও জানি যে, আপনি প্রত্যাশা করছেন যে, আপনার 'ফি'টা আমি মিটিয়ে দেব। আপনি জানেন যে, আমার পুত্রের নিজস্ব বলতে কিছুই নেই। তার সব খরচপত্র আমিই বহন করি।...আমি ত্রিদিবের নির্বাচন ক্ষমতাকে নিশ্চয় তারিফ করব। তার স্ত্রী যে জটিল মামলায় জড়িয়ে পড়েছে তা থেকে তাকে মুক্ত করবার ক্ষমতা যদি কলকাতার কোনো আইনজীবীর থাকে তবে তিনি হচ্ছেন পি. কে. বাসু, বার-অ্যাট-ল। তাই এই পর্যায়েই আমার মনে হল, আপনাকে জানিয়ে রাখা উচিত যে, আমি আপনার যাবতীয় বিল মেটাব কিন্তু একটি শর্ত সাপেক্ষে—

—বলুন? আমার এখন শুধু শুনে যাওয়ার কথা।

—বলছি। কিন্তু মুশকিল কী জানেন? মন খুলে আপনাকে সব কথা যে বলা যায় না।

—কেন?

—কারণ ইতিপূর্বেই পাবলিক প্রসিকিউটার অ্যাডভোকেট নিরঞ্জন মাইতি মশায়ের সঙ্গে এই কেসটা নিয়ে কিছু আলাপচারি হয়েছে। তিনি আমাকে কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন : মামলাটা কোন্ পথে পরিচালনা করার পরিকল্পনা আছে তাঁর। সেটা তিনি আমাকে বিশ্বাস করে বলেছেন। তা নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে পারি না। তাতে বিশ্বসাভঙ্গ হবে।

—বটেই তো! সুতরাং?

—কিন্তু আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে বিখ্যাত। আপনি যদি নিজে থেকেই সেটা অনুমান করে আমাকে জানান, তাহলে আমি বিশ্বাসভঙ্গ না করেই ব্যাপারটা আলোচনা করতে পারি।

বাসু-সাহেবের দশটা আঙুল দশ সেকেণ্ড প্লাসটপ টেবিলে টরে-টক্কা বাজালো। তারপর তিনি বললেন, আপনি বোধহয় বলতে চান যে, যতদিন

আপনার পুত্র এবং ছন্দার সম্পর্কটা স্বামী-স্ত্রী, ততদিন মাইতি মশাই ত্রিদিবকে সাক্ষীর মঞ্চে তুলতে পারবেন না। ফলে, মাইতিমশায়ের প্রথম স্ট্র্যাটেজি হবে ওই বিবাহটা অ্যানাল করা অর্থাৎ বিবাহ-মুহূর্ত থেকে অসিদ্ধ প্রমাণ করা। তাই তো?

—ধন্যবাদ। আমি জানতাম, আপনি সঠিক অনুমান করতে পারবেন এবং এটাও আপনি অনুমান করতে সক্ষম যে, আমি ওই বিবাহটাকে অসিদ্ধ প্রমাণ করার বিষয়ে কী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করি। তাই না?

—আপনার ধারণায় পুত্র অবাঞ্ছিত বিবাহবন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ করেছে। তাই কি?

—নিশ্চয়! সে এমন একটি স্ত্রীলোককে বিবাহ করেছে যে অন্যপূর্বা, যে বয়সে বড়ো, যার 'খানদান' নেই এবং যে শুধুমাত্র পুত্রের বৈভবের কথা চিন্তা করেই তাকে বিবাহ করেছে।

—সে কী? আপনি তো এইমাত্র বললেন যে, আপনার একমাত্র পুত্র কপর্দকহীন! স্ত্রীকে ভাত-কাপড়ের জোগান দেবার প্রয়োজনে তাকে বাপের কাছে হাত পাততে হয়।

ত্রিবিক্রম আগুনঝরা চোখে বাসু-সাহেবের দিকে সেকেন্ড-পাঁচেক নির্বাক তাকিয়ে রইলেন। তারপর শান্তকণ্ঠে বললেন, আপনার মক্কেল জানে, তার স্বামী, আমার সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশ।

বাসু-সাহেব অ্যাশ-ট্রেতে ছাইটা ঝেড়ে ফেলে বললেন, লুক হিয়ার, মিস্টার রাও! আপনি অহেতুক কুণ্ঠা করছেন। আপনার প্রস্তাবটা আমিই বাতলে দিচ্ছি। দেখুন মেলে কি না। যে মেয়েটি খুনের মামলায় ফেঁসেছে তার যাবতীয় ব্যয়ভার আপনি মেটাতে স্বীকৃত একটি শর্ত সাপেক্ষে। শর্তটা হল এই যে, আমি 'ম্যারেজ-অ্যানালমেণ্ট' কেসটাতে কোনো ডিফেন্স দেব না। নির্বিবাদে ছন্দার সঙ্গে ত্রিদিবের বিবাহটা আইনত অসিদ্ধ হয়ে যাবার পর আমি মেয়েটিকে খুনের দায় থেকে বাঁচাব। অর্থাৎ বিবাহটা নাকচ হতে দিলেই আপনি আমার ফিজ মেটাবেন, আর আসামি যদি আপনার পুত্রবধূ হিসাবে মামলা লড়ে তাহলে আপনি একটি কানাকড়িও ঠেকাবেন না। মোদ্দা কথাটা তো এই?

ত্রিবিক্রম একটু নড়ে চড়ে বসলেন। অস্বস্তিটা ঝেড়ে ফেলে অবশেষে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন, তবে বড়ো চাঁছাছোলা ভাষায়।

—কিন্তু মূল বক্তব্যে কোনো ভুল নেই। তাই নয়?

—হ্যাঁ, তাই। অবশ্য আমার সঙ্গে সহযোগিতা করলে আপনার ন্যায্য বিলই শুধু মেটাব না, তার চেয়ে অনেক-অনেক বেশি···

বাসু বাধা দিয়ে বলেন, 'বিল'-এর উপর 'টিপ্‌স্‌' দেওয়া হবে। এই কথা কি বলতে চান?

—ছিঃ। আমি 'সম্মানমূল্যের' কথা বলেছি। 'অনারেরিয়াম্‌'···

—বুঝেছি, বুঝেছি। বিহারে ওকে বলে 'এথি', রাখা-ঢাকা—বাংলায় 'পান খেতে দেওয়া', বফর্স কেস-এর মতো ব্যাপারে বিজনেস্‌ ওয়ার্ল্ডে

'কমিশন' আর হর্ষদ মেহ্তা বা আপনার মতো ধনকুবেরদের ভাষায় 'অনারেরিয়াম'! প্রাকৃত জনের খেলো কথায় : 'ঘুষ'! তাই তো ?

ত্রিবিক্রম প্রতিবাদ করেন, এবার আর আপনার ভাষাটা শুধু চাঁছাছোলা নয়, মিস্টার বাসু, অশ্লীল এবং অশ্রাব্য। যাহোক, আপনার জবাবটা এক কথায় শুনে যাই ?

বাসু বলেন, তা কেমন করে হবে রাও-সাহেব ? প্রস্তাবটা পেশ করার আগে আপনি দীর্ঘ ধানাই-পানাই-ভূমিকার ফাউন্ডেশান গেড়েছেন, এখন এককথায় আমার জবাবটা শুনতে চাইলে আমিই বা রাজি হব কেন ? আমার জবাবেরও একটা ভূমিকা চাই তো ?

—ঠিক আছে। বলুন ?

প্রথম কথা ঃ ত্রিদিবনারায়ণ রাও একটি মেরুদণ্ডহীন ইনভার্টিব্রেট! এ কথা আপনিও জানেন, আমিও জানি। কিন্তু এ দুর্ঘটনার জন্য সে বেচারি কতটা দায়ী, আর কতটা আপনি, সে-কথা আমি জানি, কিন্তু আপনি জানেন না···

ত্রিবিক্রম চাপা গর্জন করে ওঠেন, আপনি এভাবে আমাকে বাগে পেয়ে অপমান করছেন ?

বাসু-সাহেব বলেন, অপমান। না তো! আপনি প্রস্তাবটা পেশ করার অবকাশে ধরে নিতে পারলেন যে, আমি সজ্ঞানে আমার মক্কেলের সর্বনাশ করব, আমি একজন অযোগ্য ঘুষখোর অ্যাটর্নি ; আর আমি তার জবাব দেবার সময় আমি "বাগু" করতে পারব না যে, আপনি সজ্ঞানে আপনার সন্তানের সর্বনাশ করেছেন, আপনি একজন অযোগ্য অপরিণামদর্শী পিতা ?

পুরো আধ মিনিট ত্রিবিক্রমের বাক্যস্ফূর্তি হল না। তারপর দাঁতে দাঁত দিয়ে বললেন, আপনি আমার প্রস্তাবটা গ্রহণ করছেন, না—না ?

—প্লিজ মিস্টার রাও! আমাকে বলতে দিন।

—কী বলবেন ? বলুন ?

—আপনার আশঙ্কা হয়েছে যে, ছন্দা যদি আপনার পুত্রবধূ হয়ে টিকে থাকে তাহলে আপনার একচ্ছত্র সাম্রাজ্যে একটা বিপ্লব ঘটে যেতে পারে। ছন্দা হয়তো ভালোবাসার জোরে স্বামীর মেরুদণ্ডের 'কার্টিলেজ'-হয়ে যাওয়া অস্থিগুলোকে কঠিন করে তুলবে। তাই আপনি তাকে সরাতে বদ্ধপরিকর। তাই না ?

—আপনি কিন্তু এখনও আমার প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরটা দেননি।

—দিইনি ? এবার তাহলে তাই দিচ্ছি ঃ আমি ছন্দা রাওয়ের ডিফেন্স-কেসটা নিয়েছি। সে আমার মক্কেল। তার স্বার্থের কথা সবার আগে দেখব আমি। আপনার পুত্রের মুখটা বন্ধ রাখতে পারলেই আমার মক্কেলের মস্ত সুবিধা। ফলে বিবাহ-নাকচের মামলাটা আমাকে লড়তেই হবে—জান-কবুল হাড্ডাহাড্ডি লড়াই!

—কিন্তু আইনজ্ঞ হিসাবে আপনি তো বুঝতে পারছেন যে, সে চেষ্টা বৃথা। অ্যাডভোকেট মাইতি বলেছেন, এটা জাস্ট 'ওপেন অ্যান্ড শাট কেস' —দশ মিনিটের ভিতর বিবাহটা নাকচ হয়ে যাবে, যেহেতু ছন্দা যখন আমার পুত্রকে রেজিস্ট্রি-বিবাহ করে তখনও কমলেশ জীবিত। ছন্দা সেই মুহূর্তে ছিল বিবাহিতা।

বাসু বললেন, মামলায় হার-জিত থাকেই। আমি মাইতির সঙ্গে এক মত : মামলার রায় হয়তো দশ মিনিটেই দেওয়া যাবে ; কিন্তু, 'প্রফেশনাল এথিক্স' বলে তো একটা কথা আছে। বিবাহ নাকচের মামলাটা আমাকে লড়তেই হবে।

–আপনার মক্কেল যদি আপনার ফিজ না মেটাতে পারে, তবুও ?

—মামলা জিতলে সে নিশ্চয় আমার প্রাপ্য মিটিয়ে দেবে। কারণ তখন তার স্বামী হয়ে যাবে কোটিপতির ওয়ারিশ। আর তার যদি সাময়িকভাবে সে ক্ষমতা না থাকে তাহলে খানদানের খাতিরে তার স্বনামধন্য শ্বশুরমশাই নিশ্চয় পুত্রবধূকে ঋণমুক্ত করে দেবেন।

—সেই হিসাবটাতেই প্রচণ্ড ভুল হচ্ছে আপনার।

—হতে পারে। আপনি বাণিজ্যচুম্বক। 'ফাটকা' নিশ্চয় খেলেন, অন্তত ফাটকা খেলা' কাকে বলে তা জানেন। আমি একটা ফাটকা খেলছি। হারলেও এটুকু সান্ত্বনা থাকবে যে, একজন নিষ্ঠুর কোটিপতি শ্বশুরের বিরুদ্ধে এক অসহায় নিঃস্ব পুত্রবধূর হয়ে লড়েছি। বিনা পারিশ্রমিকে। আর জিতলে ? সেক্ষেত্রে আপনি এই ঘরে ওই চেয়ারে বসে আমাকে আমার ন্যায্য পারিশ্রমিকটুকু মিটিয়ে দেবেন। বিনা 'টিপ্স্'-এ।

ত্রিবিক্রমনারায়ণ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। একটা বিচিত্র ব্যঙ্গহাস্য ফুটে উঠল তাঁর ওষ্ঠাধরে। বললেন, এরপর আর কথা চলে না। আমরা দুজনেই দুজনকে চিনেছি। ঠিক আছে। খেলুন ফাটকা! প্রাণ ভরে। নমস্কার।

॥ তেরো ॥



বাসু-সাহেবের মেজাজ খারাপ। সঙ্গত হেতুতে। প্রসিকিউশনের তরফে আদালতে আবেদন করা হয়েছিল যেন কমলেশ-হত্যা মামলার শুনানীর দিন একপক্ষকাল পিছিয়ে দেওয়া হয়। হেতু ? বাদীপক্ষ এখনও নানান তদন্ত করছে—[illegible] লাগবে 'কেস'টা সাজাতে। বিচারক প্রতিবাদীপক্ষের মতামত জানতে চান। বাসু বলেন, প্রতিবাদীপক্ষ ডিফেন্সের জন্য তৈয়ার। বাদীপক্ষের আবেদন-মোতাবেক মামলার দিন শুধু পনেরো দিন কেন—ছয় মাস পিছিয়ে দিলেও তাঁর আপত্তি নেই—কিন্তু শর্তসাপেক্ষে : আসামিকে জামিন দিতে হবে। জীবিকায় আসামি একজন নার্স—বিনা

বিচারে হাজতে রেখে দেওয়ায় তার দৈনিক উপার্জন বন্ধ।

বিচারক প্রতিবাদীর আবেদন গ্রাহ্য করেননি। তবে বাদীপক্ষের আবেদনও পুরোপুরি মেনে নেননি।

মামলার তারিখ সাতদিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র। জামিন দেওয়া হয়নি। জামিন না-মঞ্জুর হওয়ার একটা সম্ভাব্য হেতু: পুলিস-কর্তৃপক্ষ ত্রিদিব নারায়ণের বিবৃতির অংশবিশেষ সাংবাদিকদের মধ্যে বিতরণ করেছে। কাগজে ছাপা হয়েছে ত্রিদিবের অভিযোগ। একটি সদ্যবিবাহিতা বিয়ের কনে স্বামীকে জোরালো ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অভিসারে গিয়েছিল—এমন একটা মুখরোচক কিস্‌সা খবরের কাগজ লুফে নিল। বিচারক সেজন্যই প্রভাবিত হলেন কিনা বোঝা গেল না। মোটকথা সে জামিন পায়নি।

ওই দিন সন্ধ্যায় আদালত থেকে ফিরে আসার পরেই রানুদেবী খবর দিলেন, দু-টো কথা বলার আছে। তুমি আদালত বেরিয়ে যাবার পর কোর্ট-পেয়াদা এসে নোটিস সার্ভ করে গেছে। তোমার মক্কেল ছন্দা রাওয়ের বিরুদ্ধে। বিবাহ-নাকচের আবেদন। শুনানীর দিন: শুক্রবার, বেলা সাড়ে দশটা, আলিপুর কোর্ট-এ তিন নম্বর এজলাসে। তোমার ডায়েরিতে লিখে রেখেছি।

বাসু বললেন, এটা তো প্রত্যাশিত সংবাদ। ছন্দার বিবাহটা নাকচ না হওয়া পর্যন্ত কমলেশ-হত্যা মামলা শুরু হতে পারছে না যে!

—জানি। ত্রিদিব যতক্ষণ আইনত ছন্দার স্বামী, ততক্ষণ বাদীপক্ষ ত্রিদিবকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় তুলতে পারবে না। সেজন্যই ওরা মামলার দিন পিছিয়ে নিচ্ছে, যাতে তার আগেই বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলাটার ফয়সালা হয়ে যায়।

বাসুসাহেব কোটটা গা থেকে খুলতে ব্যস্ত ছিলেন। ওই অবস্থাতেই বললেন, ব্যারিস্টারের বউ হয়ে এমন একটা বে-আইনি কথা বলতে পারলে তুমি?

সুজাতা ছিল পাশেই। উপরপড়া হয়ে বলে, কেন? মামিমা কী ভুল বললেন?

বাসু কোটের আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে বসেছেন। পাইপ-পাউচ বার করতে করতে বললেন, ওদের বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর হয়ে গেলেও ত্রিদিব আদালতে উঠে সাক্ষী দিতে পারবে না, যদি তার ভূতপূর্ব স্ত্রী আপত্তি জানায়।

—কেন?

—কারণ ঘটনার রাতে ওরা স্বামী-স্ত্রী ছিল। আজ এখন বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর হলে ওদের অতীতকালের দাম্পত্য জীবনটা কর্পূরের মতো তো উপে যায় না।

সুজাতা জানতে চায়, তাহলে ওদের উদ্দেশ্য কী? কমলেশ-হত্যা মামলার তারিখ পিছিয়ে ওরা এত তাড়াহুড়ো করে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলাটা আদালতে আনছে কেন?

—আরে বাপু, নোটিসটা পড়ে দেখ। এটা কি ডিভোর্স পিটিশান? আদৌ নয়! এটা 'অ্যানাল্‌মেণ্টের' মামলা। ওরা বলতে চায় যে, ছন্দা বিশ্বাস আর ত্রিদিব রায় এক বিছানায় সাত রাত শুয়েছে, এই মাত্র। ওদের বিবাহটাই অসিদ্ধ। কারণ পনেরোই জুন তারিখে যখন ছন্দা বিশ্বাস আর ত্রিদিব রাও ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে উপস্থিত হয় তখন ওদের একজন—ছন্দা, ছিল অন্যপূর্বা, বিবাহিতা। তার প্রথমপক্ষের স্বামী কমলেশ বিশ্বাস ওই তারিখে জীবিত ছিল! সুতরাং ওই 'ছন্দা-ত্রিদিব' শুভবিবাহ গোড়া থেকেই অসিদ্ধ—'নাল অ্যাণ্ড ভয়েড'।

—এটা যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে ত্রিদিব তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে পারবে।

—আবার বে-আইনি কথা! 'স্ত্রী'-র বিরুদ্ধে হচ্ছে কোথায়? বিয়েটা যদি শুরু থেকেই অসিদ্ধ প্রমাণিত হয়, তখন ত্রিদিবের চোখে ছন্দা তো একজন ভারতীয় নাগরিক মাত্র, যে ওর বিছানায় সাতরাত শুয়েছে—স্ত্রী নয়। ফলে ছন্দার বিরুদ্ধে সে সাক্ষী দিতে পারবে না কেন? সে যাই হোক, তোমার দ্বিতীয় দুঃসংবাদটা কী? দুটো খবর দেবার আছে বলেছিলে না?

—হ্যাঁ, দ্বিতীয়টা দুঃসংবাদ নয়। ড. ব্যানার্জি ফোন করেছিলেন। বলেছেন, তুমি এলেই যেন ওঁর চেম্বারে একটা ফোন কর।

—ড. ব্যানার্জি! সে এখনও কলকাতায়?

—কেন? তাঁর কি বাইরে যাবার কথা ছিল?

—ধরত ডাক্তারকে। লোকটা এভাবে আত্মহত্যা করতে চাইছে কেন?

একটু পরেই ডাক্তার-সাহেবকে ফোনে ধরা গেল। ব্যানার্জি বললেন, আরে মশাই, ডাক্তার মানুষ কি রাতারাতি বেড়াতে যেতে পারে? যাব পরশু। টিকিট কেটেছি, হোটেলেও রিজার্ভেশন করেছি। দু-একটি রুগী মরতে বাকি আছে। সেগুলো সেরেই…

—আমাকে ফোন করতে বলেছিলেন কেন?

আমার নার্সিং হোমের একটি পেশেণ্ট আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। দিন-চারেক আগে তার গল-ব্লাডারটি কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাই শয্যাগত। না হলে তিনি নিজেই আপনার সঙ্গে গিয়ে দেখা করতেন।

—কী নাম ভদ্রলোকের?

—ভদ্রলোক নয়। ভদ্রমহিলা। বেহালা অঞ্চলে একটা স্কুলের হেডমিস্ট্রেস, শকুন্তলা দত্ত।

—অ! তা কী বিষয়ে তিনি আমার পরামর্শ চান সে কথার কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। প্রথম কথা, তিনি আপনার পরামর্শের জন্য সাক্ষাৎটা চাইছেন না—ওই কমলেশ বিশ্বাসের মার্ডার কেসের কিছু তথ্য আপনাকে জানাতে চান।

—রিয়ালি? আমি এখনি আসছি। আধঘণ্টার ভিতর।

রানি দেবী জানতে চান, চা-টা খেয়ে যাবে না ?

—টী ক্যান ওয়েট, টাইম কাণ্ট !

কোটটা গায়ে চাপাতে চাপাতে আবার গিয়ে উঠলেন গাড়িতে।

* * *

ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়নি। শকুন্তলা দত্তের কেবিনে তিন-চারজন দর্শনাথী। ডাক্তার ব্যানার্জি বাসু-সাবকে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই অন্যান্য দর্শনাথীরা উঠে দাঁড়াল। ব্যানার্জি পরিচয় করিয়ে দিলেন। শকুন্তলা বললেন, আপনি আমার খুবই পরিচিত, যদিও আজই আপনাকে চাক্ষুষ দেখলাম।

বাসু বলেন, ভা-রি নতুন কথা বললেন! ও-কথা তো আমিও বলতে পারি!

—কোন কথা ?

—আপনি আমার খুবই পরিচিত, যদিও আজই আপনাকে চাক্ষুষ দেখলাম!

—আমি আপনার পরিচিত ?

—আলবৎ। আপনি বড়িষা বেহালার মেয়েদের স্কুলে হেডমিস্ট্রেস্। আপনারা দুই বোন, আপনার ছোটোবোনের নাম অনসূয়া কর···

ওঁদের কেবিনে প্রবেশের পর যারা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে একটি মেয়ে হঠাৎ কথার মধ্যেই নিচু হয়ে বাসু-সাহেবকে প্রণাম করল। বাসু জানতে চানতে চান, কী হল ? তোমার আবার হঠাৎ ভক্তি উথ্‌লে উঠল কেন ?

শকুন্তলা বলেন, ওই আমার ছোটোবোন অনু।

—অ ! আর যে ছেলেটি আপনাকে সেই তেরোই আগস্ট, মানে সেই চুরাশি সালের কথা বলছি—আপনাকে বেলেঘাটার বস্তিতে নিয়ে গেছিল।

—আশ্চর্য ! তারিখটাও মনে আছে আপনার ? আমি তো ডায়েরি না দেখে···

এবার অনসূয়ার পাশে দাঁড়ানো যুবকটি নিচু হয়ে বাসু-সাহেবকে প্রণাম করে।

বাসু দু-হাতে ওর দুই কাঁধ ধরে ফেলে বললেন, থাক, থাক। তা হ্যাঁ গো. বিয়েটা সেরে ফেলেছ তো ? এখন তো আর কোনো বাধা নেই।

অনসূয়া মাথা নিচু করে। ছেলেটিও অপ্রস্তুত। জবাব দিলেন শকুন্তলা। বললেন, আমি বাড়ি ফিরে একটু সুস্থ হলেই সে আয়োজন করব। আপনাকে আসতে হবে কিন্তু।

—চেষ্টা করব। ভালোমন্দ খেতে পেলে ছাড়ি না, বামুন না হলেও! তা ডেকে পাঠিয়েছিলেন কেন ?

—কমলাক্ষর পূর্ব-ইতিহাস সম্বন্ধে কোনো সাক্ষ্যের প্রয়োজন হলে আমি রাজি আছি। প্রয়োজনে অনসূয়াও আদালতে উঠে সাক্ষী দেবে।

বাসু বলেন, কমলাক্ষ ওরফে কমলেশ ওরফে কমলেন্দু যে ধোয়া তুলসী-

পাতা ছিল, এমন দাবী তো পুলিস করেনি। ফলে আমরা সদলবলে মৃত মানুষটার চরিত্রহনন করে কোনোভাবেই লাভবান হব না। তবু তোমাদের নাম ঠিকানাগুলো লিখে দাও।

অনসূয়া নাম-ঠিকানা লিখে দিল। অস্ফুটে বললে, আপনি যদি সময় করে সেদিন আসতে পারেন দারুণ—দারুণ খুশি হব।

—তাই বুঝি? কিন্তু কোন্ দিনটার কথা বলছো, বল তো? সাল তারিখ আমার ঠিক মনে থাকে না।

অনসূয়া গোলাপি হাসি হাসে।

ডাক্তার ব্যানার্জি ওঁকে নিজের কোয়ার্টার্সে নিয়ে এলেন। বললেন, কী খাবেন বলুন? চা, কফি না ড্রিংক্স্?

—ড্রিংক্স্! তারও আয়োজনও আছে না কি? তা তোমার গার্জেনটিকে দেখছি না যে?

—গার্জেন?

—তোমার সেই কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল নার্স?

—ও, সে তো নার্সিংহোমে। কেন? দরকার আছে?

—আছে বৈ কি। গদাধরকে তো দেখছি না, তাহলে কফিটা বানাবে কে?

ডাক্তার ব্যানার্জি নার্সটিকে ডেকে পাঠালেন। বাসু তাকে বললেন, তোমার নামটা জানি না, তুমি বলছি। তা, আমার উপর আর রাগ নেই তো, মা?

নার্সটি সলজ্জে ওঁকে প্রণাম করে বলল, তখন তো আপনার সঠিক পরিচয় পাইনি। আমার নাম জবা দে।

—তিন কাপ কফি বানাও তো মা, জবা। মানে, তুমিও এককাপ খাবে, ধরে নিয়ে বলছি। আমারটা 'র'।

জবা হেসে সম্মতি জানিয়ে কিচেনেটের দিকে চলে গেল।

ডাক্তার বলেন, ছন্দার কেসটা কেমন বুঝছেন, বলুন?

বাসু বললেন, ডাক্তার আমাকে যা অ্যাডভাইস্ করে আমি তা কিন্তু শুনে থাকি—

—হঠাৎ এ কথা?

—তাহলে কনভার্স থিওরেমটা ট্রু হবে না কেন? তুমিই বা ব্যারিস্টারের অ্যাডভাইস মেনে নেবে না কেন?

—আরে মশাই ছুটিতে যাব বললেই কি যাওয়া যায়?

—যায়, ডক্টর ব্যানার্জি। তোমার হাতে যে-কটা জরুরি কেস আছে তা তোমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে ভাগাভাগি করে দাও। তোমার পক্ষে এখন কলকাতায় পড়ে থাকা অত্যন্ত বিপদজনক। আমি যেভাবে জানতে পেরেছি যে, সাতাশে মার্চ অস্টআশি সালে তোমার নার্সিং-হোমে একটি ক্যানসার রুগি মারা যায়—তোমার রেজিস্টার খাতা অনুযায়ী সে রুগির নাম...

—বুঝেছি, বুঝেছি। সেভাবে পুলিসও তথ্যটা আবিষ্কার করতে পারে... তাহলেই আমার সমূহ বিপদ, নয়? আচ্ছা, আপনি ও খবরটা জানলেন কী

করে ?

—সে প্রশ্ন অবান্তর, ড. ব্যানার্জি ! তোমাকে বরং আর একটা খবর দিয়ে রাখি, যা অত্যন্ত জরুরি···

—কী সেটা ?

—ছন্দা পুলিসের কাছে একটা জবানবন্দি দিয়েছে। আমার নির্দেশ না মেনে। সে স্বীকার করেছে যে, শনিবার রাত একটা নাগাদ সে ওই কমলেশের বাড়িতে গেছিল। তার জবানবন্দি অনুসারে সে ওই বাড়ির সামনে যখন যায় তখন দোতলার ঘরে আলো জ্বলছিল। একটা বচসা চলছিল। হঠাৎ কাচের কিছু একটা ভেঙে যাওয়ার শব্দ হয়। আর তৎক্ষণাৎ আলোটা নিবে যায়। ছন্দা নাকি তখন কলবেলটা টিপে ধরে। একটু পরে ওর মনে হয় দরজা খুলে কে যেন ছুটে বেরিয়ে গেল। তখন ও ভয় পেয়ে ফিরে আসে।

—আশ্চর্য ! এ ঘটনা, মানে প্রায় ওই রকম ঘটনা তো ঘটেছে আমার ক্ষেত্রে।

—আমি জানি। একটা কথা খেয়াল করে দেখ। পুলিস জানে, কমলেশ যখন খুন হয় তখন বাড়ির বাইরে কেউ একজন কলবেল বাজাচ্ছিল। এ তথ্য-টার দু-দুটো সূত্র। পানওয়ালা বটুক এবং তার স্ত্রী। পুলিস এও জানে যে, যে লোকটা কলবেল বাজাচ্ছিল সে বাড়ির বাইরে ছিল। ফলে সে হত্যা-কারী হতে পারে না। তোমাকে যদি পুলিস ট্রেস করতে পারে, তাহলে তোমার জবানবন্দি নেবে। তখন দেখা যাবে তোমরা দু-জনেই ওই দাবিটা করছ—তুমি ও ছন্দা ! দু-জনেই নিজ নিজ স্টেটমেণ্ট অনুযায়ী ঘটনার সময় ফুটপাথে। কলবেল বাজাচ্ছ ! এর মধ্যে একজন নিশ্চয় মিথ্যে কথা বলছে ! পুলিস বিশ্বাস করবে যে, মিথ্যা কথাটা বলেছে ছন্দা। সহজবোধ্য হেতুতে। যেহেতু ছন্দা হচ্ছে আর্কিউজড্ ! এজন্য তোমার পক্ষে কলকাতায় থাকাটা···

মাঝপথেই থেমে গেলেন বাসুসাহেব। কারণ ঠিক তখনই পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করল জবা। তার হাতে একটা ট্রে-তে তিন কাপ কফি, বিস্কিট। একটা কাপে র-কফি।

কফি পরিবেশন করতে করতে জবা বললে, আপনারা নিশ্চয় এতক্ষণ আমার নিন্দে-মন্দ করছিলেন, তাই নয় ?

ডাক্তার ব্যানার্জি বলেন, এ-কথা কেন ?

—আমি আসা মাত্র আপনাদের আলোচনাটা বন্ধ হয়ে গেল।

বাসু র-কফিতে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, নিন্দে-মন্দ নয় গো, ডাক্তার এতক্ষণ তোমার প্রশংসা করছিল। তা তোমার সামনেই তোমার প্রশংসা করলে তোমার পায়া ভারী হয়ে যাবে, তাই ও মাঝপথে থেমে পড়েছে।

—প্রশংসা ! ফুঃ ! স্যার শুধু একটি নার্স-এরই প্রশংসা করতেন, কিন্তু সে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। আপনার মক্কেল !

বাসু কথাটা ঘোরাবার জন্য বলেন, তুমি কোথায় থাকো গো, জবা ?

—বেলঘরিয়ায়।

—ডেলি-প্যাসেঞ্জারি কর ?

—উপায় কী ?

—তোমার বাড়িতে আর কে আছে ?

—মন্না। আমার পাঁচ বছরের বাচ্চা মেয়ে, ননদ আর শাশুড়ি।

ওঁকে ইতস্তত করতে দেখে জবা আরও বলে, মন্নার বাবা এখন দিল্লিতে পোস্টেড।

ঠিক ওই সময় বাইরে থেকে কে যেন কলবেল বাজালো।

জবা তার কাপটা নামিয়ে রেখে পর্দা সরিয়ে কক্ষান্তরে চলে গেল, সদর খুলতে। ঠিক বোঝা গেল না, মনে হল সদর দরজার কাছে একটা চেঁচামেচি গোলমাল। জবার কণ্ঠস্বর শোনা গেল : কী পেয়েছেন আপনারা ? জোর করে ভিতরে ঢুকছেন কোন্ সাহসে ?

কথাটা তার শেষ হল না। পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল শার্ট-প্যাণ্ট পরা দু-জন লোক। তার পিছন-পিছন জবা। দর্শনমাত্র বাসুসাহেব চিনতে পারেন ওদের—যাকে বলে 'শাদা-পোশাকী পুলিস গোয়েন্দা'। দু-জনেই মুখচেনা।

তৎক্ষণাৎ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান বাসু। জবাকে বলেন, ওঁদের বাধা দিও না, জবা। শাদা পোশাকে আছেন বটে, তবে ওঁরা পুলিস। লালবাজার হোমিসাইড সেকশনের।

লোক দুটি বিরক্ত হয়। বোধকরি তারা এত শীঘ্র নিজেদের পরিচয় দিতে চাইছিল না। দর্শনার্থীদের ভেক ধরে কিছু জেনে নেবার ইচ্ছে ছিল ওদের।

বাসু ডাক্তারের দিকে ফিরে বললেন, ঠিক আছে ডাক্তার! ব্লাড-টেস্ট করিয়ে রিপোর্টটা নিয়ে আসব কাল-পরশুর মধ্যেই। তুমি ফি নিলে না—আমি পীড়াপীড়ি করব না, বরং বলব ওকালতি পরামর্শের প্রয়োজন হলে অসংকোচে ফোন কর। একটা কথা এখনই বরং বলে যাই—এই দুজন লাল-বাজারি ভদ্রলোকের কোনো প্রশ্নের জবাব না দেবার সাংবিধানিক অধিকার তোমার আছে…

—ব্যস! ব্যস! ব্যস! যথেষ্ট হয়েছে। এবার আপনি আসুন বাসু-সাহেব!

দু-জন এসে দাঁড়ায় বাসুসাহেবের দু-পাশে।

বাসুসাহেবের চোখ দুটো ধ্বক করে একবার জ্বলে উঠল। তিনি পকেট থেকে নামাঙ্কিত একটি কার্ড বার করে টেবিলের উপর রেখে বললেন, এঁরা দু-জন কেন এসেছেন তা আমি জানি না। আন্দাজ করতে পারি। সম্ভবত তোমাকে লালবাজারে নিমন্ত্রণ জানাতে। আমার টেলিফোন নাম্বারটা তোমার মানিব্যাগে ভরে রাখ। প্রয়োজনে আমাকে ফোন কর।

একজন বলে ওঠে, আপনাকে উনি ফোন করবেন কেমন করে, স্যার? যে কেস-এ ওঁকে নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছি সে কেস-এ আপনি তো আপনার ঘোড়া

আগেই ধরে বসে আছেন। এক মার্ডার কেস-এ তো দু-জন মক্কেল নেওয়া চলে না। দু-জনের ইণ্টারেস্ট ক্ল্যাশ করতে পারে। পারে না ?

বাসু ওর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ডাক্তারকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম ডাক্তার, তাহলে ওদের একটা প্রশ্নেরও জবাব দিতাম না। আচ্ছা চলি। গুড লাক টু এভরি বডি।

• • •

আলিপুর আদালতে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাণ্ড সেশানস জাজ প্রণব মুখার্জি তাঁর চেম্বার থেকে আদালতে ঢুকে নিজের আসনে বসতে গিয়ে হঠাৎ থমকে গেলেন। চশমার উপর দিয়ে আদালত-কক্ষের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কোর্ট-পেশকারকে প্রশ্ন করেন, কী ব্যাপার ? এখন তো সেই 'অ্যানালমেণ্ট' কেসটা হবার কথা ?

পেশকার সসম্ভ্রমে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর। 'দ্যা কেস অব্ রাও ভার্সেস রাও' অর্থাৎ ছন্দা দেবী বনাম ত্রিদিবনারায়ণ।

—হুঁ। কিন্তু আদালতে এত লোক কেন তাহলে ?

বিচারকের ডানদিকে দর্শকের আসনে বসেছিলেন পাব্লিক প্রসিকিউটার নিরঞ্জন মাইতি। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এঁদের কিছু লোক বাদী অথবা প্রতিবাদীর আত্মীয়-বন্ধু, কিছু আলিপুর আদালতের উকিল এবং কিছু সাংবাদিক। বাদী বা প্রতিবাদীর তরফে কোনো আপত্তি না থাকায় এঁরা কেসটা শুনতে এসেছেন। সবাই আশা করছেন, এটা একটা উল্লেখযোগ্য মামলা হিসাবে রেকর্ডেড হয়ে থাকবে। তাই সকলে উৎসাহী।

জজসাহেব জানতে চান, আপনি কি বাদীপক্ষের অ্যাটর্নি ?

—আজ্ঞে না, হুজুর। বাদীপক্ষের অ্যাটর্নি অ্যাডভোকেট গোপালচন্দ্র রায়—এই ইনি। আমিও দর্শকমাত্র। বাদী একটি হত্যা-মামলার সাক্ষী এবং প্রতিবাদী ওই মামলারই আসামি। তাই স্টেটের স্বার্থ দেখতে আমি উপস্থিত আছি।

বিচারক এবার তাঁর টেবিলে দাখিল করা ফাইলটা তুলে নিয়ে পড়লেন, 'দ্য কেস অব রাও ভার্সেস রাও।' বাদী শ্রীত্রিদিবনারায়ণ রাও সান অব ত্রিবিক্রম নারায়ণ রাও অব নাসিক। তাঁর পক্ষে আছেন অ্যাডভোকেট শ্রীগোপাল চন্দ্র রায়।

বাদীপক্ষের গাউনপরা একজন উকিল উঠে দাঁড়ালেন। মুখেও বললেন, ইয়েস, য়োর অনার।

প্রতিবাদী শ্রীমতী ছন্দা রাও, 'নো' বিশ্বাস—এঁর তরফে কাউন্সেল আছেন শ্রী পি কে বাসু বার-এট-ল।

প্রতিবাদীর তরফে বাসু-সাহেব হাত তুলে আত্মঘোষণা করলেন।

বিচারক জানতে চাইলেন, আপনাদের দু-জনের মধ্যে কারও এমন দাবী নেই যে, আদালত-কক্ষে দর্শক বা প্রেসের লোক থাকবে না ?

গোপালচন্দ্র একটি 'বাও' করে বললেন, বাদীর তরফে নেই হুজুর।

আমরা মনে করি, হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্টে কী কী প্রভিশন্স আছে, কীভাবে তার প্রয়োগ হয়, তা জনসাধারণের জানা বাঞ্ছনীয়। ঘটনাচক্রে এক্ষেত্রে বাদী একজন ধনকুবেরের একমাত্র ওয়ারিশ এবং প্রতিবাদী একটি হত্যা মামলার বিচারাধীন আসামি। তাই এ বিষয়ে সাধারণের যথেষ্ট কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে। আমরা তা প্রশমিত করতে চাই না।

পি. কে. বাসুর দিকে ফিরে বিচারক বললেন, আপনার কী অভিমত?

বাসু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি সহযোগীর সঙ্গে একমত। ঘটনাচক্রে বাদীর পিতা ধনকুবের শ্রীত্রিবিক্রম নারায়ণ রাও স্বয়ং পুত্র ও পুত্রবধূর বিবাহ নাকচের মামলায় উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর প্রাসাদ থেকে পুত্রবধূকে বিতাড়ন করতে! প্রতিবাদী আইনসঙ্গত অধিকার বলে তাঁর শ্বশুরমশাইকে সে-অপরাধে আদালতকক্ষ থেকে বিতাড়ন করতে চান না।

ত্রিবিক্রমের কর্ণমূল রক্তাক্ত হয়ে উঠল। তিনি পাথরের মূর্তির মতো বসেই রইলেন।

বিচারক বললেন, অল রাইট। কিন্তু প্রেসের তরফে যাঁরা এসেছেন তাঁদের আমি আগেভাগেই জানিয়ে রাখছি, আদালতের ভিতর তাঁরা যেন কোনো ফটো না তোলেন।

বিচারকের নির্দেশে আদালতকক্ষের দু-পাশের দু-টি দরজা খুলে গেল। বাদী ও প্রতিবাদী প্রহরাধীন অবস্থায় আদালতে প্রবেশ করলেন। ঘটনার রাত্রিপ্রভাতে ছন্দা ঘুম ভেঙে উঠে দেখেছিল তার শয্যার বাকি আধখানা খালি। তারপর থেকে দু-জনের আর সাক্ষাৎ হয়নি। ছন্দা তাই নিজের অজান্তেই অস্ফুট একটা শব্দ উচ্চারণ করে দ্রুত পায়ে ত্রিদিবের দিকে এগিয়ে যেতে চাইল। আদালত-কক্ষে একজন মহিলা-আরক্ষা কর্মী তার গমনপথে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে তাকে রুখল।

ত্রিদিব স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র করেনি। মাথা সোজা রেখে সে ধীরপদে এগিয়ে গেল তার জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারটার দিকে। বোধকরি ঘটনাচক্রেই সেই চেয়ারটি খালি রাখা ছিল তার স্বনামধন্য পিতৃদেবের পাশেই।

ছন্দা শুধু হতাশ নয়, কিছুটা অপমানিত বোধ করল। ধীরপদে সে এসে বসল বাসুসাহেবের পাশে খালি চেয়ারে।

বিচারক আদালতের নীরবতা ভঙ্গ করে ঘোষণা করলেন, বাদী এবং প্রতিবাদী দু-জনেই এতক্ষণ ছিলেন পুলিসের হেপাজতে। প্রতিবাদী একটি হত্যা মামলার জামিন-প্রত্যাখ্যাত আসামি হিসাবে এবং বাদী ওই মামলার একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হিসাবে। আদালতের সম্মুখে যে বিচার্য মামলাটি রয়েছে দেখা যাচ্ছে বাদীর সেই আবেদনপত্রটি পাব্‌লিক প্রসিকিউ-টারের দপ্তর ঘুরে এসেছে। তাতে একটি নোটও আছে। বিচার্য মামলাটি একটি রেজিস্ট্রি করা বিবাহ 'অ্যানাল' বা নাকচ করা সংক্রান্ত। আবেদনপত্রে অভিযোগ করা হয়েছে যে, বিবাহকালে প্রতিবাদীর স্বামী জীবিত ছিলেন এবং সে কারণে ত্রিদিবনারায়ণ ও ছন্দাদেবীর বিবাহটা অসিদ্ধ। আমরা

বর্তমানে এই তথ্যটি শুধু যাচাই করে রায় দেব। তার বাইরে কোনো কিছু আলোচনা করা চলবে না। আমি আরও স্পষ্ট ভাষায় পূর্বেই দু-পক্ষকে জানিয়ে রাখতে চাই যে, দুই পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষীদের জেরা করতে গিয়ে ওই হত্যা মামলা সংক্রান্ত কোনো তথ্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা আদালত অনুমোদন করবে না। আশা করি আমার বক্তব্যটা দু-পক্ষই প্রণিধান করেছেন।

ত্রিবিক্রম পাথরের মূর্তির মতো নিস্পন্দ বসে রইলেন; কিন্তু নিরঞ্জন মাইতি স্পষ্টতই খুশি হয়ে বলে বসলেন, হ্যাঁ, হুজুর!

বাসু কোনো জবাব দিলেন না। নীরবে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

আদালতে উপস্থিত প্রতিটি আইনজীবী বুঝতে পারলেন যে, মামলা শুরু হবার আগেই প্রতিবাদীপক্ষ হারতে শুরু করেছে। বিচারক ক্রস-এগজামিনেশন করার অধিকার কেড়ে নিয়ে শুধু বাসুসাহেবকেই বঞ্চিত করলেন; কারণ ছন্দাকে বাদীপক্ষের উকিল কোনো মারাত্মক প্রশ্ন করলে বাসুসাহেব অনায়াসে বলতে পারেন যে, সে জবাব দেবে না; কারণ জবাব দিলে সে নিজেকেই 'ইন্‌ক্রিমিনেট' করবে—হত্যা-মামলায় স্বীকৃতি হিসাবে সে জবাব গৃহীত হবার আশঙ্কা আছে। অপরপক্ষে বাদী পক্ষের উকিলের সে সুযোগ ছিল না। সেই সুযোগটুকুই বিচারকের নির্দেশে এখন লাভ করলেন গোপালবাবু।

অ্যাডভোকেট গোপালচন্দ্র রায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বাদীপক্ষের প্রথম সাক্ষী; শ্রীত্রিদিবনারায়ণ রাও।

ত্রিদিব তার বাবার দিকে তাকাল। ত্রিবিক্রম ওর পিঠে একটা হাত রাখলেন। ত্রিদিব উঠে দাঁড়াল। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে এল। শপথবাক্য পাঠ করার সময় তার অশান্ত চুলের গোছাটা নেমে এল বাঁ-চোখের উপর। ত্রিদিব হাত দিয়ে সেটা সরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

—আপনার নাম শ্রীত্রিদিবনারায়ণ রাও?

—ইয়েস।

—আপনি আলিপুরের বাসিন্দা? কলকাতায় থাকেন?

—ইয়েস।

—প্রতিবাদী ওই শ্রীমতী ছন্দা রাওকে আপনি চেনেন?

—চিনি।

—ওঁকে প্রথম কোথায় দেখেন?

—বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে সানি-সাইড নার্সিং-হোমে। ওঁকে আমি নাইট-নার্স হিসাবে নিয়োগ করেছিলাম।

—পরে, মানে নার্সিং-হোম থেকে বাড়ি ফেরার পরে, ওই ছন্দাদেবীকে আপনি রেজিস্ট্রি-মতে বিয়ে করেন, এ কথা সত্যি?

—সত্যি।

—তারিখটা মনে আছে আপনার?

—আছে। পনেরোই জুন।

—বর্তমান বছরে? এই একানব্বই সালে?

—ইয়েস।

গোপালচন্দ্র বিচারকের দিকে ফিরে বললেন, আমার সওয়াল শেষ হয়ে গেছে হুজুর!

নাটকীয়ভাবে বাসুসাহেবের দিকে ফিরে বললেন, য়োর উইটনেস্।

বাসু হাসি হাসি মুখে বললেন: নো কোশ্চেনস্।

গোপালচন্দ্র বসে পড়েছিলেন। পুনরায় উঠে দাঁড়ালেন। সবিস্ময়ে বললেন, মানে? আপনি ক্রস করতে চান না?

বিচারক ত্রিদিবের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি নেমে আসুন।

গোপালচন্দ্র এবং ত্রিদিব দু-জনেই বিস্মিত। ওঁরা কেউই এটা প্রত্যাশা করেননি। বাসুসাহেবের জোরালো সওয়ালের জবাব কীভাবে দিতে হবে তার অনেক তালিম নিতে হয়েছিল ত্রিদিবকে। দেখা গেল, বৃথাই। দর্শকদের মধ্যেও বিস্ময়ের অনুভূতিটা সংক্রামিত হয়েছে মনে হল! কিছুটা হতাশাও। ফিস্-ফিস্ গুজ-গুজ শুরু হতেই বিচারক তাঁর কাঠের হাতুড়িটা ঠুকলেন। আদালতে নিস্তব্ধতা ফিরে এল।

গোপালচন্দ্র বললেন, য়োর অনার! এবার আমি প্রতিবাদীকে সাক্ষীর মঞ্চে উঠে দাঁড়াতে অনুরোধ করব। কিন্তু তার পূর্বে আমি নিবেদন করতে চাই যে, 'আন্ডার দ্য কোড অব সিবিল প্রসিডিওর' আমি প্রতিবাদীকে 'অ্যাডভার্স পার্টি' হিসাবে ধরে নিয়ে সওয়াল করব। এবং সেটা করব, প্রতিবাদীপক্ষের কাউন্সেল তাঁকে সাক্ষী হিসাবে কাঠগড়ায় তোলার পূর্বেই।

বিচারক বাসুসাহেবর দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

বাসু গোপালচন্দ্রকেই প্রশ্ন করলেন, প্রতিবাদীকে জেরা করে আপনি কী তথ্য প্রতিষ্ঠা করতে চান?

গোপালচন্দ্রের ভ্রূকুটি হল। বললেন, সে-কথা আমি আগে-ভাগে জানাতে বাধ্য নই। আমার স্ট্র্যাটেজি আমি সহযোগীকে আগেই জানিয়ে দেব কেন?

বাসু বললেন, আদালত যে নির্দেশ দিয়েছেন সেই অনুসারে আমি জানতে চাইছি—আপনি প্রতিবাদীকে জেরা করে কী তথ্য প্রতিষ্ঠা করতে চান? সেটা জানলে, আমরা হয়তো তা 'স্টিপুলেট' করতে পারি।

—পারেন। আবার নাও পারেন? আমি কী প্রতিষ্ঠা করতে চাই তা আগেভাগে জেনে নিয়ে আপনি এ-কথাও বলতে পারেন যে, আপনি তা 'স্টিপুলেট' করছেন না। মেনে নিচ্ছেন না। তখন? 'আন্ডার দ্য কোড অব সিবিল প্রসিডিওর' আমি আমার অধিকার সম্বন্ধে রুলিং চাইছি।

বিচারক বাসু-সাহেবের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, প্রতিবাদীকে সাক্ষীর মঞ্চে ওঠানোতে আপনার আপত্তি আছে, কাউন্সেল?

বাসু বলেন, নো, ইয়োর অনার! আমি শুধু আদালতের সময় বাঁচাতে চাইছি। সহযোগী তাঁর অধিকারের প্রশ্ন তুলেছেন—'আন্ডার দ্য কোড অব্

সিবিল প্রসিডিওর'। আমি জানতে চাই : প্রতিবাদীর কাউন্সেল হিসাবে আমার অধিকার আছে কিনা আমার মক্কেলকে নির্দেশ দেবার যে, সহযোগীর প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে সে বলবে : 'এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না, কারণ তাহলে পরবর্তী হত্যা-মামলায় আমি নিজেকেই 'ইনক্রিমিনেট' করব!' এমন কী সহযোগী যদি তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করেন, তার হাতঘড়িতে কটা বাজে তা জানতে চান ? তাহলেও ? সো হোয়াট ? আমিও আদালতের রুলিং চাইছি। 'আন্ডার দ্য কোড অব সিবিল প্রসিডিওর' আমার কি সে অধিকার নেই ?

বিচারক চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লেন।

গোপালচন্দ্র নিরুপায় ভাবে বললেন, অল রাইট! আমি বলছি, প্রতিবাদীকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় তুলে কী তথ্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইছি। এক-নম্বর : আপনি কি মেনে নেবেন যে, এ বছর পনেরোই জুন বিবাহের পূর্বে যখন প্রতিবাদী ছন্দা বিশ্বাস ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের খাতায় সই করেন তখন তাঁর পূর্বতন স্বামী জীবিত ছিল ? সেই পূর্বতন স্বামীর নাম কমলেশ বিশ্বাস, ওরফে কমলাক্ষ কর, ওরফে কমলচন্দ্র ঘোষ ? যে লোকটি এ বছর বাইশে জুন তারাতলার মা-সন্তোষী অ্যাপার্টমেন্ট-এ মধ্যরাতে হত হয়েছে ?

—হ্যাঁ, আমরা মেনে নিচ্ছি।

গোপালচন্দ্র যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। বিচারকের কপালে একটা ভ্রুকুটি-চিহ্ন ফুটে উঠল। তিনি উভয়ের দিকে একবার করে দেখে নিয়ে নীরবে রুমাল দিয়ে চশমার কাঁচটা মুছতে শুরু করলেন।

হঠাৎ গোপালচন্দ্র আবার বাঙ্ময় হয়ে ওঠেন :

আমি প্রতিবাদীকে আরও একটি বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাই : পাম অ্যাভেন্যু যেখানে বন্ডেল রোডে পড়েছে তারই কাছাকাছি সানি-সাইড নার্সিং-হোমে উনি নার্স হিসাবে চাকরি করতেন কি না ?

—হ্যাঁ, আমরা মেনে নিচ্ছি। করতেন।

—এবং ওই নার্সিং-হোমে, তিন বছর আগে সাতাশে মার্চ উনিশশো অষ্টআশি সালে একজন রুগি লাং ক্যানসারে ভুগে মারা যায়, যার নাম কমলেশ বিশ্বাস—আমি প্রতিবাদীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, তিনি ওই কমলেশ বিশ্বাসকে চেনেন কি না ?

বাসু বললেন, আপনার পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তরে আমরা স্টিপুলেট করেছি যে, এ বছর পনেরোই জুন প্রতিবাদী ছন্দা বিশ্বাস যখন ত্রিদিব রাওকে বিবাহ করে তখন ছন্দার পূর্ববর্তী স্বামী কমলেশ বিশ্বাস জীবিত ছিল। সেই 'স্টিপুলেশন' মোতাবেক তিন বছর আগে অন্য কোথাও ওই একই নামের আর একজন লোক লাং ক্যানসারে মারা গিয়েছিল কী না, সেটা বর্তমান মামলার পক্ষে ইম্‌মেটিরিয়াল, ইর্‌রেলিভেন্ট! আই অবজেক্ট!

বিচারক রায় দিলেন : অবজেকশান ইজ সাসটেইন্ড। প্রসিড্‌!

গোপালচন্দ্র বললেন, তাহলে আমার আর কোনো বক্তব্য নেই।

বাসু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, প্রতিবাদী পক্ষের প্রথম সাক্ষী শ্রীমতী

অনসূয়া কর।

নকিবের ব্যবস্থাপনায় নামটা ঘোষিত হল। পাশের ঘর থেকে একটি মেয়ে—বছর ত্রিশ-বত্রিশ বয়স তার—সাক্ষীর মঞ্চে উঠে দাঁড়িয়ে শপথ নিল।

—তোমার নাম অনসূয়া কর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তুমি কুমারী, বিবাহিতা না বিধবা?

—আমি বিধবা।

—তোমার স্বামী কত তারিখে মারা গেছেন?

—এ বছর বাইশে জুন।

—কোথায়?

—তারাতলায়। মা-সন্তোষী অ্যাপার্টমেন্টের মেজানাইন ঘরে।

—তার নাম কমলেশ বিশ্বাস?

—আমি জানতাম তাঁর নাম কমলাক্ষ কর। খবরের কাগজে তাঁর মৃত্যুর খবর পড়ে আমার দিদির সঙ্গে কমলেশ বিশ্বাসের 'ইনকোয়েস্ট'-এর সময় আমি দেখতে গিয়েছিলাম। তাঁকে তখন চিনতে পারি। তাই আমি জানি, কমলেশ বিশ্বাস আর কমলাক্ষ কর একই ব্যক্তি।

—তুমি নিঃসন্দেহ যে, তোমার স্বামী কমলাক্ষ কর এবং মা-সন্তোষী অ্যাপার্টমেন্টে নিহত কমলেশ বিশ্বাস একই ব্যক্তি?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—তুমি তাঁকে কি হিন্দু-মতে বিবাহ করেছিলে, না রেজিস্ট্রি ম্যারেজ?

—রেজিস্ট্রি ম্যারেজ।

—কত তারিখে?

—পাঁচ সেপ্টেম্বর উনআশি সালে।

—তুমি কি তোমার রেজিস্ট্রি-বিবাহের সার্টিফিকেটের একটি জেরক্স কপি এবং তোমাদের যুগলে তোলা ছবি নিয়ে এসেছ? এনে থাকলে আমাকে দাও।

মেয়েটি একটি সার্টিফিকেট এবং একটি ফটো বাসু-সাহেবকে দেয়।

বাসু সে-দুটি গোপালচন্দ্রকে দেখতে দিলেন। বললেন, প্রতিবাদী তরফের এক্‌জিবিট হিসাবে এ দুটি আদালতে দাখিল করতে চাই।

গোপালচন্দ্র তড়াক করে উঠে দাঁড়ান। বলেন, ইয়োর অনার! আমি এই সাক্ষীর জবানবন্দী আদ্যোপান্ত নাকচ করার আর্জি জানাচ্ছি। প্রশ্নোত্তরের সবটাই 'ইনকম্পিটেন্ট, ইর্‌রেলিভেন্ট অ্যান্ড ইম্‌মেটিরিয়াল'—অপ্রাসঙ্গিক এবং প্রক্ষিপ্ত। কমলাক্ষ কর আর কমলেশ বিশ্বাস একই লোক কী না প্রমাণ হয়নি। আর হলেই বা কী? লোকটা বিবাহ-বিশারদ ছিল—এমন কথা সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে। হয়তো এমন বিয়ে সে আরও পাঁচটা করেছে। তাতে কী? প্রতিবাদী তাঁর প্রথম পক্ষের স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারতেন। তা তিনি করেননি।

বিচারক বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলেন, আপনি কি কিছু বলবেন?

বাসু একটি বাও করে বললেন, ইয়োর অনার। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে 'হংস যা ভক্ষণ করে তা হংসীও খেতে পারে।' আমার মনে হয় ওর কন্‌ভার্সটাও ট্রু। অর্থাৎ 'হংসী যা ভক্ষণ করতে পারে, হংসও তা পারে।' অর্থাৎ যে কারণে বিচক্ষণ সহযোগী ছন্দার সঙ্গে ত্রিদিবের বিবাহটা নাকচ করতে চাইছেন সেই হেতুটাই ওঁরই যুক্তি-মোতাবক নাকচ হয়ে যাচ্ছে। সহজ ভাষায়: কমলেশ বিশ্বাস যখন ছন্দাকে বিবাহ করে তখন কমলেশের পূর্বতন পত্নী অনসূয়া দেবী জীবিতা। সুতরাং আণ্ডার দ্য স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট নং ফর্টি-থ্রি অব নাইন্টিন সিক্সটি-ফোর, আণ্ডার সেকশান ফোর, ছন্দার সঙ্গে কমলেশের রেজিস্ট্রি বিবাহ অসিদ্ধ। তার ফলে, ছন্দা, যখন ত্রিদিবকে বিবাহ করে তখন আইন মোতাবেক ছন্দার কোনো পূর্বতন স্বামী ছিল না। সে ছিল কুমারী। অর্থাৎ ত্রিদিব এবং ছন্দার বিবাহ সে-কারণে নাকচ করা যায় না।

নিরঞ্জন মাইতি এই সময় বলে ওঠেন, কিন্তু কমলাক্ষ কর আর কমলেশ বিশ্বাস যে একই লোক তা-তো প্রমাণ হয়নি।

বাসু বলেন, অ-প্রমাণ করার দায় বাদীপক্ষের। যতদিন তা অ-প্রমাণ করতে না পারছেন ততদিন ওই অজুহাতে ছন্দা ও ত্রিদিবের রেজিস্ট্রি-বিবাহ নাকচ করা যায় না। অন্তত ততদিন ওরা বৈধ স্বামী-স্ত্রী।

বিচারক দু-পক্ষের উকিলকে প্রশ্ন করলেন, তাঁদের আর কারও বক্তব্য আছে কি না। দু-জনেই জানালেন, না, নেই।

এবার বিচারক স্বয়ং সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন, তোমাকে এবার আমিই দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, মা। প্রথমে বলতো, তুমি ওই কমলেশ বিশ্বাসের ইন্‌কোয়েস্টে কেন গেছিলে? তুমি তো কমলেশ বিশ্বাসের নামও জানতে না।

অনসূয়া বলল, না হুজুর, জানতাম। ওই ছন্দা দেবী যখন কমলেশ বিশ্বাসের সঙ্গে বেলেঘাটার বস্তিতে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বাস করতেন, তখন আমার দিদি সেখানে খোঁজ নিতে গেছিলেন। তিনি আমার স্বামী কমলাক্ষ করের ফটো ওই প্রতিবাদী ছন্দা বিশ্বাসকে দেখান এবং ছন্দা দেবী চিনতে পারেন। বুঝতে পারেন যে, আমরা দু-জন একই লোকের স্ত্রী। তাই হুজুর, আমি খবরের কাগজে কমলেশ বিশ্বাসের নাম দেখে তাঁকে চিনতে পারি।

—কিন্তু স্বচক্ষে মৃতদেহ দেখতে যাবার মূল প্রেরণাটা কী?

অনসূয়া বিচারকের চোখে-চোখ রেখে অকপটে বলল, আমি জানতে গেছিলাম যে, দ্বিতীয়বার বিবাহ করার অধিকার আমার এতদিন বর্তেছে কি না। আমার স্বামী আমার গহনা চুরি করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিল।

—তুমি তাহলে নিঃসন্দেহ যে, ওই মৃত ব্যক্তি আর তোমার স্বামী একই লোক?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, য়োর অনার।

—এবার তুমি মঞ্চ থেকে নেমে এস, মা। হয়তো বর্তমান মামলার পক্ষে

এটা অপ্রাসঙ্গিক হচ্ছে, তবু আমি খুশি মনে তোমাকে আশীর্বাদ করছি—তোমার এই দ্বিতীয়বারের বিবাহ সুখের হোক।

অনসূয়া সাক্ষীর মঞ্চের রেলিঙে মাথাটা ঠেকালো প্রণামের ভঙ্গিতে।

বিচারক কোর্ট-পেশকারের দিকে ফিরে বললেন, লিখে নাও: জাজমেণ্ট! বাদীর দাবি নাকচ করা হল। কোর্ট ইজ্ অ্যাডজর্নড।

বিচারক উঠে দাঁড়ালেন। সবাই উঠে দাঁড়ায়। বিচারক কক্ষ ত্যাগ করেন। ছন্দা হঠাৎ এগিয়ে যায় ত্রিদিবের দিকে। মহিলা-পুলিস ওর বাহুমূল ধরে ফেলে। ছন্দা তাকে ধমকে ওঠে, আমি পালিয়ে যাচ্ছি না। ছাড়ুন! শুনলেন না—ওই ভদ্রলোক আমার স্বামী?

ত্রিবিক্রমনারায়ণ দৃঢ় মুষ্টিতে পুত্রের বাহুমূল ধরে ছিলেন। তাকে আকর্ষণ করে বললেন, চলে এস।

ছন্দা তাঁকেও ধমকে উঠল: ওয়েট! আপনি কী রকম ভদ্রলোক মিস্টার রাও? এটিকেট জানেন না? পুত্র ও পুত্রবধূর মধ্যে যখন জনান্তিক আলাপ হয় তখন সেখানে শ্বশুরকে থাকতে নেই—এটা আপনাদের 'শক্তাবৎ খানদানে' কেউ শেখায়নি?

ত্রিবিক্রমনারায়ণ বজ্রাহত হয়ে গেলেন। একটি পাব্লিক প্লেসে কোনো একজন মরমানুষ যে তাঁকে এভাবে প্রকাশ্যে অপমান করতে পারে তা ছিল তাঁর দুঃস্বপ্নের বাইরে। তবু ধুরন্ধর ব্যবসায়ী মুহূর্তে সামলে নিলেন নিজেকে। বললেন, তুমি যে এখনও খুনের মামলায় জামিন-না-পাওয়া আসামী, বউমা! এই সময় সর্বসমক্ষে স্বামী-সম্ভাষণের অধিকার থাকে না। যাও মা, হাজতে যাও!

জবাবে ছন্দা কী-যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার পূর্বেই ত্রিদিব বলে উঠল, তাছাড়া শক্তাবৎ রাজবংশে কেউ কখনও দ্বি-চারিণী স্ত্রীর সঙ্গে বাক্যালাপ করে না। চল, ড্যাডি!

এবার বজ্রাহত হবার পালা ছন্দার।

সে শুধু অস্ফুটে বললে: কী বললে? দ্বি-চারিণী?

ত্রিদিব জবাব দিল না। এবার সেই আকর্ষণ করল তার বাবাকে। ওরা সবাই ততক্ষণে আদালত কক্ষ থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে। আর তৎক্ষণাৎ দু-তিনটে ক্যামেরা বিদ্যুৎচমকে এই দাম্পত্য-কলহের ক্ষণিক উন্মাদনাকে শাশ্বত করে ধরে রাখল।

মহিলা-পুলিস ছন্দার বাহুমূলে ধরে এগিয়ে চলল পুলিস-ভ্যানটার দিকে। গাড়িতে উঠতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো ছন্দা। বলল, কই, উনি কোথায়?

—কে?

—আমার কাউন্সেলার? মিস্টার পি. কে. বাসু?

বাসু-সাহেব এগিয়ে এসে বললেন, এখানে কোনো কথা নয়, ছন্দা। আমি হাজতে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করব।

।। চৌদ্দ ।।



আদালত থেকে ফিরে এসে সান্ধ্য চায়ের আসরে বাসু সাহেব তাঁর স্ত্রীকে শোনাচ্ছিলেন সেদিন কোর্টে কেসটা কী ভাবে মোড় নিল।

সুজাতা বলে, একটা কথা, মামু। আইনের প্যাঁচে আপনি ছন্দার সঙ্গে ত্রিদিবনারায়ণের বিয়েটা নাকচ হতে দিলেন না। কিন্তু ত্রিবিক্রম কি কোনদিন ওকে পুত্রবধূ বলে স্বীকার করে নেবেন ?

বাসু বলেন, খুব সম্ভবত, না। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা ত্রিদিবের অ্যাটিচুড: আমি কাল জেল-হাজতে যাব। ছন্দাকে দিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ দরখাস্তে সই করিয়ে আনব। ছন্দা 'হেভি ড্যামেজ' আর 'অ্যালিমানি' দাবী করবে। দশ লক্ষ টাকার।

—দশ লক্ষ !. কী হেতু দেখাবে ?

—নিষ্ঠুরতা। ত্রিদিব চরম বিপদের সময় স্ত্রীকে শুধু ফেলে পালিয়েই যায়নি। পুলিসের কাছে গিয়ে মিথ্যে এজাহার দিয়েছে। খবরের কাগজে তার স্টেটমেন্ট ছাপানো হয়েছে। তাছাড়া আজ প্রকাশ্য-আদালত প্রাঙ্গণে স্ত্রীকে ব্যভিচারিণী বলে ভর্ৎসনা করেছে। সে কারণেই বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং খেশারদ।

রানু বললেন, আমার ধারণা: ত্রিবিক্রম দশ লক্ষ টাকার চেক লিখে দিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদটা এক কথায় মেনে নেবেন। কারণ ছয় মাসের মধ্যেই নিজের সমাজের কোন এক কোটিপতির মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবেন। দশ লাখ টাকার উপর 'সুদ'টুকু কষে দহেজ দাবী করবেন। আদায়ও করবেন।

বাসু বললেন, আমি রানুর সঙ্গে একমত। দহেজ হিসাবে দশলাখ টাকা আদায় করতে পারুক-না-পারুক ছন্দার মতো একটি মেয়েকে তার 'হাবেলি'তে সে কিছুতেই ঢুকতে দেবে না। ছন্দা যে কী পরিমাণ বিপদজনক তা ত্রিবিক্রম বুঝেছে। মাত্র সাতদিনে সে ত্রিদিবকে বাবার দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে বার করে এনেছিল।

কৌশিক বলে, কোথায় ? নিজের চোখেই তো আদালতে দেখলেন, সে স্ত্রীকে ত্যাগ করে বাবার বগলের তলায় ফিরে গেল…

—সেটাই একমাত্র সত্য নয়, কৌশিক। এ-কথা তুমি অস্বীকার করতে পার না যে, ছন্দার প্রভাবে ত্রিদিব বাবাকে না জানিয়ে একজন সাধারণ নার্সকে রেজিস্ট্রি-বিয়ে করেছিল। হয়তো জীবনে প্রথম সে এ-ভাবে বাবার বিরুদ্ধে রুখে ওঠে। বিদ্রোহী হবার হিম্মৎ হয় তার।

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। রানু ধরলেন, ফোন করছেন ডক্টর

ব্যানার্জি। রিসিভারটা স্ত্রীর হাত থেকে নিয়ে বাসু বললেন, কী ব্যাপার ? তোমার না আজ সকালে কলকাতার বাইরে যাবার কথা ? কোথায় যেন টিকিট কেটেছ, হোটেল রিজার্ভ করেছ…

—সব ভেস্তে গেছে, স্যার! কাল লালবাজারে আমাকে ওরা পেড়ে ফেলবার নানান চেষ্টা করে। আমি কিছুই স্বীকার করিনি। মানে, শনিবার রাত্রের…

—থাক, থাক। তোমার টেলিফোনটা 'বাগ্‌ড' হয়ে থাকতে পারে!

—বুঝেছি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে লালবাজার থেকে আমার উপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোন প্রয়োজনে কলকাতার বাইরে গেলে আমার ঠিকানা যেন নার্সিংহোমে রেখে যাই। এবং ঠিকানা বদলালে তা যেন আমার কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল নার্সকে টেলিফোনে বারে-বারে জানাই। এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে কিছু পরামর্শ করতে চাই। মানে সামনা-সামনি বসে। টেলিফোনে নয়। কখন আসব ?

বাসু বললেন, এ বিষয়ে আলোচনার কিছু নেই, ডাক্তার। তোমার মতো বিখ্যাত ডাক্তারের পক্ষে তোমার গতিবিধি নার্সিংহোম-এর কন্‌ফিডেনশিয়াল নার্সের জানা থাকা আবশ্যিক। তারপর এ বিষয়ে যদি লালবাজার থেকে বিশেষ নির্দেশ এসে থাকে তবে আর আলোচনার কী আছে ? তুমি কলকাতার বাইরে যাচ্ছিলে স্বাস্থ্যের কারণে। ফলে আমার সঙ্গে পরামর্শের কিছু নেই। তোমার ফিজিশিয়ানের সঙ্গে পরামর্শ কর।

টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন বাসু।

* * *

পরদিন দেখা করতে এল বটুক দত্ত। তারাতলার সেই পানওয়ালা। বাসু-সাহেব বললেন, তোমার আবার কী হল ?

—বিপদে না পড়লে কে আর ডাক্তার-উকিলের কাছে দরবার করতে আসে ? বলুন, স্যার ?

—বল ?

বটুক হাতদুটি জোড় করে গরুড়পক্ষীর ভঙ্গিতে বললে, আপনারে ট্যাকা-পয়সা দিতে পারব না হুজুর, তবে হ্যাঁ, উপ্‌গারের বদলে উপ্‌গার কিছু করতে পারি।

—আগে শুনি, তুমি কী কারণে আমার দ্বারস্থ হয়েছ, তারপর ওসব কথা হবে। সাধারণ মানুষ আইনের প্যাঁচে বিপদগ্রস্ত হলে আমি বিনা পারিশ্রমিকেও আইনের পরামর্শ দিয়ে থাকি। তুমি সংকোচ কর না। তুমি আমাকে পান খাওয়াওনি বটে, তার কারণ বাঁধানো দাঁতে পান আমি চিবুতে পারি না। নাও শুরু কর—

—আপনি তো নিজের চোখেই দেখেছেন হুজুর, আমার পরিবার বড় এক-বগ্‌গা। আমার শ্বশুর ভীমা কৈবর্ত-মশাই ছিলেন একজন ডাকসাইটে 'ইয়ে' আর কি। পাঁচ-গাঁয়ের মানুষ তেনারে একডাকে চিনত। সদু আর কিছু পাক-না-পাক বাপের সেই একরোখা জিদ্দিবাজিটা পেয়েছে।

—ভূমিকা তো হল, এবার আসল কথাটা বল ?

—পুলিশ-ইন্সপেক্টার-সাহেবকে আমরা যে জবানবন্দি সেদিন দিছিলাম, তার মধ্যে কিছু গড়বড় ছিল। মানে, আমাদের তিনজনের এজাহার তিন রকম হয়ে যাচ্ছে…

—তৃতীয়জন আবার কোত্থেকে এল ? সৌদামিনীর পেটের সেই বাচ্চাটা ?

—আজ্ঞে না হুজুর, সে তো মায়ের পেটে ঘুমুচ্ছে। সে শুনবে কেমন করে ?

—এমন কাণ্ডও হয়, বটুক। তুমি শোননি ? অভিমন্যু মায়ের পেটের ভিতর থেকেই চক্রব্যূহে ঢোকার পথটা চিনে নিয়েছিল।

—সে সব সত্য-ত্রেতা যুগে হত, স্যার। কলিযুগে হয় না। তিন নম্বর মনিষ্যি বলতে, দোতলার ডাক্তারবাবু—ডাক্তার নবীন দত্ত-সাহেব। তাঁরেও তো সে-রাত্রে ডেকে এনেছিলাম। তিনিও টর্চের আলোয় খোলা জানলা দিয়ে ও-বাড়ির ভিতরটা দেখেছিলেন। তাঁর টেলিফোনেই…

—হ্যাঁ, বুঝেছি। তা তোমাদের কী-বিষয়ে মত-পার্থক্যটা হচ্ছে ?

—আমাদের তিন জনের জবানবন্দিতে আর কোনও ফারাক নেই। ঝামেলা বাধছে মাত্র একটা বিষয়ে। ঐ কলিং-বেলটা নিয়ে…

—'কলিংবেল'টা ? মানে ?

—ডাক্তারবাবুর মতে ঐ একটানা শব্দটা রেল-ইঞ্জিনের হুইসিল।

—রেল-ইঞ্জিন তারাতলা রোডে কেমন করে আসবে ?

—আসে, হুজুর। রেল-ইঞ্জিন আসে না, তার বাঁশির শব্দ আসে। নিষুতি রাতে মাঝের-হাট ব্রিজের তলা দিয়ে যদি কোনও ইঞ্জিন একটানা হুইসিল বাজাতে-বাজাতে না থেমে চলে যায় তাহলে তার শব্দ আমাদের পাড়া থেকে শোনা যায়।

—বুঝলাম। ডাক্তারবাবুর মতে, ঘটনার সময়—মানে কমলেশ যখন খুন হচ্ছে, তখন বাইরে দাঁড়িয়ে কেউ 'কল বেল' বাজাচ্ছিল না—ঐ সময় মাঝের-হাট ব্রিজের তলা দিয়ে একটা এঞ্জিন হুইসিল বাজিয়ে চলে যাচ্ছিল। তা, তোমার ঘরওয়ালী কী বলছে ?

—তার মতে ঐ সময় পাশের বাড়িতে টেলিফোন বাজছিল—মানে ঐ কমলবাবুর ঘরেই।

—আর তোমার কী মনে আছে ?

—আমার স্পষ্ট মনে আছে হুজুর, ওটা কমলবাবুর বাড়ির কলিংবেলের শব্দ। প্রথম কথা, টেলিফোনের শব্দ কখনো একটানা বাজে না, থেমে-থেমে বাজে। আমার একার নয়, ডাক্তারবাবুরও স্পষ্ট মনে আছে শব্দটা ছিল একটানা। সদু—মানে আমার পরিবার, কিছুতেই মানবে না। মেয়েটা এমনিতেই একরোখা, জেদী, পোয়াতি হয়ে যেন মাথা কিনেছেন—জিদবাজি আরও বেড়ে গেছে।

—সদুর কথা থাক; কিন্তু তুমি আর ডাক্তারবাবু কেন একমত হতে

পারছ না ?

—ডাক্তারবাবু একটা কথা খেয়াল করছেন না। রেল ইঞ্জিনের শব্দে বেশ কিছুটা চন্দবিন্দুর ভেজাল থাকে···

—কী ভেজাল থাকে ?

—আজ্ঞে ঐ 'চন্দরবিন্দু' আর কি! ঙ-এঞ জাতীয় শব্দে যা থাকে।

—বুঝেছি। আনুনাসিক শব্দ।

—আজ্ঞে তাই হবে হয়তো। ঐ আওয়াজে চন্দরবিন্দুর কোন ভেজাল ছিল না। ওটা তাই ইঞ্জিনের হুইসেল নয়। কলিং বেল।

—বেশ তো। তা আমার কাছে কী পরামর্শ চাইতে এসেছ ?

—ডাক্তারবাবুর কথা ছাড়ান দ্যান। আমরা মাগ্-ভাতারে যদি দু-জনে দু-রকম কথা বলি, তাহলে কি আমাদের ধরে চালান দেবে না ?

—তা কেন দেবে? দু-জনের অভিজ্ঞতা দু-রকম তো হতেই পারে। হলপ নিয়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় নিছক সত্যি কথাই তো বলতে হবে।

—অ্যাই দেখুন! তাই নয়? অথচ মুখুজ্জে-সাহেব বলছেন···

—কোন মুখার্জি-সাহেব ?

বটুক দু-হাতে নিজের দুই কান স্পর্শ করে জিব বার করল। বলল, মুখ-'ফক্সে' বলে ফেলেছি, হুজুর। পুলিশ সাহেব পই-পই করে বারণ করেছেন। শাসিয়ে রেখেছেন—কথাটা পাঁচকান হলে আমার জিব উপড়ে নেবেন।

—ও! বুঝেছি! ইন্সপেক্টার অসীম মুখার্জী! সে বুঝি তোমাকে তালিম দিতে গেছিল। কাঠগড়ায় উঠে কী বলতে হবে। তাই নয় ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর। কথাটা গোপন রাখবেন স্যার। পুলিশের কাছে একবার যে এজাহার দিয়েছি, কাঠগড়ায় ডাঁইরে তার একটি কথা কি বদলাতে পারি? তাইলে জেল হয়ে যাবে না ?

—না, বটুক। তা যাবে না। পুলিসের কাছে প্রথম যে জবানবন্দি দিয়েছ তার কিছুটা পরিবর্তন তুমি অনায়াসে করতে পার সাক্ষী দিতে উঠে। বলতে পার, পরে ভেবে দেখেছ আগেকার দেওয়া এজাহারটা ভুল। শপথ নিয়ে তুমি একবারই সাক্ষী দিচ্ছ আদালতে,—প্রথমবার পুলিসের কাছে যে এজাহার দিয়েছ, তা তো শপথ নিয়ে নয়!

বটুক এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে একটু ঝুঁকে সামনের দিকে এগিয়ে এল। নিচু গলায় প্রায় ফিস্-ফিস করে বলল, তাইলে এট্টা কথা বলব, হুজুর? ভয়ে বলব না নিভ্যয়ে বলব ?

—ভনিতা করছ কেন? যা বলবে বল না। আমি কাউকে জানাতে যাব না।

—মুখুজ্জে-সাহেব বলছেন আমারে কবুল করতে হবে যে, আমি টর্চের আলোয় দেখতে পেয়েছিলাম যে লোকটা ফুটপাতে দাঁইড়ে 'কলিং বেল' বাজাচ্ছিল সে পুরুষ মানুষ। মুখ দেখতে পাইনি, কিন্তু তার পরনে ছিল

প্যান্ট-শার্ট। এ নাকি আমি নিঘ্যস স্বচক্ষে দেখিচি।

বাসু পাইপে বার দুই টান দিয়ে বললেন : হুঁ। অথচ আসলে তা তুমি দেখনি?

—আজ্ঞে না, হুজুর। আমি ও-বাগে টর্চ ফোকাসই করিনি।

—করলে, মানে ওদিকে টর্চের আলো ফেললে তুমি তোমার ঘরের জানলা থেকে দেখতে পেতে ঃ কে বেলটা বাজাচ্ছে?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। তা দেখা যায়। কিন্তু হককথা বলব : ও-বাগে আমি টর্চের আলো একবারো ফেলিনি। মানে আমার যন্দুর মনে পড়ে···

—ডাক্তারবাবুর কন্দুর মনে পড়ে? মানে টর্চের আলো ফেলার বিষয়ে?

—না, হুজুর। ডাক্তারবাবুকে আমি যখন ডাকতে যাই তখন তো কলিং বেল বাজানো বন্ধ হয়ে গেছে।

—তবে যে ডাক্তারবাবু বললেন, এঞ্জিনের শব্দ?

—সে তো উনি নিজের খাটে শুয়ে শুয়ে শুনেছেন। তখনও আমি ওঁরে ডাকিনি। উনি যখন এসে দেখেন তখন ওই যে-লোকটা কলিং বেল বাজাচ্ছিল সে চলে গেছে।

বাসু বললেন, বুঝলাম। তা সৌদামিনী কী বলছে? ওই টর্চের আলো ফেলার বিষয়ে?

—ওই তো আমারে এখানে পাঠাল। আপনার কাছে জেনে যেতে যে, ওর আগেকার দেওয়া জবানবন্দিটা ও বদল করতে পারে কি না। নতুন করে বলতে পারে কি না যে, ও কিছুই দেখেনি, কিছুই শোনেনি। জানলার বাগে ও প্রথমটায় যায়ইনি।

—তাতে কী লাভ?

—তাহলে আমি বলতে পারি যে, আমি একাই জানলা দিয়ে টর্চের আলো ফোকাস করে মেঝেতে একটা লোকের নিথর ঠ্যাং দেখতে পাই; আর টর্চের আলোটা ওই সদর-দরজার বাগে ফোকাস করে দেকিচি ফুটপাথে ডাইড়ে কলিং বেলের বোতামের গলা কে টিপে ধরেছিল। তারপর আমি সদুরে ডাকি। সে জানলার বাগে সরে আসে। দেখে, শুধু ওই নিথর ঠ্যাংখানা। ততক্ষণে ফুটপাথে ডাইড়ে যে কলিং বেল বাজাচ্ছিল, সে ভাগল্‌বা।

—এ ভাবে মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ায় লাভ?

—বটুক মাথা নিচু করে দাঁত দিয়ে নখ খুঁটতে থাকে। নীরবে।

—বুঝলাম। তাতে তোমার কিছু আর্থিক লাভ হবে। তা মিথ্যে সাক্ষীই যদি দেবে তাহলে দু-জনেই তা দিচ্ছ না কেন? তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে তো একই কথা বলতে পারো—

—কী কথা?

—ঐ মুখার্জি-সাহেব যে কথা বল্‌তে বলছে। যে, তোমার পরিবার যখন জানলার কাছে সরে আসে তখনই তুমি টর্চের আলোটা রাস্তার দিকে ফেলেছিলে। তোমরা দু-জনেই দেখতে পাও যে, ফুটপাথে 'ডাইড়ে' যে

মানুষটা 'কল-বেল' বাজাচ্ছে তার পরনে শার্ট-প্যান্ট। তাহলে কি মুখার্জি-সাহেব তোমাকে যত টাকা দেবে বলেছে তার ডবল-টাকা দেবে না? দু-জন সাক্ষী একই কথা বললে তো ওদের কেসটা আরও জোরদার হয়।

—তা হয় হুজুর। ডবল না দিলেও আমারে যত ট্যাকা বক্‌শিস্‌ দেবে বলেছে, তার দেড়া দেবে নিশ্চয়—মানে ঠিক মতো দরাদরি করতে পারলে। কিন্তু মুশ্‌কিল কী হয়েছে জানেন হুজুর? সদু সাহস পাচ্ছে না।

—সে কী! এই যে বল্‌লে, সে খুব ডাকাবুকো। তার বাপ ভীমা ডাকাতের মতো?

—না, হুজুর 'ডাকাত' কথাটা আমি বলিনি। ব্যাপারটা কী জানেন? সদুর সব বীরত্ব শুধু আমার উপর। পুলিশকে ও ভীষণ ডরায়। এটাও ওর বাপের কাছ থেকে পাওয়া। ভীমা কৈবর্ত কি কম ঠ্যাঙানি খেয়েছে পুলিশের হাতে। সদুর আদালত অভিজ্ঞতাও আছে। বাপের কেস শুনতে গেছিল। সাক্ষীর কাঠগড়ায় উকিলবাবুরা যে কীভাবে নাকাল করে তা ও জানে। তাই ও এখন এজাহার দিতে চায় যে, সে বিশেষ কিছু দেকেনি।

—বুঝলাম। তা মুখার্জি-সাহেব কত টাকা দেবে বলেছে।

বটুক ঘাড় চুলকে বললে, পুলিশে আবার ট্যাকা বকশিশ্‌ দ্যায় নাকি? এ ট্যাকা তো ওই রাও-সাহেব দিচ্ছে।

—রাও সাহেব? ত্রিবিক্রম নারায়ণ রাও?

—আজ্ঞে তিনি তো আর নিজে আমার কাছে আসেননি। আন্‌জাদ করছি।

বাসু নীরবে কিছুক্ষণ ধূমপান করে বললেন, তা আমার কাছে ঠিক কী জানতে এসেছ, বটুক? আমার মনে হচ্ছে মন খুলে তুমি সব কথা এখনও বলতে সাহস পাচ্ছ না, তাই না?

—আজ্ঞে, তাই! আপনি ঠিকই আন্‌জাদ করেছেন।

—কথাটা কী?

—আমরা মাগ-ভাতারে চাই না ওই নার্স-মেয়েটার—ওই আপনার মক্কেল আর কী—তার ফাঁসি হয়ে যাক।

—ফাঁসিই যে হবে তা ধরে নিচ্ছ কেন?

—না হয়, মেয়াদই হল। ট্যাকার জোরে ওই অবাঙালি কোটিপতি লোকটা একটা খেটে-খাওয়া বাঙালি মেয়েকে এ ভাবে হেনস্তা করবে এটা আমাদের ভালো লাগছে না!

—মানলাম। তাহলে তোমরা কী করতে চাও?

—ধরুন হুজুর আমি যদি বলি যে, সদরের দিকে টর্চ-ফোকাস করে আমি যাঁরে দেখতে পাই তাঁর পরনে ছিল শাড়ি-বেলাউজ?

—তাহলে রাও-সাহেবের 'বক্‌শিশ' তোমরা পাবে না।

—কিন্তু আপনার মক্কেল কি…

—না বটুক, টাকার প্রতিযোগিতায় আমার মক্কেল ওই রাও-সাহেবের সঙ্গে

পাল্লা দিতে পারবে না। আর শোন—যদি পারতও তাহলেও আমি তোমাকে দিয়ে মিথ্যে সাক্ষী দেওয়াতাম না। আমার এখন মনে হচ্ছে ইন্সপেক্টর মুখার্জিও তোমার কাছে যাইনি। তুমি সব বানিয়ে বানিয়ে বলছ। জানতে এসেছ, আমি টাকা দেব কি না। সে যা হোক তুমি খুবই ভুল করলে বটুক। আমাকে সব কথা বলে ফেলে। তোমার গোপন-কথা আমি কাউকে বলব না বটে, কিন্তু কাঠগড়ায় ডাঁইয়ে তুমি বা তোমার পরিবার যদি একচুল মিছে-কথা বল, তাহলে তোমাদের আমি ছিঁড়ে খাব! মিথ্যে সাক্ষী দেবার দায়ে তোমাদের জেল খাটাব! বুঝেছ?

—না, মানে…

—আর একটি কথা নয়! তুমি ওঠ। তুমি আমার কাছে পরামর্শ চাইতে এসেছিলে। আমার পরামর্শ হল: কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে, 'যাহা বলিবে সত্য বলিবে, সত্যবই মিথ্যা বলিবে না'। 'বলিলে' তোমার গলায় আমি নম্বরি তক্তি ঝোলাইব। ওই ধুতি খুলে ডোরা কাটা হাফপ্যান্ট পরাইব, বুঝেছ? পান-সাজা ছেড়ে মাটি কোপাতে হবে তোমাকে। নাউ জাস্ট ক্লিয়ার আউট।

—লোকটা দু-হাত জোড় করে বললে, স্যার…

—আই সে: গেট আউট!

ওঁর কণ্ঠস্বরে কৌশিক পাশের ঘর থেকে উঠে আসে। বটুকের দিকে ফিরে বলে, তুমি কে? কী চাও?

—আজ্ঞে না, কিছু চাই না।

—সাহেব তোমাকে চলে যেতে বলছেন, যাচ্ছ না কেন?

—যাচ্ছি, যাচ্ছি, স্যার—

বটুক পালাবার পথ খুঁজে পায় না।

।। পনের ।।



পরদিন বাসু-সাহেব জেল-হাজতে গিয়ে ছন্দার সঙ্গে দেখা করলেন। ওঁর মনে হল দু-দিনেই ছন্দা বেশ ভেঙে পড়েছে। তার চোখের কোলে কালি। বোধহয় রাত্রে ঘুম হয় না। বাসু-সাহেবকে দেখে বলল, মামলার দিন পড়েছে?

—হ্যাঁ, পড়েছে। তোমাকে জানিয়েও গেছি। তোমার মনে নেই?

—না, মনে পড়ছে না। আই অ্যাম নট ইন্টারেস্টেড।

—তা বললে তো চলবে না, ছন্দা। তোমাকে লড়তে হবে।

—কার বিরুদ্ধে?

—যারা টাকার জোরে তোমার মতো অসহায় মেয়ের সর্বনাশ করতে চায়-তাদের বিরুদ্ধে। তুমি তো খুনটা করনি, অথচ…

—কে বললে? না, স্যার, আমি পরে ভেবে দেখেছি, খুনটা আমিই করেছি।

—জানি। আমার মনে আছে। তুমি বলেছিলে, কমলেশ দু-হাত বাড়িয়ে তোমার দিকে এগিয়ে আসে। তুমি তখন মেঝে থেকে একটা কিছু কুড়িয়ে নাও। ঘটনাচক্রে সেটা একটা গ্যালভানাইজড্ পাইপের টুকরো। তুমি সেটা এলোপাতাড়ি ঘোরাতে থাকো। তাতেই কমলেশ আহত হয়; তাই না?

—হ্যাঁ, তাই।

—কিন্তু তুমি স্বচক্ষে ওকে আহত হতে দেখনি, কারণ ঠিক তখনই আলোটা কে যেন নিবিয়ে দেয়।

—অথবা আলোটা ফিউজ হয়ে যায়।

—কিন্তু প্রথমবার আমাকে তা বলনি, বলেছিলে 'সুইচ অফ' হবার শব্দ তুমি স্বকর্ণে শুনেছ। ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি ছিল, যে লোকটা বারে-বারে অন্ধকার ঘরে দেশলাই কাঠি জ্বালাচ্ছিল।

—হ্যাঁ, তা জ্বালাচ্ছিল।

—এবং তোমার মনে হল, ভারা বেয়ে সেই লোকটা নেমে গেল।

—হয়তো সে-লোকটা নয়। কারণ আমি যখন দরজা খুলে বার হয়ে আসি তখনও সে ল্যান্ডিং-এ দাঁড়িয়ে। ভারা বেয়ে যে নেমে যায়, সে অন্য একজন।

—এবং আরও অন্য একজন বাইরে থেকে কলিং বেল বাজাচ্ছিল।

—হ্যাঁ, তাই।

—তার মানে কমলেশ খুন হবার সময় তুমি ছাড়া আরও দু-তিনজন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। তাছাড়া কাগজে যে খবর বার হয়েছিল তাতে লেখা হয়: কমলেশের মাথার পিছন দিকে আঘাত লাগে। তা কেমন করে হয়? তুমি যখন এলোপাতাড়ি পাইপটা ঘোরাচ্ছিলে তখন সে তো তোমার দিকে ফিরে ছিল?

—কী জানি। আমি কিছু চিন্তা করতে পারছি না।

—একটা কথা অন্তত বল। কমলেশের সঙ্গে যখন দেখা করতে যাও—শনিবার রাত একটা নাগাদ, তখন ওর বাড়ির কাছে, রাস্তায় তুমি কি গাড়িটা লক করে যাওনি? ঐ অত রাত্রে গাড়িটা অরক্ষিত রেখে গেছিলে!

—হ্যাঁ তাই। নাহলে। আমি ফেরার সময় গাড়িতে ঢুকতে পারতাম না। চাবিটা তো তার আগেই ওই ঘরে পড়ে গেছিল।

—আমি যুক্তির কথা জিজ্ঞেস করছি না, ছন্দা। স্মৃতির কথা জিজ্ঞেস করছি। তোমার কী স্পষ্ট মনে আছে যে, কমলেশের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে কী করে গাড়িতে উঠলে? চাবি দিয়ে দরজা খুলেছিলে কিংবা খোলনি?

—আমার কিছু মনে পড়ছে না। তখন আমি অত্যন্ত উত্তেজিত ছিলাম।

—ন্যাচারালি। কিন্তু চাবিটা তো ছিল তোমার ভ্যানিটি ব্যাগের ভিতর। কমলেশের ঘরে চাবিটা পড়ে গেল কী করে? ভ্যানিটি ব্যাগ তুমি ওর ঘরে

ঢোকার পর খুলেছিলে ?

—আমার মনে নেই। তবে ওই ব্যাগেই ছিল ডাক্তার ব্যানার্জি'র রিভলবারটা। হয়তো কমলেশ যখন আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে তখন আমি ব্যাগ খুলে যন্ত্রটা বার করতে চেয়েছিলাম…

—এ-ও তো ডিডাক্‌শন। চাবিটা কীভাবে তোমার ব্যাগ থেকে বার হয়ে মাটিতে পড়ে গেল তার যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ। তোমার স্মৃতি কী বলে ? তোমার মনে আছে কি, যে ব্যাগ খুলেছিলে ?

—না, মনে নেই।

বাসু-সাহেব এবার তাঁর ব্রিফকেস্ খুলে একটা আবেদনপত্র বার করে ওর হাতে দিলেন। ছন্দা জানতে চায়, কী এটা ?

—ত্রিদিবনারায়ণের বিরুদ্ধে তোমার বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন।

—কিন্তু আমি তো বিবাহ-বিচ্ছেদ চাই না…

—এর পরেও ? আদালতের বারান্দায় সে সর্বসমক্ষে তোমাকে যে গালা-গাল দিল, যে ব্যবহার করল…

ছন্দা ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলে, সেটা ওর অপরাধ নয় স্যার, সেটাই ওর অসুখ! ও একটা অবসেশনে ভুগছে। ও যা কিছু করছে তা ওর বাবার নির্দেশে…

—তা কেমন করে হবে, ছন্দা ? তোমাকে একা বিছানায় ফেলে রেখে ঘটনার পরদিন শনিবার আক্ষরিক অর্থে সাত-সকালে সে যখন আমার কাছে আসে তখন তার বাবা কলকাতায় ছিলেন না। আমার নিষেধ সত্ত্বেও সে যখন পুলিসে যায় তখন সে স্বেচ্ছায় যায়, বাবার নির্দেশে নয়…

—স্বেচ্ছায় নয়, স্যার। 'স্ব-ইচ্ছা' বলে ওর কিছু নেই। ওর ইচ্ছাটাই ওরা বদলে দিয়েছে। ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায়, বিচার-বুদ্ধিটা ওর বাবা মগজ ধোলাই করে ধ্বংস করে দিয়েছে।

বাসু নিজের পকেট থেকে ফাউন্টেন বার করে খাপটা খুলে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরেন। বলেন, তুমি বারে বারে অবাধ্য হয়েছ। তোমাকে আমি বারণ করেছিলাম যে, পুলিসের কাছে কোনও জবানবন্দি দেবে না। তুমি আমার কথা শোননি—ফলে আত্মরক্ষার্থে তুমি কমলেশকে হত্যা করেছ—যেটা হতে পারত আমার শেষ প্রতিরোধ—তা আর দাঁড় করানো যাবে না। কারণ তুমি বলেছ যে, তুমি বাড়ির ভেতরেই যাও নি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কলিংবেল বাজাচ্ছিলে। কিন্তু বাস্তবে কলবেল কে বাজাচ্ছিল জান ? ডক্টর ব্যানার্জি।

—ডক্টর ব্যানার্জি! তিনি তখন ওখানে কেন আসবেন ?

—কেন আসবেন, তা তুমি জান। যে কারণে তোমাকে বে-আইনীভাবে রিভালবারটা দিয়েছিলেন। যে কারণে তোমাকে একটা ফল্‌স ডেথ সার্টিফিকেট-ও দিয়েছিলেন। তার প্রতিদানে তুমি এবার চাও তোমার বদলে তিনি এসে খুনের মামলার আসামী হয়ে দাঁড়ান ?

ছন্দা অসহায়ভাবে ওঁর দিকে তাকায়।

—হ্যাঁ, ডক্টর ব্যানার্জি সেই শুক্রবার রাত্রে কিছুতেই নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারেন নি। তিনি আমার কাছে স্বীকার করেছেন যে, উনি শনিবার রাত একটা নাগাদ মা সন্তোষী অ্যাপার্টমেন্টে এসেছিলেন। তিনিই কলিংবেলটা বাজিয়েছিলেন। তাঁকে লালবাজার থেকে ডেকে পাঠিয়েছিল। ডিভোর্সের মামলার দিন ত্রিদিবের অ্যাডভোকেট কী প্রশ্ন করেছিল মনে নেই ?

এই সময় হাজতের ভারপ্রাপ্ত পুলিস সাব-ইন্সপেক্টার মুখ বাড়িয়ে বলে, সময় হয়ে গেছে স্যার, এবার আসুন আপনি—

বাসু বলেন, আর এক মিনিট।

লোকটা চলে যেতেই বাসু-সাহেব কলমটা ছন্দার হাতে গুঁজে দিয়ে বলেন, ডক্টর ব্যানার্জিকে তুমি এভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পার না, ছন্দা, ডু অ্যাজ আই সে! সই কর।

ছন্দা আর আপত্তি করে না। কলমটা হাত বাড়িয়ে নেয়। বিবাহ-বিচ্ছেদ দরখাস্তের চিহ্নিত স্থানে গোটা-গোটা হরফে নিজের নামটা সই করে দেয়।

* * *

বাড়িতে ফিরে এসে শোনেন একটা অদ্ভুত সংবাদ :

ডাক্তার ব্যানার্জি অ্যাবডাক্টেড!

নার্সিং-হোম থেকে জবা ফোন করে জানিয়েছে। গতকাল মধ্যরাত্রে নাকি জবার চোখের সামনেই একদল লোক ডক্টর ব্যানার্জিকে তুলে নিয়ে গেছে। খবরটা পেয়েই কৌশিক চলে যায় নার্সিং-হোমে। জবার সঙ্গে কথা বলে। সেখান থেকে থানায় যায়। তারপর ফিরে এসে বাসু-সাহেবের জন্য অপেক্ষা করছে।

বাসু বলেন, 'জোর করে-তুলে নিয়ে গেছে' মানে কী ?

কৌশিক যা বিবরণ দিল তা এই রকম :

গতকাল রাত আটটা নাগাদ একটা এমার্জেন্সি কেস আসে। জবা সচরাচর ঐ আটটা নাগাদ বাড়ি চলে যায়। শেয়ালদহ হয়ে বেলঘড়িয়া। কিন্তু এমার্জেন্সি কেসটার জন্য ও আটক পড়ে যায়। এর আগেও এমন ঘটনা দু'একবার হয়েছে। ডক্টর ব্যানার্জি ব্যাচিলার, একা থাকেন, তাই তাঁর কোয়ার্টার্সে রাত কাটায় না। হয় নার্সিং-হোমে বসে বসেই রাতটা কাটিয়ে দেয়। অথবা ওর দিদির বাড়িতে চলে যায়। সেটা কাছাকাছিই। গতকাল রাত এগারোটা নাগাদ রোগীটিকে অপারেশন থিয়েটার থেকে ইন্টেন্সিভ-কেয়ার য়ুনিটে অপসারণ করা হয়। তারপর রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ ডাক্তার ব্যানার্জি গাড়ি নিয়ে জবাকে তার দিদির বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্য বার হন। কিন্তু কিছুটা যেতেই নির্জন গলির মুখে আর একটা কালো রঙের অ্যাম্বাসাডার ওর গাড়ির পথরোধ করে দাঁড়ায়। ডক্টর ব্যানার্জি কিছু বলার আগেই সেই গাড়ি থেকে দু-তিনজন লোক নেমে আসে। ব্যানার্জি

তখন নিজের গাড়ি থেকে রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলেন, এভাবে গাড়ি চালাচ্ছেন কেন? এখনি তো অ্যাকসিডেণ্ট হয়ে যেত।

ও-গাড়ি থেকে যারা কাছে ঘনিয়ে এসেছিল তাদের মধ্যে দুজন ডাক্তার-বাবুর দুদিকে চলে যায়। তাদের একজনের হাতে রিভলবার। ডক্টর ব্যানার্জি'র তলপেটে মারণাস্ত্রটা ঠেকিয়ে লোকটা বলে, চিৎকার চেঁচামেচি করবেন না। এ গাড়িতে উঠে বসুন।

একজন জবার কাছে এগিয়ে আসে। তার হাতে একটা ছোরা। লোকটা বলে, দিদি, কোনও শব্দ করবেন না। জানে মারা পড়বেন। আমরা চলে গেলে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি চলে যাবেন। ডাক্তারবাবুর গাড়ি এখানেই পড়ে থাক।

জবা জবাবে কিছু বলার আগেই ঐ কালো রঙের অ্যাম্বাসাডারখানা ডাক্তারবাবুকে নিয়ে হাওয়া।

জবা নার্সিং-হোমে ফিরে যায় হেঁটেই। থানায় ফোন করে। থানা থেকে এনকোয়ারিতে আসে মধ্যরাত্রে। জবার জবানবন্দি নেয়। ডাক্তার-বাবুর গাড়ির ইগ্‌নিশান চাবি ড্যাশবোর্ডে লাগানোই ছিল। ওরা গাড়িটা নিয়ে গ্যারেজজাত করে চলে যায়।

বাসু বলেন, এতবড় একটা ব্যাপার হয়ে গেল, জবা তাহলে কাল রাতে আমাকে ফোন করেনি কেন?

—ও বললে, ততক্ষণে রাত সাড়ে বারোটা বেজে গেছে, তাই।

—অল রাইট। আজ সকাল ছয়টা-সাতটার সময় সে ফোন করে আমাকে জানায়নি কেন?

—ও তো বলছে, বার-কতক চেষ্টা করেছিল। কানেক্‌শান পায়নি। যখন কানেক্‌শান পায়, ততক্ষণে আপনি ছন্দাদেবীর সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে গেছেন।

বাসু চিন্তিত মুখে বার কতক পদাচারণ করে বললেন, সবটা তদন্ত করে তোমার কী মনে হল, কৌশিক?

—থানা অফিসারের সঙ্গে কথা বলে মনে হল, সে ব্যাপারটায় খুব কিছু গুরুত্ব দিচ্ছে না।

—তাই বা কী করে সম্ভব? ডক্টর ব্যানার্জি একজন অত্যন্ত নামকরা চিকিৎসক, তিনি এভাবে অপহৃত হয়ে গেলেন তাতে থানা বিচলিত নয়?

—দুটো সম্ভাবনার মধ্যে একটা আপনাকে বেছে নিতে হবে, মামু।

—কী দুটো সম্ভাবনা?

—এক নম্বর: পুলিস জানে, ডাক্তার ব্যানার্জি কমলেশ-হত্যা মামলায় সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়াতে চান না এবং আপনিও তা চান না। তাই পুলিস মনে করছে, এটা আপনার পরিকল্পনা মোতাবেক। অর্থাৎ অ্যাবডাকশানটা আপনিই সাজিয়েছেন। দু'নম্বর: থানা জানে যে, লাল-বাজার থেকে এটা অর্গানাইজ করা হয়েছে। অর্থাৎ ডাক্তার ব্যানার্জিকে আপনার

নাগালের বাইরে রাখা হয়েছে। মামলার দিন সকালে তথাকথিত অপহারক-দল তাঁকে মুক্তি দেবে। আর তৎক্ষণাৎ পুলিস তাঁকে সমন ধরাবে। তার মানে, আপনার বিনা তালিমে ডাক্তার ব্যানার্জি সাক্ষীর-মঞে উঠে দাঁড়াতে বাধ্য হবেন।

বাসু-সাহেব নিঃশব্দে বারকতক পদচারণা করে হঠাৎ থেমে পড়েন। নিজের চেয়ারে বসে বললেন, তোমার দুটো যুক্তির একটাও ধোপে টেকে না।

—কেন ?

—প্রথম কথা, আমি যে 'অপারেশেন-অ্যাবডাকশান'-এর পরিচালক নই তা তোমরা সবাই জান। তোমার দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাও গ্রাহ্য নয়—এই সামান্য কারণে পুলিস ডক্টর ব্যানার্জি'র মতো একজন বিখ্যাত চিকিৎসককে 'অ্যাবডাক্ট' করাবে না।

—তা হলে উনি অপহৃত হলেন কেন ?

—এটা ডক্টর ব্যানার্জি আর জবা মিলে অর্গানাইজ করেনি তো ?

—মানে ?

—মানে, সবটাই সাজানো। ডক্টর ব্যানার্জি যখন বুঝল যে, দিন দশ-পনেরোর জন্য—অর্থাৎ ঐ হত্যামামলার শুনানী পর্যন্ত সে নিরুদ্দেশ হতে পারবে না, তখন নিজেই এই অপহরণটা সাজায়নি তো ?

—সেজন্য ডাক্তার ব্যানার্জি'র মতো একজন ছাঁপোষা মানুষ এমন একটা অপহরণ অর্গানাইজ করাবে ?

—আরে বাপু অপহরণটা তো জবার বর্ণনা মোতাবেক ? আর কোনও সূত্রে তো আমরা জানি না যে, ডাক্তারবাবু আদৌ অপহৃত হয়েছেন।

—তা বটে।

—সবটাই ডক্টার ব্যানার্জি'র উর্বর মস্তিষ্কের পরিকল্পনা বলে মনে হচ্ছে। তোমার জান যে, লালবাজার থেকে ডাক্তারের উপর একটা নির্দেশ জারী করা হয়েছিল। কলকাতার বাইরে গেলে সে যেন তার ঠিকানা রেখে যায়। সে তখন আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চেয়েছিল। আমি প্রত্যাখ্যান করি। হয়তো তখন ডাক্তার আর তার নার্স এই উদ্ভট পরিকল্পনাটা করে। সেক্ষেত্রে জবা সব কিছুই জানে। আর সে জন্যই কাল রাত্রে আমাদের অহেতুক ডিসটার্ব করেনি। আজ সকালেও তার টেলিফোন করতে এত দেরী হয়ে যায়।

সুজাতা বললে, আপনি ঠিকই বলেছেন, মামু। ডাক্তার ব্যানার্জি যদি সত্যিই ঐভাবে অপহৃত হতেন তাহলে জবা নার্সিং-হোমের কোন লোককে সঙ্গে নিয়ে রাত্রেই ট্যাক্সি করে এখানে চলে আসত। বিশেষ, থানা যখন তাকে আমল দিচ্ছে না।

বাসু পাইপে তামাক ঠেশ্‌তে ঠেশ্‌তে বলেন, প্রায় সবগুলো অসঙ্গতির যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে, শুধু একটি বাদে—

রানু জানতে চান, কী সেটা ?

—রাত একটার সময় ছন্দা কোন আক্কেলে তারাতলায় তার মারুতি-সুজুকি গাড়ির ড্যাশ-বোর্ডে ইগ্‌নিশান চাবি রেখে, গাড়িটা লক না করে কমলেশের বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়!

রানু বললেন, সে সময় ও খুব উত্তেজিতা ছিল।

—না, রানু, ছিল না। ফেরার পথে সে উত্তেজিতা ছিল। ফলে সে ফেরার সময় কী করে গাড়িতে ওঠে এটা তার মনে না থাকতে পারে। কিন্তু গাড়িটা তারাতলার মতো কারখানা-এলাকায় ঐভাবে অত রাত্রে সে কেন অরক্ষিত রেখে গেল? গাড়ি থেকে নেমে গেলে ড্রাইভার কাচ উঠিয়ে গাড়ি লক করে। এটা প্রায় প্রতিবর্তী প্রেরণায়। অভ্যাসবশে। দেখলে না, ছন্দা তার জবানবন্দিতে বলল, বাড়ি ফিরে এসে যখন গাড়ি গ্যারেজ করে তখন সে স্লাইডিং ডোরটা টেনে গ্যারেজটা বন্ধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। অ্যামবাসাডার গাড়িটা একটু সরে-নড়ে যাওয়ায়। তখন সে খুবই উত্তেজিতা। তবু নিজের গ্যারেজের ভিতর সে গাড়ি লক্ করতে চেয়েছে। আর হপ্তাবারে···মানে সপ্তাহান্তে রাত একটার সময় তারাতলার মতো কারখানায়-ভর্তি এলাকায় সে গাড়ি লক্ না-করে গাড়ি থেকে নেবে যাবে? নাঃ। মিলছে না···

—কিন্তু গাড়ি যদি সে লক্-করে নেমে যায়, তাহলে চাবিছাড়া সে গাড়িতে উঠবে কী করে?

—দ্যাটস্ দ্য মিলিয়ান-ডলার কোশ্চেন!

।। ষোল ।।



প্রাথমিক তদন্ত শেষ করে মামলাটা ট্রাইং ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে উঠতে দেরী হয় না; এবং তিনি আসামীকে দায়রায় সোপর্দ করলেন। চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টের মামলা উঠতে বিলম্ব হ'ল না। এমনটা সচরাচর হয় না। সম্ভবত, নেপথ্যে রাজনৈতিক চাপ এর হেতু। ধনকুবের-সম্প্রদায় চার-পাঁচ বৎসর অন্তর রাজনৈতিক দল-গুলিকে ভোটযুদ্ধের রসদ যোগান দেন। ফলে তাঁদের প্রভাবে এদেশে অনেক কিছুই ঘটে থাকে। এ-ক্ষেত্রেও যখন ছন্দা-ত্রিদিবের বিবাহটা প্রথম থেকেই নাকচ করানো গেল না তখন ত্রিবিক্রম সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন পুত্রবধূকে ফাঁসিকাঠ থেকে ঝোলাতে। এছাড়া তাঁর একচ্ছত্র-সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষিত হত না।

ত্রিদিব তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে পারবে না। উপায় নেই; কিন্তু সাংবাদিকদের হাত থেকে রক্ষা করতে ত্রিদিবকে একেবারে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা হয়েছে। সম্ভবত কোনও পাঁচতারা হোটেলের অজ্ঞাতবাসে।

মামলার দিন আদালতে অপ্রত্যাশিত জন-সমাগম হয়েছে। অপ্রত্যাশিত কথাটা অবশ্য ঠিক হবে না, কারণ ইতিমধ্যে কয়েকটি সংবাদপত্রে এ-নিয়ে

বিস্তারিত 'রিপোর্টাজ' হয়েছে। রাজপুত ঐতিহ্যের শক্তাবৎ-রাজরক্তের এক ধনকুবেরের একমাত্র পুত্রকে কী-ভাবে একটি নার্সিং-হোমের ভেতো-বাঙালী 'নাইট-নার্স' কব্জা করে ফেলল, কীভাবে তাদের রেজিস্ট্রি-বিবাহ সুসম্পন্ন হল, কী-ভাবে ছেলেটির কোটিপতি পিতা নাসিক থেকে উড়ে এসে সে বিবাহ অবৈধ প্রমাণে 'আদ্রকোদক-সেবনান্তে' প্রাণপাত করলেন, এবং কী-প্যাঁচে পি. কে. বাসু বার-অ্যাট-ল ধনকুবেরের সে উষ্ণ-প্রয়াসে এক বালতি বরফ-গলা জল ঢেলে দিলেন। এসব তথ্যই সংবাদপত্রের একনিষ্ঠ পাঠক-পাঠিকার দল প্রভাতী চায়ের উপাদান হিসাবে জানে। তাই তারা আরও জানতে আগ্রহী: ধনকুবের কি অতঃপর তাঁর বধূমাতাকে—'উদ্বাহন' থেকে নিরস্ত করতে ব্যর্থ হয়ে 'উদ্বন্ধনে' উর্ধ্বগামী করতে সক্ষম হবেন? মামলাটা যদিও স্টেট-ভার্সেস ছন্দা রাওয়ের—সকলে ধরে নিয়েছে বাস্তবে: ধনকুবের ত্রিবিক্রমনারায়ণ রাও বনাম ব্যারিস্টার পি. কে. বাসুর।

: আদালত যদি অনুমতি করেন তাহলে বাদীপক্ষ একটি সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক ভাষণ দিয়ে এই মামলার সূত্রপাত করতে ইচ্ছুক। বাদীপক্ষ আশা করেন যে, তাঁরা প্রমাণ করবেন: এই মামলার আসামী শ্রীমতী ছন্দা রাও সুপরিকল্পিতভাবে তারাতলার মা-সন্তোষী অ্যাপার্টমেণ্টে গিয়ে মধ্যরাত্রে তাঁর প্রথম পক্ষের স্বামী কমলেশ বিশ্বাসকে হত্যা করেছেন। আমরা আরও আশা রাখি প্রমাণ করব যে, মাত্র সাত দিনের কোর্টশিপে ঐ আসামী শয্যাশায়ী, অসুস্থ এক ধনকুবেরের একমাত্র পুত্র তথা-ওয়ারিশকে মোহমুগ্ধ করে, তাঁর পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গোপনে রেজিস্ট্রি-বিবাহ করেন। এত অল্পসময়ের কোর্টশিপে এ জাতীয় বিবাহের একটিই উদ্দেশ্য হতে পারে—কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে আসামী হঠাৎ এক প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়ে পড়েন: তাঁর প্রথম পক্ষের জীবিত স্বামী, কমলেশ বিশ্বাস। সদ্যোবিবাহিত রাজপুত্রের কুবেরঈর্ষিত বৈভব হস্তগত করতে হলে প্রথম পক্ষের স্বামীকে অপসারণ করা নিতান্ত প্রয়োজন। আসামী মধ্যরাত্রে সেই উদ্দেশ্যই একাকী ড্রাইভ করে প্রথম স্বামীসাক্ষাতে গিয়েছিলেন। আমরা প্রমাণ করব: সে সময় তাঁর হাতব্যাগে একটি রিভলবার ছিল; কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়েটি হত্যার হাতিয়ার হিসাবে একটা গ্যালভানাইজড় পাইপ বেছে নেয়—যাতে স্বতই মনে হতে পারে যে, এটা সুপরিকল্পিত হত্যা নয়, আত্মরক্ষার্থে হোমিসাইড। আমরা আরও আশা রাখি প্রমাণ করব যে, আসামী একটি মিথ্যা ডেথ-সার্টিফিকেটের সাহায্যে তাঁর জীবিত স্বামীর ওয়ারিশ হিসাবে ইন্‌শিওরেন্স পলিসি থেকে···

বাসু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: অবজেকশান য়োর অনার! প্রারম্ভিক ভাষণে মাননীয় সহযোগী অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করছেন। আমরা একটি হত্যা-মামলার বিচার প্রত্যাশায় এসেছি, আসামীর বিরুদ্ধে আর কোনও অপরাধের জন্য পাবলিক প্রসিকিউটার যদি কোন অভিযোগ আনেন, তবে তা

চার্জসীটে আইনের ধারা মোতাবেক উল্লেখ করা উচিত ছিল।

পি. পি. নিরঞ্জন মাইতি বলেন, আমরা আসামীর চরিত্র উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে…

বিচারপতি সদানন্দ ভাদুড়ী বলেন, আপত্তি গ্রাহ্য হল। মিস্টার পি. পি. আপনি হত্যামামলার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক ভাষণ দেবেন, এটাই আদালতের প্রত্যাশা।

—দ্যাটস্ অল, য়োর অনার।

বিচারক চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সদানন্দ ভাদুড়ী এবার প্রতিবাদীর দিকে ফিরে বললেন, আপনারা কি কোনও প্রারম্ভিক ভাষণ দিতে চান?

বাসু বললেন, নো, য়োর অনার। বাদীপক্ষ এবার একে-একে তাঁদের সাক্ষীদের ডাকতে পারেন।

দর্শকের প্রথম সারিতে একদিকে বসে আছেন প্রস্তর মূর্তির মতো ত্রিবিক্রম নারায়ণ রাও, অন্যদিকে সুজাতা আর কৌশিক। দর্শক মণ্ডলীর ভিতর ডক্টর ব্যানার্জি আর ত্রিদিবকে দেখা গেল না। জবা কিন্তু উপস্থিত।

বাদীপক্ষের প্রথম সাক্ষী পুলিস-ইন্সপেক্টর অসীম মুখার্জি। মাইতি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তার পরিচয় প্রতিষ্ঠা করলেন। ইন্সপেক্টার মুখার্জি জানালো বাইশে জুন, শনিবার, রাত একটা আঠাশ মিনিটে সে রেডিও মেসেজ পায়: তারাতলায় মা-সন্তোষী অ্যাপার্টমেণ্টে সম্ভবত একজন লোক খুন হয়েছে। ঐ সময় সে একটা পুলিস-জীপে ডায়মণ্ডহারবার রোডে টহল দিচ্ছিল। ওর জীপে রেডিও রিসিভারে খবরটা পায়, স্থানীয় পুলিস-স্টেশন থেকে। মুখার্জি তখন মা-সন্তোষী অ্যাপার্টমেণ্টে চলে যায়। পুলিসের গাড়ি দেখেই পাশের বাড়ি থেকে দুজন লোক নেমে এসে জানান যে, তাঁরাই ফোন করে পুলিস ডেকেছেন। তাঁদের একজনের নাম ডক্টর এন. দত্ত· অপর জনের নাম শ্রী বটুকনাথ মণ্ডল। ওঁরা মা-সন্তোষী অ্যাপার্টমেণ্টের সদর-দরজায় কলবেল বাজান। কেউ সাড়া দেয় না। তখন বটুক ইন্সপেক্টার মুখার্জিকে তার নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে যায় এবং টর্চের আলোয় পাশের বাড়িতে মেঝের উপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকা দেহটি দেখায়। শুধু পা-টুকু দেখা যাচ্ছিল। এরপর মুখার্জির নির্দেশে একজন পুলিস ভারা পেয়ে উপর তলায় উঠে যায়। গ্রিলহীন জানলার ফোকর দিয়ে ভেতরে গলে যায়। ভিতর থেকে ইয়েল-লক খুলে দেয়। ওঁরা সদলবলে উপরে আসেন।

ভুলুণ্ঠিত কমলেশ তখনো জীবিত ছিল; কিন্তু তার জ্ঞান ছিল না। আহতের ঘরে গৃহনির্মাণ সামগ্রী গাদা করে রাখা ছিল। তার ভিতর ছিল একটি পোনে-এক-মিটার দীর্ঘ বিশ মিলিমিটার ব্যাসের গ্যালভানাজইড লোহার পাইপ। তাতে রক্তের দাগ। যেটি আহতের অদূরেই পাওয়া যায়। মুখার্জির ধারণা হয়: ঐ পাইপের সাহায্যেই ভূতলশায়ী লোকটি আহত হয়েছে। সে পাইপটি সংগ্রহ করে।

ডক্টর দত্ত ভুলুণ্ঠিত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করে দেখেন যে, সে জ্ঞানহীন বটে

তবে মৃত নয়। ফলে ইন্সপেক্টর মুখার্জি একটি অ্যাম্বুলেন্স আনাবার ব্যবস্থা করে। বটুকের কাছ থেকে জানতে পারে আহত ব্যক্তির নাম কমলেশ বিশ্বাস। সে ঐ ঘরে একাই থাকত। তল্লাসি করতে গিয়ে ঘরের মেঝেতে—মৃতদেহের পাশেই—একটি চাবির রিঙ দেখতে পায়। তাতে তিনটি চাবি, একটি নবতাল তালার, আর দুটি মোটর গাড়ির ডোর-কী। মাইতি সেটিকে পিপল্‌স্‌ এক্সিবিট 'A' হিসাবে দাখিল করলেন। ইতিমধ্যে অ্যাম্বুলেন্স আর পুলিসের গাড়ি এসে পড়ে। আহতকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে মুখার্জি শুনেছে—হলপ নিয়ে বলতে পারবে না—কমলেশ ঐ হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মারা যায়। ইতিমধ্যে পুলিস-ফটোগ্রাফার অনেকগুলি ফটো নিয়েছে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট কিন্তু কোথাও কোনও আঙুলের ছাপ আবিষ্কার করতে পারেনি। না—সুমসৃণ সদ্য-লাগানো দরজার ইলেক্‌ট্রো-প্লেটেড হ্যাণ্ডেলে, টেলিফোন রিসিভারে, প্লাস্‌টপ টেবিলে—কোথাও কোন আঙুলের ছাপ নেই।

মাইতি বলেন: এটা আপনার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়নি?

বাসু তৎক্ষণাৎ আপত্তি জানান: জবাবটা সাক্ষীর 'কনক্লুশান।'

মাইতি বলেন, য়োর অনার! সাক্ষী-অপরাধ-বিজ্ঞানে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত। তাঁর যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত আদালতে গ্রাহ্য হওয়া উচিত।

বিচারক বাসু-সাহেবের আপত্তি নাকচ করে দিলেন।

ইন্সপেক্টার মুখার্জি বলে, হ্যাঁ, আমার কাছে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। আততায়ী যদি হাতে গ্লাভ্‌স্‌ পরে এসে থাকে তাহলে গৃহস্বামীর আঙুলের ছাপ অন্তত পাওয়া যেত। তা গেল না কেন?

মাইতি জানতে চান: এমনটা হল কেমন করে?

বাসু এবারও আপত্তি জানালেন। বিচারক পুনরায় তা নাকচ করলেন।

মুখার্জি বলল, তার সিদ্ধান্ত: আততায়ী ঘর ছেড়ে চলে যাবার আগে একটা রুমাল দিয়ে সবকিছু মসৃণ পদার্থ মুছে দিয়ে যায়।

মাইতি বলেন, 'রুমাল দিয়ে' কী করে বুঝলেন?

—না, রুমাল দিয়েই যে মোছা হয়েছে এ-কথা বলা যায় না। হয়তো শাড়ির আঁচল দিয়ে মোছা হয়েছে!

মাইতি বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বললেন, য়ু মে ক্রস্‌ হিম!

বাসু জেরা করতে উঠে প্রথমেই বললেন, মিস্টার মুখার্জি, আপনি এইমাত্র বললেন 'রুমাল দিয়েই যে মোছা হয়েছে একথা বলা যায় না। হয়তো শাড়ির আঁচল দিয়ে মোছা হয়েছে।' তাই না?

—হ্যাঁ, তাই বলেছি আমি।

—তার মানে আপনার বিশেষজ্ঞের সিদ্ধান্ত: যে-লোকটা সব কিছু থেকে আঙুলের ছাপ মুছে দিয়ে যায় তার পরিধানে শাড়ি ছিল। ধুতি কোনক্রমেই থাকতে পারে না, তাই কি?

—না, তাই নয়। এজন্যই আমি 'হয়তো' বলেছি।

—কিন্তু নিরপেক্ষ এক্সপার্ট সাক্ষী হিসাবে কি আপনার বলা উচিত ছিল না : 'হয়তো শাড়ির আঁচল অথবা কোঁচায় ঘটে ?

মাইতি আপত্তি তোলেন, সহযোগী তাঁর মনোমত জবাব পাননি বলে ক্ষুব্ধ হতে পারেন ; কিন্তু ক্ষোভের এ-জাতীয় প্রকাশ হওয়াটা অবাঞ্ছনীয়। আমি আপত্তি জানাচ্ছি, হুজুর।

বিচারক বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বলেন, য়োর পয়েন্ট ইজ ওয়েল টেক্‌ন্। আপনি পরবর্তী প্রশ্নে এগিয়ে যান।

বাসু বলেন, আমি শুধু দেখাতে চাইছিলাম, বর্তমান সাক্ষী আদৌ নিরপেক্ষ এক্সপার্ট নন, একটি পূর্ব-ধারণার বশবর্তী হয়ে সহযোগীর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন্ :

—আদালত আপনার যুক্তি শুনেছেন, যা সিদ্ধান্ত নেবার তা নেবেন। আপনি পরবর্তী প্রশ্নটি পেশ করুন।

বাসু টেবিলের উপর থেকে পিপল্‌স এক্‌জিবিট 'বি'-এর একটি ফটো তুলে নিয়ে সাক্ষীকে দেখান। বলেন, এ ফটো আপনার উপস্থিতিতে পুলিস-ফটোগ্রাফার সে রাত্রি তুলেছিল ? যখন আপনি ঐ ঘরে তদন্ত করছেন ? তাই না ?

—হ্যাঁ, তাই।

—ফটোতে টেবিলের উপর একটা টেব্‌ল্-ক্লক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। যেটাতে সময় দেখা যাচ্ছে দুটা বেজে দশ। যেহেতু আপনি বলেছেন যে, আপনি ঐ ঘরে পদার্পণ করেন রাত একটা চল্লিশে তাই বিশেষজ্ঞ হিসাবে আপনি কি বলবেন যে, আপনার ঐ ঘরে পদার্পণের ঠিক আধঘণ্টা পরে ফটোটি তোলা হয়।

—আজ্ঞে না। তা বলব না। বলব : পঁয়ত্রিশ মিনিট পরে। কারণ ঘরে ঢুকেই আমি নিজের হাতঘড়ির···যেটা নির্ভুল ইণ্ডিয়ান স্টাণ্ডার্ড টাইম দিচ্ছিল—সঙ্গে ওটা মিলিয়ে দেখি। আমি লক্ষ্য করেছিলাম : ঐ টেবিল ঘড়িটি পাঁচ-মিনিট স্লো ছিল।

—সেই টেব্‌ল্ অ্যালাম-ক্লকটা কোথায় ?

—আমরা ওটা 'সীজ' করে নিয়ে এসেছিলাম। জমা দিয়েছিলাম। এখন কোথায় আছে, তা জানি না।

বাসু-সাহেব নিরঞ্জন মাইতির দিকে ফিরে জানতে চান, ঘড়িটা কি আদালতে উপস্থিত করা যাবে ?

মাইতি বললেন, যাবে। যখন বাদীপক্ষ সেটা উপস্থিত করার সিদ্ধান্ত নেবেন, তখন যাবে। এখন নয়।

বাসু-সাহেব নিরুপায়ের ভঙ্গিতে 'শ্রাগ' করলেন। পুনরায় সাক্ষীর দিকে ফিরে প্রশ্ন করেন, ঐ টেবিল ঘড়িতে সময়ের কাঁটা দুটো ফটো-তোলার মুহূর্তে দুটো বেজে দশ মিনিট দেখাচ্ছিল, কিন্তু ওর অ্যালার্ম-কাঁটা কী সময় নির্দেশ করছিল তা ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাসের সাহায্যে ফটো দেখে বলবেন কি ?

—ফটো দেখার দরকার হবে না। আমার মনে আছে : ঠিক একটা।

বাসু-সাহেব পি. পি.-র দিকে ফিরে বললেন, ঘড়িটা কি এখন আদালতে আনা যেতে পারে ?

মাইতি দৃঢ়স্বরে বললেন, না। বাদীপক্ষ ঐ ঘড়ির প্রসঙ্গে কোন প্রশ্নই করেননি। ফলে, এখন ওটা অবান্তর।

বাসু বিচারকের দিকে ফিরে বললেন, য়োর অনার ! বাদীপক্ষ ঐ ফটোটা তাঁদের একজিবিট হিসাবে দাখিল করেছেন। ফটোতে একটি টেব্‌ল-ক্লক আছে, এটা প্রত্যক্ষ সত্য। বাদীপক্ষের সাক্ষী ঐ ঘড়ি সম্বন্ধে দু একটি তথ্য দাখিল করেছেন যা আদালতে নথীবদ্ধ হয়েছে। সাক্ষী এ কথাও স্বীকার করেছেন যে, তাঁর 'সীজার লিস্টে' ঐ ঘড়িটি আছে। অর্থাৎ সেটি বাদীপক্ষের হেপাজতে রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিবাদী পক্ষের আর্জি : সেটি আদালতে দাখিল করা হোক, যাতে আমরা বর্তমান সাক্ষীকে ও বিষয়ে আরও কিছু জেরা করতে পারি।

বিচারক সম্মত হলেন না। তাঁর মতে বাদীপক্ষ ঘড়িটিকে তাঁদের এভিডেন্সের মধ্যে এখনো আনেননি। যখন আনবেন, এখন প্রয়োজনে বর্তমান সাক্ষীকে আবার কাঠগড়ায় তুলে প্রতিবাদী জেরা করতে পারবেন।

বাসু বললেন, ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে বর্তমানে এই সাক্ষীকে জেরায় আর কোন প্রশ্ন করছি না। ওঁরা পরবর্তী সাক্ষীকে ডাকতে পারেন।

পরবর্তী সাক্ষী অটোপ্সি সার্জন ডাক্তার অতুলকৃষ্ণ সান্যাল। জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি তাঁর বিশেষজ্ঞের মতামত দিলেন : কমলেশের মৃত্যু হয়েছে, রাত বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে। মৃত্যুর হেতু কোন একটি ডাণ্ডা জাতীয় কঠিন বস্তু দিয়ে কেউ কমলেশের মাথার পিছন দিকে আঘাত করেছিল, তাতে তার 'সেরিবেল্লাম' আহত হয়। সে জ্ঞান হারায়।

মাইতি সুচতুরভাবে প্রশ্ন করেন, আপনি বলতে চান আততায়ী পিছন থেকে কমলেশের মাথায় আঘাত করেছিল ?

—সে-কথা আমি আদো বলিনি। আমি বলেছি, তার মাথার পিছন দিকে অবস্থিত 'সেরিবেল্লাম' আহত হয়েছিল—আততায়ী যে আক্রান্ত ব্যক্তির পিছনে ছিল এ-কথা আমি বলিনি।

—কিন্তু তা কী করে সম্ভব ? সামনে দাঁড়িয়ে আততায়ী কী করে একজনের মাথার পিছন দিকে আঘাত করবে ?

—হ্যাঁ, সেটাও সম্ভব। সেটাই ঘটেছে, একথা আমি বলছি না অবশ্য। বলছি, সেটাও অসম্ভব নয়···

—কী ভাবে ? একটু বুঝিয়ে বলুন ?

—কমলেশের দেহে দুটো আঘাত-চিহ্ন ছিল। একটি মাথার পিছন দিকে—সেটি ওর মৃত্যুর কারণ ; দ্বিতীয়টি ওর বাম ভ্রূর উপর। এমন হতে পারে যে, ওরা দুজন সামনা-সামনি ছিল। আততায়ী প্রথমে কমলেশের বাঁম ভ্রূতে আঘাত করে। তাতে কমলেশ ওর সামনে উবুড় হয়ে পড়ে যায়। তখন

আততায়ী ওর মাথার পিছন দিকে অনায়াসে দ্বিতীয়বার আঘাত করতে পারে। আই রিপীট...এমনটা ঘটেছিল তা আমি বলছি না, এমনটা ঘটতে পারে, তাই বলছি।

—দ্যাটস্ অল, য়োর অনার।

বাসু জেরা করতে উঠে বললেন, ডক্টর সান্যাল, আমি আপনাকে একটা বিকল্প ঘটনা-পরম্পরা শোনাচ্ছি। ধরা যাক : যে প্রথম বাড়িটা মারে—কমলেশের বাম ভ্রূতে, সে আত্মরক্ষা করতে চাইছিল। হয়তো সে স্ত্রীলোক, অথবা দুর্বল, তাই নিজেকে রক্ষা করতে যে এলোপাতাড়ি ডাণ্ডা ঘোরাচ্ছিল। কমলেশ বাঁ-চোখে আঘাত পেয়ে পড়ে যায়। আত্মরক্ষাকামেচ্ছু তখন লোহার পাইপটা ফেলে পালিয়ে যায়। কমলেশ মিনিট খানেক পরে সামলে নিয়ে উঠে বসতে চায়। আর তখন ঘরে উপস্থিত কোনও তৃতীয় ব্যক্তি ঐ পাইপটা তুলে নিয়ে কমলেশের মাথার পিছনে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে। এমনটা যে ঘটেছিল সে দাবী কেউ করছে না, কিন্তু এ জাতীয় ঘটনা পরম্পরায় কি কমলেশের মৃত্যু হতে পারে? এক্সপার্ট হিসাবে আপনার কী অভিমত?

—নিশ্চয় পারে।

—থ্যাংকু ডক্টর! আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।

নিরঞ্জন মাইতি তখন একের পর একটি সাক্ষীকে কাঠগড়ায় তুলে ঘটনা-পরম্পরা প্রতিষ্ঠিত করতে থাকেন। পাশের বাড়ির একজন ভদ্রলোক মধ্যরাত্রে ছন্দাকে তার মারুতি-সুজুকি গাড়ি চালিয়ে আলিপুরের বাড়ি থেকে রওনা হতে দেখেছে। রাত তখন বারোটা পঁয়ত্রিশ। সে ওদের অবাঙালী প্রতিবেশী। ত্রিদিবকে দীর্ঘদিন ধরে চেনে। ত্রিদিব যে সম্প্রতি একটি নার্সকে বিবাহ করেছে, তাও খবর রাখে। তার নাকি 'ইনসমনিয়া' আছে। রাত্রে ঘুম হয় না। ঘটনার রাত্রে সে বস্তুত জেগেই ছিল। তাই জানে, ঠিক একঘণ্টা পরে—রাত একটা পঁয়ত্রিশে ছন্দা মারুতি-সুজুকি গাড়িটা চালিয়ে ফিরে আসে।

বাসু লোকটাকে আদৌ জেরা না করায় কৌশিক বিস্মিত হল। নিম্নস্বরে বলল, লোকটাকে জেরা করলেন না, মামু?

—পণ্ডশ্রম! ওকে তোতাপাখির মতো সব কিছু শেখানো হয়েছে। ত্রিবিক্রম নারায়ণের আমদানী করা পেশাদার মিথ্যে সাক্ষী। ওকে জেরায় কব্জা করা যাবে না।

তারপর সাক্ষী দিতে এলেন আরও একজন অবাঙালী : যশপাল মাথুর। তাঁর একটি পেট্রোল পাম্প আছে। ডায়মণ্ড-হারবার রোডে। তিনি তাঁর সাক্ষ্যে জানালেন যে, ঘটনার দিন, রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ তিনি ক্যাশ মেলাচ্ছিলেন, এমন সময় একটা মারুতি-সুজুকি চালিয়ে একজন ভদ্রমহিলা ওঁর পেট্রোল-পাম্পের শেডের ভিতর ঢুকলেন। সচরাচর এসব উনি নজর করে দেখেন না; কিন্তু একটা বিশেষ কারণে উনি একটু বিস্মিত বোধ করেন। গাড়ি চালিয়ে যিনি প্রবেশ করলেন তিনি যুবতী—বাঙালী মহিলা, এবং

গাড়িতে আর কেউ নেই। এ জন্যই ঘড়ির দিকে তাঁর নজর পড়ে। রাত তখনো বারোটা বেজে তেতাল্লিশ। অত গভীর রাত্রে ঐ বয়সের একটি বাঙালী মহিলা একা ডায়মণ্ড-হারবার রোডে গাড়ি চালাচ্ছেন দেখেই উনি কৌতূহলী হয়ে পড়েন। সব কিছু খুঁটিয়ে দেখেন।

মাইতি প্রশ্ন করেন, সে ভদ্রমহিলা কি এখন আদালতকক্ষে আছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ঐ তো আসামীর কাঠগড়ায় চেয়ারে বসে* আছেন।

—তিনি কি পেট্রোল কিনতে এসেছিলেন?

লীডিং কোশ্চেন। হোক, বাসু আপত্তি করলেন না।

মাথুর বললেন, আজ্ঞে না। তাঁর গাড়িতে পিছনের ডানদিকের চাকাটায় একদম হাওয়া ছিল না। উনি হাওয়া নিতে এসেছিলেন।

—আপনি ওঁর গাড়ির চাকায় হাওয়া ভরে দিলেন?

—আজ্ঞে না। আমি নয়। রামবিলাস। আমার কর্মচারী।

মাথুর বর্ণনা করলেন: রামবিলাস প্রথমে জ্যাক দিয়ে গাড়ির পিছন দিকটা তুলল। চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া চাকাটা বার করে নিল। 'ডিক্' থেকে স্পেয়ার চাকাটা 'লাগ' খুলে বার করে এনে লাগালো। তারপর জ্যাক সরিয়ে নিতেই দেখা গেল—এ টায়ারটাও জখম। দ্রুত হাওয়া বের হয়ে যাচ্ছে। নজর হল, তাতে একটা পেরেক বিঁধে আছে। তাই আবার বাধ্য হয়ে জ্যাক লাগাতে হল। স্পেয়ার-টায়ার থেকে জখম-টিউবটা বার করে একটা নতুন টিউব দিতে হল। রামবিলাস জানতে চাইল, জখম টিউবটা উনি মেরামত করাতে চান কিনা। তার জবাবে মহিলা বলেন, অনেক রাত হয়ে গেছে। টিউবটা এখানেই থাক। পরদিন মেরামত করা টিউবটা উনি সংগ্রহ করে নিয়ে যাবেন। এই সময়ে মাথুর বেরিয়ে এসে বলেন, 'আপনার গাড়িতে আর স্পেয়ার টায়ার থাকল না কিন্তু ম্যাডাম। আবার যদি পাঙ্চার হয়…' জবাবে উনি বলেন, উনি বেশি দূরে যাবেন না। তারাতলায় যাচ্ছেন। এক কিলো-মিটারও হবে না। রামবিলাস একটা রসিদ ধরিয়ে দেয় টিউবটা রাখার জন্য। ভদ্রমহিলা যখন চলে যান তখন রাত ঠিক একটা।

কাঁটায়-কাঁটায়!

---

* ইতিপূর্বে কাঁটা-সিরিজে আদালতের বর্ণনায় আমি আসামী ও সাক্ষীদের চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখানোতে দু-একজন আইনজীবী আপত্তি করে আমাকে পত্রাঘাত করেন। তাই সবিনয়ে জানিয়ে রাখতে চাই এটা হয়তো আমার সজ্ঞান বিচ্যুতি। সব সভ্যদেশেই বিচারাধীন আসামীকে বসবার জন্য একখানা চেয়ার দেওয়া হয়। ভারতে হয় কি হয় না তা জজ-ম্যাজিস্ট্রেট-উকিলরা বলতে পারবেন, আমি জানি না। যদি না হয়, তাহলে ধরে নিন, আমার তরফে এটা একটা 'ভাইকেরিয়াস্ কার্টসি' মানে, ভদ্রতাবোধের তির্যক প্রকাশ।

বাসু জেরা করতে উঠে বললেন, মিস্টার মাথুর, আপনি ইতিপূর্বে বলেছেন, আসামী যখন আপনার পেট্রোল-পাম্প স্টেশানে ঢোকেন তখন রাত বারোটা বেজে তেতাল্লিশ। তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই।

—আপনার হাতঘড়ি মোতাবেক, না ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম?

—আমার ঘরে তিনটে ঘড়ি ছিল, স্যার। একটা ইলেকট্রিকাল দেওয়াল ঘড়ি, একটা টেবিল ক্লক, একটা রিস্ট-ওয়াচ। তিনটেতেই একই সময় দেয়। সে রাত্রেও দিচ্ছিল। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম।

—এবং ঐ ভদ্রমহিলা যখন আপনার দোকান থেকে বার হয়ে যান তখন রাত একটা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কাঁটায়-কাঁটায় একটা?

—পাঁচ-দশ সেকেণ্ড কম-বেশি হতে পারে।

—এই সময়কালের মধ্যে, বারোটা তেতাল্লিশ থেকে রাত একটা—এই সতের মিনিটকাল আসামী আপনার চোখের সামনে ছিলেন?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—মুহূর্তের জন্যেও আপনার দৃষ্টিপথের বাইরে যান নি?

—আজ্ঞে না।

—আপনি ওঁকে চিনতে ভুল করছেন না তো?

—তা কেন করব? না, নিশ্চয় করছি না।

—ওঁর মারুতি-সুজুকি গাড়ির নাম্বারটা আপনি জানেন?

—জানি। মানে, মনে নেই, লেখা আছে আমার দোকানে। কারণ টিউবটা উনি জমা রেখে যান। সচরাচর এক্ষেত্রে গাড়ির নম্বর আমরা লিখে রাখি।

—দ্যাটস্ অল, য়োর অনার।

পরবর্তী সাক্ষী ডাক্তার নবীন দত্ত। মাইতি-সাহেবের প্রশ্নোত্তরে তিনি বর্ণনা করে গেলেন: কীভাবে মধ্যরাত্রে বটুক ওঁকে টেনে তোলে, উনি এসে তার ঘরের ভিতর দিয়ে টর্চের আলোয় কমলেশের পা-খানা দেখতে পান। ইত্যাদি, প্রভৃতি। ইতিপূর্বে জবানবন্দিতে তিনি যা বলেছেন এবার হলফ্ নিয়ে তা আবার বলে গেলেন।

মাইতি প্রশ্ন করেন, বটুক মণ্ডল যখন আপনাকে ডাকতে আসে তার কিছু

আগে কি পাশের বাড়িতে টেলিফোন বাজার শব্দ আপনি শুনতে পেয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ, পেয়েছিলাম। আমি জেগেই ছিলাম বিছানায়।

—বটুক মণ্ডল যখন আপনাকে ডাকতে আসে রাত তখন কটা ?

—আমি ঘড়ি দেখিনি। আন্দাজ দেড়টা।

—তার কতক্ষণ আগে পাশের বাড়িতে টেলিফোন বাজে ?

—আন্দাজ দশ-পনের মিনিট হবে।

—টেলিফোন বাজার পর এবং বটুকবাবু আপনাকে ডাকতে আসার মাঝখানে যে দশ-পনের মিনিট সময় পার হয়ে যায় তার মধ্যে আপনি আর কোন শব্দ শুনেছিলেন কি ?

—হ্যাঁ, একটানা একটা মেকানিকাল যান্ত্রিক শব্দ।

—সেটা কিসের ?

—তা বলতে পারব না। আমার ধারণা হয়েছিল যে, মাঝেরহাট ব্রীজের তলা দিয়ে কোনও ইঞ্জিন না-থেমে হুইসিল বাজাতে বাজাতে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু পরে জেনেছি, রাত একটা থেকে দেড়টার মধ্যে ঐ রকম কোন ইঞ্জিন মাঝেরহাট ব্রীজের তলা দিয়ে যায়নি। তাই আমার ধারণা : ডায়মণ্ড-হারবার রোডে বা তারাতলা রোডে কোনও মোটার-কার-এর হর্নে শর্ট-সার্কিট হয়ে একটানা শব্দ হয়েছিল। অথবা দূর দিয়ে একটা দমকল যাচ্ছিল।

—ঐ একটানা শব্দটা কতক্ষণ হয়েছিল ?

—এক থেকে দেড় মিনিট।

—ওটা টেলিফোনের আওয়াজ নয় ?

—নিশ্চয় না। টেলিফোনের শব্দ অমন একটানা হয় না।

—পাশের বাড়ির ডোরবেল নয় ?

—খুব সম্ভবত নয়। ডোর-বেল বাজালে কেউ সচরাচর ওভাবে পুরো এক মিনিট পুশ-বটন্ চেপে ধরে থাকে না। বিশেষ রাত একটার সময়। একবার বাজে, একবার থামে।

—সচরাচর করে না। কিন্তু যদি 'পুশবটন' চেপে ধরে থাকে, তাহলে তো শব্দটা ঐ রকমই হবে ?

—হতে পারে। কিন্তু হলফ্ নিয়ে আমি বলতে পারব না ওটা 'ডোরবেল'-এর শব্দ।

—তা তো কেউ বলাতে চাইছে না। হতে পারে কি না সেই সম্ভাবনার কথাই তো জানতে চাইছি।

—তা পারে।

বাসু জেরায় প্রশ্ন করলেন, ওটা যে ইঞ্জিনের শব্দ নয়, এটা সাক্ষী কেমন করে জানালেন। ডক্টর দত্ত জানালেন, তিনি স্বয়ং মাঝেরহাট স্টেশানে গিয়ে অ্যাসিস্টেন্ট স্টেশান্ মাস্টারকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেন। খুনের মামলায় ওঁকে সাক্ষী দিতে হবে শুনে এ. এস. এম খাতা খুলে ওঁকে দেখিয়ে দেন

ঘটনার রাত্রে ঐ সময় কোনও এঞ্জিন—কী আপ, কী ডাউন—মাঝেরহাট স্টেশান দিয়ে যায়নি।

পরবর্তী সাক্ষী বটুক মণ্ডল। পি. পির প্রশ্নের উত্তরে সে যা দেখেছে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে গেল: তার প্রথমবারের জবানবন্দির সঙ্গে বর্তমান এজাহারে বস্তুত কোন প্রভেদ হল না। মাইতি ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বটুকের ঘর থেকে টর্চ ফেল্‌ল মা-সন্তোষী অ্যাপার্টমেণ্টের সদর দরজাটা দেখতে পাওয়া যায় কি না।

—আজ্ঞে, তা যায়।

—তাহলে কে কলিং-বেল বাজাচ্ছে দেখবার জন্য তুমি সেদিকে টর্চের আলো ফেলনি?

বটুক ঢোক গিল্‌ল? তার গলকণ্ঠটা বার কতক ওঠা-নামা করল। আড়চোখে সে বাসু-সাহেবের দিকে তাকিয়ে দেখল। বাসু-সাহেব তখন সামনের দিকে ঝুঁকে এসেছেন। জ্বলন্ত এক-জোড়া চোখে তাকিয়ে আছেন বটুকের দিকে। বটুক আমতা-আমতা করল···

—কী হল? জবাব দাও? তুমি ওদিকে টর্চের আলো ফেলেছিলে কি?

—না। ও-বাগে ফোকাস করিনি। হল তো?

—তোমার কৌতূহল হল না? জানতে, যে—কে এতরাত্রে 'কলবেল' বাজাচ্ছে পাশের বাড়িতে?

—না হয়নি। তাছাড়া পাশের বাড়িতে কেউ 'কলবেল' বাজাচ্ছিল তা তো আমি বলিনি?'

—পুলিসের কাছে প্রথম যে এজাহার দিয়েছিলে···

—সে সব কথা ছাড়ান দ্যান, হুজুর। এই কাঠগড়ায় ডাঁইরে আমি ও-কথা বলিনি। ঐ কলিংবেলের কথা···

—তুমি বলনি যে, যে সময় ঝগড়া-মারামারি হচ্ছিল তখন একটানা একটা কলিংবেলের শব্দ হচ্ছিল?

—আজ্ঞে না। একটানা 'একটা শব্দ হচ্ছিল' বলিচি। তবে সেটা কলিংবেলের কি না, জানি না। রেল-ইঞ্জিনের হতে পারে। মটোর-গাড়ির হর্ন অমন পাগলামি করে মাঝে-মধ্যে—তাও হতে পারে। আর, হ্যাঁ, দমকলের পাগলাঘণ্টিও হতে পারে···

—তুমি শুনলে না, ডক্টর নবীন দত্ত বললেন যে, উনি মাঝেরহাট স্টেশনে গিয়ে এ. এস. এম-এর কাছে জেনে এসেছেন, সে সময় মাঝেরহাট ব্রীজের তলা দিয়ে কোন এঞ্জিন যাচ্ছিল না। শোননি?

বটুক রুখে ওঠে, আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনিচি। কিন্তু তার সত্যি-মিথ্যে আমি জানি না, হুজুর। ঐ শোনা কথায় ভিত্তিতে আমি হলপ নিয়ে কিছু বললে ঐ উনি জেরায় আমাকে ছিঁড়ে খাবেন।

বাসু-সাহেবকে সে দিতে দেখায়।

মাইতি বললেন, দ্যাটস্ অল, য়োর অনার।

বাসু এবার উঠলেন জেরা করতে। প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, বটুকবাবু, তোমার পানের দোকানে তাকের উপর একটা জ্যাজ কোম্পানির অ্যালার্ম-ক্লক আছে, তাই না? মা-কালীর পটখানার ঠিক ডান-বাগে?

মাইতি আপত্তি জানালেন: অবান্ত প্রশ্ন, এই অজুহাতে।

বাসু আদালতকে আশ্বস্ত করলেন যে, প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা তিনি অচিরেই প্রতিষ্ঠা করবেন। ফলে বিচারক সাক্ষীকে অনুমতি দিলেন প্রশ্নের জবাবটা দিতে। বটুক বলল, কোন্ কোম্পানির ঘড়ি তা বলতে পারব না, হুজুর, তবে হ্যাঁ, একটা ঘণ্টা-ঘড়ি আছে। বাবার আমল থেকে। ঐ আমার পানের দোকানে। ঠিকই বলেছেন, মা-কালীর পটের ডান বাগে।

—সেটা তুমি মাঝে-মধ্যে দম দিয়ে বাজাও নিশ্চয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বাজাই বইকি! ভোর রেতে কোথাও যাবার দরকার হলে।

—ওটার শব্দ কেমন? টেলিফোনের মতো থেমে থেমে—'ক্রিরিং-ক্রিং—ক্রিরিং-ক্রিং'? নাকি দমকলের ঘণ্টার মতো একটানা 'ঠঙাঠঙ-ঠঙাঠঙ-ঠঙাঠঙ'?

বটুক জবাব দিল না, কী যেন ভাবছে সে।

—কী হল? জবাব দাও। কী ভাবছ?

—আজ্ঞে ঐ-কথাই ভাবছি। রেতের বেলা কি তাহ'লে দোকান ঘরে আমার ঘড়িটাই বাজছিল?

—তুমি কি ওটাতে অ্যালার্ম দম দিয়েছিলে? ঐ দিন রাত একটায়?

—আজ্ঞে না।

—তাহলে তোমার ঘড়ি বাজবে কী করে?

বটুক জবাব দিল না।

—এবার তুমি এই ফটোটা দেখ তো। কমলেশের টেবিলে যে অ্যালার্ম-ক্লকটা দেখা যাচ্ছে, এটা কি তোমার পানের দোকানের ঘড়িটার মতো?

সাক্ষী ছবিটা দেখে নিয়ে নিজে থেকেই আত্মজিজ্ঞাসা করল, সে-রাতে কি তাইলে এই ঘড়িটাই একটানা বেজে চলেছিল? তোই শুনিচি?

বাসু বিচারকের দিকে ফিরে বললেন, প্রতিবাদীপক্ষ থেকে পুনরায় দাবী করা হচ্ছে, য়োর অনার! কমলেশের ঘর থেকে অপসারিত ঘড়িটি আদালতে উপস্থাপিত করা হক। বর্তমান সাক্ষী প্রসিকিউশান-তরফের। সে সন্দেহ প্রকাশ করেছে যে, সে এই ঘড়ির শব্দই ঘটনার রাত্রে শুনে থাকবে। এ-ক্ষেত্রে বাদীপক্ষ ঘড়িটি আদালতে নিয়ে আসুন। তাঁদের তরফের সাক্ষীকে সে ঘড়ির অ্যালার্মটা শুনিয়ে দিন। প্রতিবাদী পক্ষ জানতে ইচ্ছুক ঐ অ্যালাম-ঘড়ির শব্দ শোনার পর সাক্ষীর স্মৃতি কী বলে।

বিচারক মাইতির দিকে ফিরে বলেন, আপনার নিশ্চয় আর কোন আপত্তি নেই?

মাইতি তড়াক করে উঠে দাঁড়ান: কী বলছেন ধর্মাবতার? প্রচণ্ড

আপত্তি আছে। ঘড়িটা আমারা এখনি আদালতে আনতে চাই না। এভাবে বাসু-সাহেব প্যাঁচে ফেলে আমাদের বাধ্য করতে পারেন না···

বিচারক তাঁর কাঠের হাতুড়িটা টেবিলে ঠুকলেন। দৃঢ়স্বরে বললেন, মিস্টার পি. পি! আপনি বসুন! আপনার ভাষা অনুমোদনযোগ্য নয়। প্রতিবাদী পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে বাদী পক্ষের 'সীজ'-করা একটা বিশেষ দ্রব্য আদালতে উপস্থাপিত করা হোক। এ দাবী ইতিপূর্বেই ডিফেন্স-কাউন্সেল দু-দুবার পেশ করেছিলেন এবং আমি তখন তা নাকচ করে দিই। বর্তমানে বাদীপক্ষের সাক্ষী স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে বলছেন যে, হয়তো তিনি ঐ পুলিসের সীজ করা ঘড়ির আওয়াজটাই শুনেছেন। এক্ষেত্রে বর্তমানে আদালত মনে করছেন যে, প্রতিবাদীর দাবী যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং এখন আমি জানতে চাইছি : মৃত কমলেশের ঘর থেকে অধিকৃত ঐ অ্যালার্ম-ক্লকটি কোথায় আছে?

মাইতি জবাব দিলেন না। অবাধ্য ছাত্রের মতো গোঁজ হয়ে বসে রইলেন।

ভাদুড়ী পুনরায় বলেন, মিস্টার পি. পি.। আমি আপনাকেই জিজ্ঞাসা করছি। কমলেশের ঘর থেকে 'সীজ' করা ঘড়িটি কোথায়?

এবার মাইতি বললেন, পেশকারবাবুর কাছে জমা আছে।

বিচারকের আদেশে পেশকারবাবু অ্যালার্ম-ক্লকটি এনে জজ-সাহেবের টেবিলের উপর রাখলেন। জজ-সাহেব সেটা নেড়ে-চেড়ে দেখলেন। মাইতি-সাহেবকে প্রশ্ন করেন, এইটাই সেই আইডেণ্টিকাল অ্যালার্ম-ক্লক?

মাইতি বললেন, ওর গায়ে লেবেলেই তো সে কথা লেখা আছে।

বিচারক কী একটা বলা বলতে গিয়েও বললেন না। ঘড়ির গায়ে লেবেল আঁটা কাগজটা পড়ে দেখে বললেন, হ্যাঁ এটাই সেই ঘড়ি। বাইশে জুন রাত্রে মা-সন্তোষী অ্যাপার্টমেন্ট থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে।

ঘড়িটি বিচারক বাসু-সাহেবের হাতে দিলেন। বাসু বলেন, ধরে নিচ্ছি যে, আপনি আমাকে এটা ব্যবহারের অনুমতি দিচ্ছেন। দম দিতে বা বাজাতে?

বিচারক পাবলিক প্রসিকিউটারের দিকে দৃকপাত করে দেখলেন। কিন্তু মাইতি তখনো স্বাভাবিক হাতে পারেননি।

বিচারক বললেন, আদালতের নির্দেশেই বাদীপক্ষ তাঁদের 'সীজ'-করা ঘড়িটি আদালতে উপস্থাপিত করেছেন। আপনি প্রতিবাদীর পক্ষ থেকে এটি বাজিয়ে প্রসিকিউশানের সাক্ষীকে শোনাতে চাইছেন। আমি আপত্তির কোন কারণ দেখছি না। পি. পি.-র যদি কোনও আপত্তির কারণ থাকে তবে তাঁকে তা এখনি জানাতে হবে।

মাইতি তাঁর চেয়ারে প্রস্তরমূর্তির মতো নিশ্চল বসে রইলেন।

বাসু হাত বাড়িয়ে ঘড়িটি নিলেন। সেটি বটুকের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, বটুকবাবু, তুমি লক্ষ্য করে দেখ, অ্যালার্ম-কাঁটাটা একটার ঘরে ঘরে আছে। তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই আছে বটে। ঠিক একটার ঘরে।

—আরও লক্ষ্য করে দেখ বটুকবাবু, 'অ্যালার্ম'-দম' শেষ হয়ে গেছে। মানে বর্তমানে অ্যালার্ম-দম দেওয়া নেই।

মাইতি এতক্ষণে বলে ওঠেন, বিস্ময়কর তথ্য! শুধু অ্যালার্ম কেন? ঘড়িটাও তো দম না পেয়ে বন্ধ হয়ে গেছে পুলিসের গুদামঘরে।

বিচারক বলেন, অবান্তর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বাসু-সাহেবকে বলেন, আপনি কি অ্যালার্ম ঘড়িটা বাজিয়ে শোনাতে চান?

—ইয়েস, য়োর অনার। আমি প্রথমে ফুরিয়ে যাওয়া অ্যালার্ম দমটা দেব। তারপর মিনিটের কাঁটাখানা ধীরে-ধীরে ঘোরাতে থাকব, কারণ আমি দেখতে চাই শেষ বার অ্যালার্মটা কটার সময় বেজে শেষ হয়েছিল। অর্থাৎ ঠিক কটার সময় মিনিটের কাঁটাটা পৌঁছলে অ্যালার্ম বাজতে শুরু করে। আর তখনই আমি সাক্ষীর মতামতটা শুনতে চাই। ঘটনার রাত্রে নিজের ঘর থেকে সে এই ঘড়ির অ্যালার্ম-এর আওয়াজটাই শুনেছিল কি না।

বিচারক বললেন, আপনি তা করতে পারেন। মিস্টার পি. পি. আপনি এখানে এগিয়ে এসে কাছাকাছি দাঁড়াতে পারেন। বাদীর পক্ষ থেকে সবকিছু নজরদারক করতে পারেন।

মাইতি দৃঢ়স্বরে বললেন, পি. কে. বাসু-সাহেবের এ-জাতের হাত-সাফাই আমার অনেক দেখা আছে। আদালত যখন অনুমতি দিয়েছেন তখন তিনি আবার ভানুমতীর খেল দেখান। আমার তা দেখবার উৎসাহ নেই।

চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, মিস্টার পি. পি.! আপনি অবহিত আছেন কি না জানি না, আপনার আচার এবং কথাবার্তা কিন্তু আদালত-অবমাননার সীমান্তের কাছাকাছি এসে গেছে। আপনাকে আমি 'অ্যাডমনিশ' করছি! ফর দ্য লাস্ট টাইম!

হঠাৎ এদিকে ফিরে বাসুকে বলেন, ইয়েস কাউন্সেল, আপনি যে পরীক্ষাটা করতে চান এবার শুরু করুন।

পি. কে. বাসু এগিয়ে এলেন। এখন তিনিই আদালতকক্ষের মধ্যমণি। অহেতুক—সম্ভবত নাটকীয় ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে, অথবা মাইতির ঈর্ষা-অগ্নিতে সমিধ্-নিক্ষেপমানসে—বিচারককে একটি ম্যাজিশিয়ানি 'বাও' করলেন। তারপর ঘড়িতে 'অ্যালার্ম' দম' দিলেন। ধীরে ধীরে মিনিটের কাঁটাটা ঘোরাতে শুরু করলেন। কাঁটা যখন বারোটা আঠান্ন মিনিটে পৌঁছালো তখনই ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠল ঘড়িটা।

যেন অপ্রত্যাশিত একটা সাফল্যলাভ করেছেন! বাসু-সাহেব টেবিল-ঘড়িটা ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের বেঞ্চ-এ রেখে নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বসলেন। মিনিট-খানেক বেজে ঘড়িটা থামল।

বাসু উঠে দাঁড়ালেন। সাক্ষীকে বললেন, বটুকবাবু, এবার বল, তুমি যে একটানা শব্দটা শুনেছিলে তা কি রেল-ইঞ্জিনের হুইসিল? নাকি মটোর-

গাড়ির শর্ট-সার্কিট হয়ে যাওয়া হর্ণ, অথবা দমকলের একটানা ঠনাঠন, কিংবা…

কথাটা তাঁর শেষ হল না। বটুক বলে উঠল : ঐ ঘড়িটা!

—কী ঐ ঘড়িটা ?

—ঐ ঘড়ির 'ঠনাঠন'-শব্দটা আমি শুনেচি হুজুর!

—তুমি নিঃসন্দেহ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, নিয্যস নিঃসন্দেহ!

—তুমি হলপ নিয়ে এ-কথা বলছ কিন্তু!

—জানি হুজুর। মিছে কথা বললে আপনি আমারে ডোরাকাটা হাফপ্যাণ্ট পরাবেন, গলায় তক্তি ঝোলাবেন, পানাসাজা ছেড়ে আমারে মাটি কোপাতে হবে! সব, স-ব কথা—মনে আছে হুজুর। আমি নিয্যস ঐ ঘড়িটার ঠনাঠন-ঠনাঠন শুনেছিলাম! সেদিন রেতের বেলা!

—তোমার মনে কোনও সন্দেহ নেই ?

—তিলমাত্র নয়।

—তাহলে ঐ ঠনাঠনটা তুমি শুনেছিলে রাত ঠিক একটা বেজে তিন-এ ?

—আজ্ঞে না। একটা বাজতে দুইয়ে। বারোটা আটান্ন-মিনিটে!

—সে তো ঐ অ্যালার্ম-ঘড়ির টাইমে। কিন্তু শুনলে না, ইন্সপেক্টর মুখার্জি সাহেব এক্সপার্ট ওপিনিয়ান দিয়ে গেলেন ঐ অ্যালার্ম-ঘড়িটা পাঁচ মিনিট স্লো ছিল ; তার মানে অ্যালার্মটা বেজেছিল একটা বেজে তিন এ ?

—ও হ্যাঁ। তা বটে। ঘড়িটে পাঁচ-মিনিট শোলো ছিল।

বাসু-সাহেব বিচারকের দিকে কিরে বললেন, দ্যাট্স্ অল, য়োর অনার।

বিচারক নিরঞ্জন মাইতির দিকে ফিরে বলেন : এনি রি-ডাইরেক্ট ?

মাইতি মাথা নেড়ে অস্বীকার করেন।

বাসু বিচারককে বলেন, ইতিপূর্বে ডক্টর নবীন দত্তকে ঐ অ্যালার্ম ক্লক সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করা যায়নি, কারণ তখনো সেটা আদালতে উপস্থিত করা হয়নি। আমি আর একবার বাদীপক্ষের ঐ সাক্ষীকে কাঠগড়ায় তোলার জন্য আর্জি জানাচ্ছি।

বিচারক বললেন, বর্তমান অবস্থায় এটা অনুমোদনযোগ্য।

ডক্টর দত্ত পুনরায় কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়ালেন। বাসু জানতে চান, আপনি কি অ্যালার্ম-ঘড়ির শব্দটা শুনেছেন ?

—হ্যাঁ, শুনেছি।

—আপনার কি মনে হয় ঘটনার রাত্রে আপনি যে একটানা শব্দটা শুনেছেন তা ঐ ঘড়ির অ্যালার্ম ?

—খুব সম্ভবত তাই। 'নিশ্চিত তাই' বলতে পারছি না।

—আপনি পেশায় চিকিৎসক। মনস্তত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। তাই জানতে চাইছি : কোন ঘুমন্ত ব্যক্তির নাগালের মধ্যে যদি মাঝ রাতে অ্যালার্ম-ক্লক বেজে ওঠে তাহলে সে কি প্রতিবর্তী প্রেরণায় ঘুম ভেঙেই ঘড়িটা বন্ধ করে

দেয় না ?

মাইতি আপত্তি করেন : অ্যাগর্মেনটেটিভ। কনক্লুশান।

বিচারক আপত্তিকে নাকচ করেন। সাক্ষী একজন বিশেষজ্ঞ। এ-জাতীয় প্রশ্নের সুচিন্তিত জবাব দেবার শিক্ষা তাঁর আছে। সাইকলজি ওঁর অধীতবিদ্যা।

—ওয়েল ডক্টর দত্ত. আনসার দ্যাট কোশ্চেন।

—হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। ঘুম ভেঙে উঠেই প্রতিবর্তী-প্রেরণায় সে হাত বাড়িয়ে অ্যালার্মটা বন্ধ করে দেয়। বিশেষ মধ্যরাত্রে।

—বর্তমান ক্ষেত্রে যদি প্রমাণিত হয় যে, আপনি ও বটুকবাবু ঐ অ্যালার্ম ক্লকের শব্দটাই শুনেছেন. তাহলে কী কারণে কমলেশ সেটা বন্ধ করে দেননি ? আপনার কী অনুমান ?

—অবজেকশান য়োর অনার! এ প্রশ্নটা শারীরবিদ্যা সংক্রান্ত নয়, সাক্ষীর অধীত-বিদ্যার অন্তর্গত নয়। বিশেষজ্ঞ হিসাবে তার অনুমান নির্ভর জবাব উনি দিতে পারেন না। এটা ক্রিমিনোলজির প্রশ্ন, শারীর বিদ্যার নয়।

—অবজেকশান সাসটেইন্ড!

বাসু একগাল হেসে বললেন, এবার তাহলে প্রসিকিউশান ইন্সপেক্টর মুখার্জিকে আর একবার কাঠগড়ায় তুলুন। সহযোগী তো তাঁকে ইতিপূর্বেই ক্রিমিনোলজির এক্সপার্ট হিসাবে দাবী করেছেন। আমরা তাঁর কাছেই ঐ প্রশ্নটার জবাব শুনি বরং। একটা বেজে তিন-মিনিটে কমলেশ কেন অ্যালার্মটা বন্ধ করতে পারেনি! কেন ঘড়িটা দম শেষ হওয়া পর্যন্ত একটানা বেজে গেল।

ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব ঘড়ি দেখে বললেন, রিসেস-এর সময় হয়ে গেছে। নেক্সট সেসনে ইন্সপেক্টার মুখার্জির ক্রস শুরু হবে। আপাতত আদালত মুলতুবি থাকছে; কোর্ট ইজ অ্যাডজর্নড!

॥ আঠার ॥



রাত্রে ডাইনিং-টেবিলে ওরা 'চারজন' খেতে বসেছিলেন। আহার-পর্ব শেষ হয়েছে। এখন খোশগল্প চলছে। রানু আদালতে যান না। যেতে পারেন না। অথচ তাঁর কৌতূহল অনন্ত। বাকি তিনজনের কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু শোনেন।

কৌশিক বলল, মামু প্রায় জাল গুটিয়ে এনেছেন। বাদী-পক্ষের দু দুজন সাক্ষী স্বীকার করেছে যে, তারা রাত একটা বেজে তিন মিনিটে কমলেশের ঘরে অ্যালার্ম-ক্লকটা বাজতে শুনেছে। কমলেশ সেটা হাত বাড়িয়ে থামিয়ে দেয়নি। তার মানে, তার আগেই সে আহত হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় ভূতলশায়ী!

স্নানু জানতে চান, তাতেই বা কী সুবিধা হল ?

—তাতে প্রমাণ হল ঃ রাত একটা বেজে তিন মিনিটের আগে কমলেশের মাথায় আঘাতটা লেগেছিল। অথচ পেট্রোল-পাম্পের ম্যানেজার মাথুরের জবানবন্দী অনুসারে ছন্দা রাত একটা পর্যন্ত ওঁর দোকানে ছিল। মাত্র তিন মিনিটের ভিতর ছন্দার পক্ষে এক কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে, গাড়ি পার্ক করে, দ্বিতলে উঠে কমলেশের সঙ্গে ঝগড়া শেষ করে তাকে হত্যা করা অসম্ভব। ফলে হত্যাকারী ছন্দা ছাড়া আর কেউ !

বাসু বললেন, অত তাড়াহুড়া কর না, কৌশিক। এখনো নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়নি যে, ডোরবেল কেউ বাজায়নি। ডাক্তার ব্যানার্জি ধরা পড়লেই তাকে স্বীকার করতে হবে যে, ডোরবেলটা সেই বাজিয়েছিল। ওদিকে ছন্দা এজাহার দিয়ে বসে আছে যে, সে নিজে ঐ ঘরে ঢোকেনি। কলিংবেলটা বাজিয়েছিল সে নিজেই…

—তা বটে।

বাসু বলেন, সুজাতা, হোটেল তাজ-বেঙ্গলে একটা ফোন কর তো ? মিস্টার ত্রিবিক্রম রাও অব নাসিককে তাঁর ঘরে পাও কি না দেখ। রুম সেভেন হাণ্ড্রেড অ্যাণ্ড ফিফ্‌টিন।

অচিরেই যোগাযোগ হল। রাশভারী গলায় ত্রিবিক্রম ইংরেজিতে জানতে চাইলেন, কে কথা বলছেন ?

সুজাতা বললে, প্লীজ হোল্ড অন, স্যার। মিস্টার পি. কে. বাসু, বার-অ্যাট-ল, আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

—অল রাইট !

বাসু টেলিফোনটা নিয়ে বললেন, গুড-ইভনিং মিস্টার রাও।

—হ্যাঁ, শুভ-সন্ধ্যা। বলুন ? কীভাবে আপনার খিদমৎ করতে পারি।

—আপনি আদালতে ছিলেন লক্ষ্য করেছি। কখন উঠে গেলেন টের পাইনি।

—এটা তো ভূমিকা। মূল বক্তব্য ? সেটায় সরাসরি এলে দুজনেরই সময় সংক্ষেপ হয়।

—অল্‌ রাইট। আমার মক্কেল আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন পেশ করতে ইচ্ছুক।

—করুক না ! এতো ভাল কথা। তবে সে-কথা আমাকে কেন ?

—তার স্বামী বর্তমানে কোথায় আছে তা আমরা জানি না, তাই নোটিস্‌টা সার্ভ করা যাচ্ছে না।

—ভা—রি দুঃখের কথা। আমি এ বিষয়ে আপনাকে বা আপনার মক্কেলকে সাহায্য করতে পারি এ-কথা কেন ধরে নিলেন ?

—এই কারণে যে, আমার বিশ্বাস ঃ আপনি আপনার পুত্রের বর্তমান ঠিকানা জানেন, এবং বিবাহ-বিচ্ছেদটা চাইছেন। আমার ধারণাটা ভুল হলে আমি মক্কেলের তরফে কলকাতা-দিল্লি-বোম্বাইয়ের সব খানদানি খবরের

কাগজে বিজ্ঞাপন দেব। সেটাও 'লীগ্যালি ভ্যালিড নোটিস্'। ঘরের কেচ্ছা খবরের কাগজে বিস্তারিত ছাপতে আমার প্রচুর খরচ পড়বে—তবে সেটা আমার লোকসান নয়, 'অ্যালিমনি'র ভিতর সে খরচও না হয় ধরে দেওয়া যাবে ; কিন্তু আপনার খানদান যেভাবে খান খান হয়ে যাবে তা আর জোড়া লাগবে না, রাও-সাহেব।

—কী পরিমাণ 'অ্যালিমনি' চেয়েছে আপনার মক্কেল ?

—সে-কথা তো আপনার কপর্দকহীন পুত্রের সঙ্গে। আপনি তো লীগ্যালি থার্ড-পার্টি। তাই নয় ?

—অল রাইট ! কাল সকাল দশটায় এই হোটেলে, এই ঘরে যেন আদালতের লোক নোটিসটা সার্ভ করে যায়। আপনার মক্কেলের স্বামী তখন এখানে থাকবে।

—থ্যাঙ্কু অ্যান্ড গুড নাইট।

* * *

হত্যা-মামলার দিন পড়েছে পনের দিন পরে কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার দিন আগামী সপ্তাহেই। ছন্দা জামিন পায়নি। এদিকে ডক্টর ব্যানার্জি এখনো নিরুদ্দেশ। জবা হয় সত্য কথা বলছে, অথবা অত্যন্ত দৃঢ় চরিত্রের মেয়ে। সে স্বীকার করেনি—এমনকি জনান্তিকেও, বাসু-সাহেবের কাছে যে, ঐ 'অপারেশন অ্যাবডাক্শান'টা বাস্তবে অলীক—ডাক্তার-নার্সের যৌথ পরিকল্পনা।

বিবাহ-বিচ্ছেদের নোটিস্টা ত্রিদিবকে সার্ভ করা গেছে। নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে সে উপস্থিত ছিল। স্বাক্ষর করে নোটিস্টা সে গ্রহণ করেছে। দেখা গেল, বাপ-বেটা দুজনাই এটা চাইছেন। বাপ তো বটেই—ঐ 'নি-খানদানী' নার্স-মেয়েটি, যে অন্যপূর্বা। সে বাড়ি-থেকে পালিয়ে একজনের সঙ্গে বস্তিতে বাস করেছে, ফলস্ ডেথ-সার্টিফিকেটের জোরে ইন্সিওরেন্স-এর টাকা আদায় করেছে এবং সম্ভবত প্রথম স্বামীকে হত্যা করেছে—তাকে তাঁর হাবেলীতে কোন মতেই প্রবেশ করতে দিতে পারেন না। অপরপক্ষে বর্তমান অবস্থায় বিবাহ-বিচ্ছেদটা মঞ্জুর হয়ে গেলে, ছন্দার ফাঁসিই হোক অথবা দ্বীপান্তর—তাঁর শক্তাবৎ খানদান অক্ষত থাকবে। এজন্য তিনি এক কথায় দশ লক্ষ টাকা খরচ করতে প্রস্তুত।

দুটো অসুবিধা ছিল। এক নম্বর : ত্রিদিব বেঁকে বসতে পারত। ত্রিবিক্রম ভাগ্যবান। তা হল না। যে কোন কারণেই হোক, ত্রিদিব 'প্রডিগাল সান'-এর চরিত্রটা অভিনয় করতে আগ্রহী। ছন্দার মোহমুক্ত হয়ে সে বাপের কক্ষপুটে ফিরে যেতে চায়। দ্বিতীয় আপত্তি : বাসু-সাহেব যে-কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদটা চাইছেন—'নিষ্ঠুরতা'। ওটা মেনে নেওয়া চলে না। সহস্রাধিকাল ধরে কোন শক্তাবৎ রাজপুরুষ ধর্মপত্নীর প্রতি নিষ্ঠুর হয়নি।

সুতরাং ত্রিবিক্রম বোম্বাই থেকে উড়িয়ে আনলেন একজন ব্যারিস্টারকে—এল. জি. নটরাজন, বার-অ্যাট-ল। ত্রিবিক্রম জানতেন, ওঁরা দুজন—নটরাজন

এবং বাসু—একই বছরে ব্যারিস্টার হয়েছিলেন, চল্লিশ বছর আগে। একই বছরে একই চেম্বার থেকে।

নটরাজনকে উনি বললেন, আপনি বাসু-সাহেবের সঙ্গে দরাদরি করুন। উনি আপনার ক্লাস-ফ্রেন্ড। পারলে, আপনিই পারবেন।

নটরাজন জানতে চান, আপনি মাক্সিমাম কত অ্যালিমনি দেবেন?

ত্রিবিক্রম মাথা নেড়ে বলেন, আপনি আমার প্রস্তাবটা কিছুই বুঝতে পারেন নি। টাকার প্রশ্ন আদৌ উঠছে না। দশ লক্ষ পুরোই দেব। প্রয়োজনে ওটা বেড়ে পনের হলেও ক্ষতি নেই; কিন্তু ঐ কারণটা দেখানো চলবে না: নিষ্ঠুরতা। হেতুটা হোক দুজনের মতের মিল হচ্ছে না—জীবনদর্শনে ফারাক।

—এই গ্রাউণ্ডে কি বিবাহবিচ্ছেদ মঞ্জুর হবে?

—হবে। সে দায়িত্ব আমার। তবে পি. কে. বাসু বাগড়া দিলে হবে না।

—আচ্ছা, দেখি আমি কী করতে পারি।

* * *

নটরাজন টেলিফোন করলেন বাসুকে। বাসু উচ্ছ্বসিত। দুই বন্ধুতে অনেক-অনেকদিন পর সাক্ষাৎ হল। প্রায় ত্রিশ বছর। বাসু এক কথায় রাজি। ত্রিদিব যদি 'অপোজিশান' না দেয়, তাহলে বিচারককে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা যাবে। সত্যিই তো। দুজনের জীবনদর্শনে আসমান-জমিন ফারাক! মিউচুয়াল ডিভোর্স হলেও হতে পারে।

বাসু নটরাজনকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করলেন। নটরাজন বললেন, ভালয়-ভালয় বিবাহ-বিচ্ছেদটা মিটে গেলে নিশ্চয় ডিনারে আসব। এখন ওটা দৃষ্টি-কটু দেখাবে।

বাসু জানতে চান, ছন্দা রাওয়ের মামলায় তোমার কোনও ভূমিকা নেই?

—তুমি ভুল করছ, বাসু। মামলার আসামী আগামী সপ্তাহ থেকে আর ছন্দা 'রাও' থাকবে না। বিশ্বাস কর, ওটা 'বিশ্বাস' হয়ে যাবে।

নটরাজন জানতে চান, শুনেছি তুমি কোন মক্কেলের কেস নাও না যতক্ষণ না তুমি নিজে বিশ্বাস কর যে, সে নির্দোষ। কথাটা সত্যি?

—এ বদনাম বোম্বাইয়েও রটেছে?

—তার মানে অভিযোগটা তুমি মেনে নিচ্ছ। এবং তার মানে তোমার বিশ্বাস: ঐ কমলেশ বিশ্বাসকে ছন্দা হত্যা করেনি।

—হ্যাঁ, তাই।

—কী যুক্তিতে?

—একটি মাত্র যুক্তি। 'কে' হত্যা করেছে, 'কেন' হত্যা করেছে, 'কী করে' হত্যা করেছে তা আমি জানি। প্রমাণ করতে পারছিলাম না।

—'পারছিলাম না'। মানে অতীতকাল। এখন পার?

—এখন পারি। যদি তুমি আমাকে সাহায্য কর।

—আমি? আমি কী ভাবে সাহায্য করব?

—পরামর্শ দিয়ে। বাধা না দিয়ে।

—আমার 'প্রফেশানাল এথিক্সে' না আটকালে আমি নিশ্চয় সাহায্য করব। বল, কী করতে হবে?

—পরশু, শুক্রবার, আমি তোমার মক্কেলের একটা 'ডিপজিশান' নিতে চাই। এই বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলার বিষয়েই। তার ভিতর থেকেই অপরাধী চিহ্নিত হবে। তুমি জান কি জান-না আমার জানা নেই, ত্রিদিব প্রথমে আমার কাছেই এসেছিল, তার স্ত্রীর তরফে আমাকে 'রিটেইন' করতে।

—হ্যাঁ, আমি শুনেছি সে-কথা।

—তখন সে আমাকে কতকগুলো 'ক্লু' দিয়ে যায়। যার সাহায্যে আমি কেসটার সমাধানে পৌঁছেছি, আসল হত্যাকারীকে চিহ্নিত করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রকৃত অপরাধী চিহ্নিত করলেও আমি অকাট্য প্রমাণগুলি সংগ্রহ করতে পারিনি। সে সুযোগলাভের আগেই পুলিস ত্রিদিবকে আমার নাগালের বাইরে নিয়ে যায়। আর তার দেখা পাইনি।

—অল রাইট। কোথায় তুমি ডিপজিশানটা নিতে চাও?

—তুমি কোথায় উঠেছ?

—ঐ তাজ বেঙ্গলেই। পাঁচের-একুশ নম্বর ঘরে।

—তাহলে ঐ ঘরেই হতে পারে। পরশু, শুক্রবার বেলা দুটোয় একটি-শর্ত। ঘরে আমরা মাত্র চারজন থাকব: তুমি, আমি, ত্রিদিব আর স্টেনোগ্রাফার।

—অল রাইট। কিন্তু ত্রিবিক্রম কেন থাকবেন না?

—ত্রিদিব ওর দাম্পত্যজীবনের জটিলতা সম্বন্ধে এমন কিছু বলেছিল যেকথা ত্রিবিক্রমের না শোনাই মঙ্গল। এটিকেটে বাধে। তুমি তাঁকে বুঝিয়ে বল।

—বলব।

* * *

শুক্রবার, রাত আটটা। বাসু-সাহেব তাঁর চেম্বারে বসে কী যেন করছিলেন। ইণ্টারকমটা বেজে উঠল। তুলে নিয়ে বললেল, বল রানু?

—উনি এসে গেছেন।

—ঠিক আছে। তাঁকে পাঠিয়ে দাও।

একটু পরেই ঘরের ফ্লাশ-পাল্লাটা খুলে গেল। নিখুঁত থ্রিপিস্ স্যুট-ধারী ত্রিবিক্রম নারায়ণ রাও প্রবেশ করলেন ঘরে। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, গুড ইভনিং। ব্যারিস্টার সাহেব।

—ওয়েলকাম, স্যার। বসুন ঐ ডিভানটায়; কিন্তু আপনি একা যে? আমি তো নটরাজনকেও প্রত্যাশা করছিলাম।

—না। তিনি বোম্বাই ফিরে গেছেন, ইভনিং ফ্লাইটে।

—সে কী! বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার ফয়শালা না হতেই?

ত্রিবিক্রম ইতিমধ্যে আসন গ্রহণ করেছেন। বললেন, মিস্টার নটরাজন তো যাবার আগে বলে গেলেন আপনি আর আপনার মক্কেল রাজি হয়েছেন হেতুটা পরিবর্তন করতে, অর্থাৎ 'নিষ্ঠুরতা-র পরিবর্তে 'ম্যাল্অ্যাডজাস্টমেণ্ট'

—বাকিটা তো জাস্ট ফর্মালিটি।

বাসু তাঁর ড্রয়ার খুলে একটা সিগার-এর বাক্স বার করে এগিয়ে দিলেন : চলবে ?

—নো থ্যাংকস্। আই স্টিক টু মাই ওন ব্র্যাণ্ড।

বাসু পাইপ ধরালেন। ত্রিবিক্রমও ধরালেন নিজের ব্র্যাণ্ডের সিগার।

বাসু বলেন, বিবাহ-বিচ্ছেদের সঙ্গে এ ক্ষেত্রে আরও একটা জিনিস যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকবে সে-কথা নটরাজন আপনাকে কিছু বলে যায়নি ?

—বলে গেছেন। অ্যালিমনি। তার অ্যামাউন্টটা অবশ্য বলে যাননি। সেটা আমাকেই সেট্ল্ করতে পরামর্শ দিয়ে গেছেন। জোকিংলি বললেন—'ওটা নেহাৎই দরাদরি। আপনি ব্যবসায়ী মানুষ, ওটা নিজেই ম্যানেজ করে নেবেন।' তো বলুন স্যার, আপনার মক্কেল কী পরিমাণ ড্যামেজ চাইছেন ?

—'ড্যামেজ' কেন বলছেন ? 'ড্যামেজ' ক্লেম করে এম্প্লয়ী। নিগৃহীত প্রতিবেশী। অন্যায়ভাবে আহত ব্যক্তি। এটা তো শুধু 'ড্যামেজ' নয়। মানি-সেট্ল্মেণ্ট। স্বামী-স্ত্রীর যৌথ সম্পত্তির বিভাজন।

—সেক্ষেত্রে আপনার মক্কেলকে তো খালি হাতে ফিরে যেতে হবে মিস্টার বাসু। আপনি তো ভালভাবেই জানেন যে, আপনার মক্কেলের স্বামী কপর্দকশূন্য। আপনার ভাষায় : ওয়াইফকে খাওয়া-পরার যোগান দিতে আপনার মক্কেলের হাজবেণ্ড তার বাপের কাছে হাত পাতে। আর আমি লোকটা তো থার্ড-পার্টি ! কী বলেন ?

—কারেক্ট ! ভেরি কারেক্ট ! ওর স্বামীর যদি নিজস্ব বলতে কিছু না থাকে তাহলে অ্যালিমানির প্রশ্নই ওঠে না। বাই দ্য ওয়ে, নটরাজন কি আপনাকে জানিয়ে গেছে, আজ দুপুরে তার মক্কেল, আই মীন, আমার মক্কেলের স্বামী, কী জাতের ডিপজিশান দিয়েছে ?

—না। নটরাজন বললেন, প্রথমত আমি তাঁর মক্কেল নই, থার্ডপার্টি। দ্বিতীয়ত, আমার পুত্র ও পুত্রবধূর মনোমালিন্যের হেতু নির্ধারণে আপনারা দুই ব্যারিস্টার মিলে ত্রিদিবের যে জবানবন্দি নিয়েছেন তার 'ডিটেইল্স্' জানা আমার পক্ষে অশোভন, এটিকেটে বারণ।

—নটরাজন ঠিক কথাই বলেছে। তার মক্কেলের গোপন কথা সে কাউকে জানাতে পারে না, এমনকি মক্কেলের বাবাকেও নয়। কিন্তু আমি পারি। কারণ ত্রিদিব আমার মক্কেল নয়। ইন ফ্যাক্ট, আমি আপনাকে তা জানাব বলেই এই অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করেছি।

ত্রিবিক্রম সহাস্যে বললেন, সরি স্যার ! আপনি জানতে রাজি হলেই তো চলবে না। আমি জানতে রাজি কিনা সেটাও বিচার্য ! ইন ফ্যাক্ট, আয়াম নট ইণ্টারেস্টেড।

বাসু শ্রাগ করলেন : ইট্স্ য়োর প্রিভিলেজ ! না শুনতে চাইলে আমিই বা কেন জোর করে শোনাব ? তবে আমার অবস্থাটা হয়েছে সেই

'প্রভার্বিয়াল ভবম-হাজাম'-এর মতো ! একজনকে না শোনানো পর্যন্ত আমার ফাঁপা-পেট স্বাভাবিক হবে না। আপনি শুনতে না চাইলে আমাকে কাল একটি প্রেস-কন্‌ফারেন্স ডেকে সব খবরের কাগজকে এই মুখরোচক কিস্‌সাটি শোনাতে হবে।

ত্রিবিক্রমের ভ্রূকুঞ্চন হল। 'মুখরোচক কিস্‌সা' মানে ?

—বলতেই তো চাই, কিন্তু আপনি যে আবার নন-ইন্টারেস্টেড।

ত্রিবিক্রম পাঁচ-সেকেন্ড কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, লেট্‌স বি সিরিয়াস, ব্যারিস্টার-সাহেব। আপনি কী কারণে আমাকে জোর করে ওদের দাম্পত্যজীবনের কথা শোনাতে চাইছেন ?

বাসু গম্ভীর হয়ে বললেন, প্রথম কথা : আপনার পুত্র আর পুত্রবধূর যৌন-জীবনের কথা এর মধ্যে আদৌ নেই। দ্বিতীয় কথা, ওদের দাম্পত্য-জীবনের জটিলতার যে আলোচনা হয়েছে তা শ্বশুর হিসাবে আপনার শোনার মধ্যে কোনও অশোভনতা নেই। তৃতীয় কথা, এই 'ডিপজিশান'-এর কথাটা জানতে না পারলে, আমি আমার মক্কেলের তরফে টাকাটা আদায় করতে পারব না।

—টাকা ! কোন টাকা ? কিসের টাকা ?

—'ঘুষ' নয়, ন্যায্য পাওনা—তাকে ড্যামেজ, অ্যালিমানি, মানি-সেট্‌ল্‌মেন্ট আপনি যে নামে ইচ্ছা অভিহিত করুন।

—আপনি এখনো আশা করেন, আমি আপনাকে অথবা আপনার মক্কেলকে একটা নয়া পয়সাও দেব ?

—ইয়েস্ স্যার ! আমি তো ইতিপূর্বেই আপনাকে বলেছিলাম, এ কেস হারলে সান্ত্বনা থাকবে যে, বিনা পারিশ্রমিকে এক নিষ্ঠুর ধনকুবেরের বিরুদ্ধে তাঁর অসহায়া পুত্রবধূর পক্ষ নিয়ে লড়েছি; আর এ কেস জিতলে আপনি ঐ চেয়ারে বসে আমার দাবীমতো টাকাটা মিটিয়ে দেবেন ! আমার ফী, আর আমার মক্কেলের খেশারদ !

ত্রিবিক্রম হাসলেন। বললেন, তর্কের খাতিরে ধরা যাক, আমি আপনার মক্কেলকে 'হাফ-আ-মিলিয়ান' দিলাম—কিন্তু সেটা নিয়ে সে কী করবে ? ফাঁসি না হলেও ওর দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড হবেই।

—আপনি তাই আশা করেন ?

—করি। কারণ আপনার এবং মিস্টার মাইতির ধারণাটা ভুল। ত্রিদিব এবং আপনার মক্কেলের বিবাহ 'নাল্-অ্যান্ড-ভয়েড' না হওয়া সত্ত্বেও ত্রিদিব আদালতে উঠে সাক্ষী দিতে পারবে !

—এভিডেন্স অ্যাক্ট-এর সেকশান 122 তে যে প্রভিশান্স আছে তৎসত্ত্বেও ?

—ইয়েস স্যার ! তা সত্ত্বেও ! আইন বলছে, স্বামী বা স্ত্রী তার 'স্পাউস'-এর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে পারবে না **regarding any communication made by one party to the other during their valid married life.**"

বাসু-সাহেব স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন তাঁর প্রতিপক্ষের দিকে। তারপর জানতে চাইলেন, এ-কথা কে বলেছে আপনাকে? নটরাজন?

—ইয়েস্ স্যার।

হাসলেন বাসু। বললেন, নটরাজন ইজ এ জুয়েল অব এ সলিসিটার। রেফারেন্সটা আপনাকে দিয়ে যায়নি? 'রাম ভরোসে ভার্সেস স্টেট?

ভ্রূকুঞ্চন হল ত্রিবিক্রমের। বললেন, সেটা কী?

—ডায়েরীতে লিখে নিন বরং 'রামভরোসে ভার্সেস স্টেট—এ. আই. আর 1954, সেকশান 704'। সুপ্রীম কোর্ট-এর ডিভিশান বেঞ্চ বলেছেন, **"The Protetcion under Sec 122 applies only to communications between the partners and not to acts."** তার মানেঃ ত্রিদিব আদালতে বলতে পারবে না এমন কোন গোপন কথা, যা বিশ্বাস করে ছন্দা তার স্বামীকে বলেছিল, যদি আদৌ কিছু বলে থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তো সব কিছুই 'facts'—ত্রিদিবের হট-চকলেটে স্লিপিং ট্যাবলেট মেশানো, রাত্রে 'গৃহত্যাগ' করা, ইত্যাদি প্রভৃতি। সব কিছুই ত্রিদিবের প্রত্যক্ষ জ্ঞানে। শোনা কথা নয়। তাই নয়?

ত্রিবিক্রম কী বলবেন ভেবে পেলেন না।

বাসুই পুনরায় বলেন, শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত হল রাও-সাহেব? আপনার পুত্রের 'ডিপজিশান'টা আপনাকে শোনাব, না প্রেস-কনফারেন্স ডেকে?

ত্রিবিক্রম মনস্থির করলেন, অল রাইট। শোনান আমাকেই।

ইণ্টারকমের মাউথপীসটা তুলে নিয়ে বাসু বললেন, রানু, তুমি ঐ ডিপজিশানের টাইপকরা কাগজগুলো নিয়ে কাইণ্ডলি এ-ঘরে আসবে?

একটু পরেই ইনভ্যালিড চেয়ারে পাক মেরে রানু এঘরে এলেন। বাসু তাঁকে বললেন, আজ আফটারনুনে মিস্টার ত্রিদিব নারায়ণ রাও যে ডিপজিশান দিয়েছেন তা ওঁকে পড়ে শোনাও। প্রশ্ন এবং উত্তর।

রানু চশমাজোড়া নাকে চড়ালেন। টাইপকরা কাগজগুলো তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে পড়তে শুরু করেন—

প্রশ্নঃ আপনার নাম শ্রীত্রিদিব নারায়ণ রাও?

উত্তরঃ ইয়েস, স্যার।

প্রশ্নঃ আপনার স্ত্রীর নাম শ্রীমতী ছন্দা রাও?

উত্তরঃ ইয়েস।

প্রশ্নঃ আপনি কি জানেন যে, আপনার স্ত্রী আপনার বিরুদ্ধে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করেছেন, যার শুনানী হবে আগামী সোমবার?

উত্তরঃ হ্যাঁ, শুনেছি সে-কথা।

প্রশ্নঃ এবং জানেন যে, আপনার স্ত্রীর অভিযোগের মূল বক্তব্য হচ্ছে স্বামী হিসাবে আপনার নিষ্ঠুরতা?

উত্তরঃ নিষ্ঠুরতা! কই সে-কথা তো কেউ বলেনি?

প্রশ্ন ঃ 'বলার' কী আছে ? 'ডিভোর্স' পিটিশানটা তো আপনিই সই করে নিয়েছিলেন। পড়ে দেখেননি ?

উত্তর ঃ না, ড্যাডি বললেন, ও তোমাকে দেখতে হবে না। বলে, তিনি কাগজখানা কেড়ে নিলেন। নিষ্ঠুরতা ? ছন্দা বলেছে ঃ আমি নিষ্ঠুর ?

রানু দেবী টাইপ করা পাতা-ওল্টাবার অবকাশে তাকিয়ে দেখলেন বাণিজ্য-চুম্বকটির দিকে। তিনি প্রস্তরমূর্তির মতো নির্বাক-নিস্পন্দ বসে আছেন ডিভান-এ। যেন একটা ঐতিহাসিক নাটকের ডায়ালগ শুনছেন। রানু আবার শুরু করেন—

প্রশ্ন ঃ হ্যাঁ, আপনার বিরুদ্ধে আপনার স্ত্রীর অভিযোগ ঃ নিষ্ঠুরতার। আপনি পড়ে দেখেননি, তাই জানেন না—আপনার নিষ্ঠুরতার অনেকগুলি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। যেমন ধরুন, 'কমলেশ হত্যা'-কেস-এ আপনি পুলিসের কাছে গিয়ে মিথ্যা অভিযোগ দিয়েছেন···

উত্তর ঃ কিন্তু মিথ্যা অভিযোগ তো আমি করিনি। সত্যি কথাই বলেছি।

প্রশ্ন ঃ এ কথা জেনেও যে, সেজন্য আপনার স্ত্রীর ফাঁসি হয়ে যেতে পারে ?

উত্তর ঃ তার আমরা কী করতে পারি ? সে তার কৃতকর্মের ফলভোগ করবে। কোন শক্তাবৎ রাজপুত স্ত্রীকে বাঁচাতে মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে না। আমাদের হাজার বছরের ইতিহাসে তাই বলে।

প্রশ্ন ঃ তার মানে, আপনি এখনো ঐ মত পোষণ করেন ? ঐ হত্যা মামলার আসামী ছন্দা রাও দোষী ?

উত্তর ঃ নিশ্চয় করি।

প্রশ্ন ঃ কোন্ যুক্তিতে ? কেন আপনার মতে ছন্দা রাও হত্যাকারী ?

উত্তর ঃ অসংখ্য যুক্তিতে। ও আমাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিল। আমি ঘুমিয়ে পড়েছি ভেবে সে মধ্যরাত্রে তার প্রথম স্বামীর কাছে যায়। তাকে হত্যা করে। না-হলে সে আমার স্ত্রী থাকতে পারে না। আমার ড্যাডির কোটি-কোটি টাকার সম্পত্তির ওয়ারিশ হতে পারে না। তাই সে কমলেশকে খুন করে নিঃশব্দে পালিয়ে আসে। জামা-কাপড় পাল্টে গুটি গুটি আমার পাশে খাটে উঠে শুয়ে পড়ে ? এসব মিথ্যা কথা ?

প্রশ্ন ঃ মিস্টার রাও, প্রশ্ন আমি করব। আপনি শুধু জবাব দেবেন। 'ডিপজিশন'-এ সেটাই কানুন।

উত্তর ঃ আর কী জানতে চান ?

প্রশ্ন ঃ আপনি পরদিন সকালে যখন আমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করতে আসেন তখন আমি জানতে চেয়েছিলাম, 'তুমি কি আমার বাড়ি চিনতে ?' জবাবে আপনি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, চিনতাম।' তখন আমি জানতে চেয়েছিলাম, 'কী ভাবে ?' তার জবাবে আপনি কী বলেছিলেন তা আপনার মনে আছে ?

উত্তর ঃ না নেই। কী বলেছিলাম ? তাছাড়া আপনি এখন আমাকে

'আপনি' বলে কথা বলছেন কেন? আগে তো 'তুমি'ই বলতেন?

প্রশ্ন: বেশ, আবার না হয় 'তুমি'ই বলছি। আমার ঐ প্রশ্নের জবাবে তুমি বলেছিলে "সরি, স্যার। ঠিক বলতে পারব না। স্বীকারই করি—আমি ডক্টর ব্যানার্জি'র নার্সিং-হোমে ভর্তি হয়েছিলাম মানসিক রোগী হিসাবে। সব সময় সব কথা আমি মনে করতে পারি না।"

উত্তর: হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে। আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ কথাই আমি বলেছিলাম বটে।

প্রশ্ন: এখন কি মনে পড়ছে? কীভাবে ঘটনার পরদিন সাত সকালে ঠিকানা জানা না-থাকা সত্ত্বেও তুমি আমার বাড়িতে গাড়ি ড্রাইভ করে চলে আসতে পেরেছিলে?

উত্তর: না, মনে পড়ছে না।

প্রশ্ন: আমি তোমাকে একটু সাহায্য করি, কেমন? দেখ, মনে পড়ে কিনা। তার আগে দু-একটা কথা বলি। প্রথম কথা: তোমার ড্যাড চাইছেন যে, এই বিবাহবিচ্ছেদটা যতশীঘ্র সম্ভব অনুমোদিত হয়ে থাক। তুমিও তাই চাইছ, শুনেছি। কিন্তু তোমার স্বনামধন্য পিতৃদেব ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন যে, বিবাহবিচ্ছেদের হেতুটা যেন 'নিষ্ঠুরতা' না হয়। হেতুটা যেন 'সমঝোতায় অভাব' বলে খাতাপত্রে লেখা থাকে। তাহলে তোমাদের শক্তাবৎ খানদান অক্ষত থাকবে। সেজন্যই এই 'ডিপজিশান' নেওয়া হচ্ছে। তোমার স্বার্থ দেখবার জন্য তোমার ড্যাডি এই ব্যারিস্টার নটরাজনকে নিয়োগ করেছেন। তুমি যদি এখন আমার কাছে সব সত্যি কথা স্বীকার কর—তোমার নিজের ক্ষতি না করে—তাহলে আমি চেষ্টা করব যাতে হেতুটা 'নিষ্ঠুরতা'র পরিবর্তে 'দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য' হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। আমি কী বলছি তুমি বুঝতে পারছ?

উত্তর: না-বোঝার কী আছে? বুঝছি।

প্রশ্ন: এবার বলি: তুমি সেই সাত-সকালে আমার বাড়ি চিনে আসতে পেরেছিলে এই কারণে যে, তার পূর্বদিন শুক্রবার তোমার স্ত্রী যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে তখন তুমি তাকে অনুসরণ করে এসেছিলে। তুমি নিজের গাড়িতে আসনি—যাতে ছন্দা' গাড়ির নম্বর দেখে না চিনতে পারে, বুঝে ফেলতে পারে। তাই এসেছিলে একটা ভাড়া করা জীপ চেপে। তোমার চোখে ছিল সানগ্লাস, মুখে ফল্‌স্‌ দাড়ি ছোলায় একটা বাইনোকুলার···তাই নয়?

উত্তর: আপনি কেমন করে জানলেন?

প্রশ্ন: আমি জানি। জানি তোমার মূল উদ্দেশ্য ছিল তদন্ত করে দেখা: তোমার স্ত্রী দ্বিচারিণী কি না। কারণ হাজার-বছর ধরে কোনও শক্তাবৎ রাঠোর রাজপুত্র কখনো দ্বিচারিণীকে সহ্য করেনি। সহস্তে সেই অসতীর শিরশ্ছেদ করেছে। তাই নয়?

উত্তর: হ্যাঁ, তাই। আপনি ঠিকই বলছেন।

বাসু ঃ এবং ঐ একই উদ্দেশ্যে তুমি তোমার সদ্য-পরিণীতা ধর্মপত্নীর হাত-বটুয়া হাৎড়ে…

ত্রিদিব ঃ কোন্ উদ্দেশ্যের কথা বলছেন, স্যার ?

বাসু ঃ তোমার তো একটাই উদ্দেশ্য ছিল, ত্রিদিব। সাচ্চা রাঠোর রাজপুতের যা লক্ষ্য ঃ স্ত্রী দ্বিচারিণী কি না সমঝে নেওয়া !…সেই উদ্দেশ্যেই তুমি তোমার সহধর্মিণীর হাতব্যাগ হাৎড়ে কমলেশ বিশ্বাসের টেলিগ্রামখানা দেখতে পেয়েছিলে। আন্দাজ করেছিলে ঃ সে হচ্ছে ছন্দার প্রথমপক্ষের স্বামী।

ত্রিদিব ঃ কিন্তু আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে, ওদের ডিভোর্স হয়ে যায়নি। ওরা এখনো স্বামী -স্ত্রী। বিশ্বাস করুন, স্যার !

বাসু ঃ তা তুমি কেমন করে আন্দাজ করবে, ত্রিদিব ? এক স্বামী জীবিত থাকতে কেউ দ্বিতীয়বার বিবাহ করে ?

ত্রিদিব ঃ আপনিই বলুন, স্যার !

বাসু ঃ আর সেই জন্যেই যখন সেই শনিবার রাত বারোটা পঁয়ত্রিশে ছন্দা তার মারুতি-সুজুকি গাড়িটা নিয়ে রওনা হয়, তখন তুমি তাকে অনুসরণ করেছিলে। তোমার অ্যাম্বাসাডারে…তাই নয় ?

ত্রিদিব ঃ আজ্ঞে না, আমি তো তখন ডক্টর ব্যানার্জির বাড়িতে ফোন করেছিলাম ?

বাসু ঃ আমার মনে আছে। গদাধর টেলিফোনে জানালো যে, ডাক্তারবাবুও গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন। তাতেই তো তোমার সন্দেহ হল যে, ওরা দুজনে যুক্তি করে কমলেশকে হত্যা করতে গেছে।

ত্রিদিব ঃ না হলে ছন্দার ব্যাগে রিভলবার আসবে কোত্থেকে ? আপনিই বলুন।

বাসু ঃ কারেক্ট। তুমি অবশ্য তখনো জানতে না যে, রিভলবারটা ডক্টর ব্যানার্জির !

ত্রিদিব ঃ না স্যার, জানতাম। আগের দিনই টেলিফোনে ওদের কথাবার্তা আমি আড়ি পেতে শুনেছিলাম। তাতেই তো আমি জানতাম ঃ খুনটা ডক্টর ব্যানার্জিই করেছে—সেই হচ্ছে ছন্দার আসল ল্যাভার—কমলেশ বিশ্বাস নয় ! আমি সেদিনই আপনাকে বলিনি যে, খুনটা করেছে ঐ ব্যানার্জিই—আর সে পরস্ত্রীর পেটিকোটের আড়ালে মুখ লুকাতে চাইছে ? আমি জানতাম, ছন্দা খুনটা করেনি, করতে পারে না—চাবিটা ঐ ঘরের মেজেতে ফেলে এসে সে মিথ্যা খুনের দায়ে জড়িয়ে পড়েছে…

বাসু ঃ আই রিমেম্বার ! এ-কথা তুমি সে-দিনই বলেছিলে ! আর সে জন্যই গদাধর যখন বলল যে, ডক্টর ব্যানার্জি বাড়িতে নেই ঠিক তখনই তুমি স্থির করলে ঃ স্ত্রীকে ফলো করা দরকার !

ত্রিদিব ঃ না স্যার, ঠিক তখনই নয়। তার অনেক আগেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, ছন্দা যদি আমাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে রাত্রে কোথাও অভিসারে যেতে চায়, তাহলে তাকে আমি ফলো করব।

বাসু ঃ আমি তা তো জানিই।

ত্রিদিব ঃ আপনিও তাও আন্দাজ করেছিলেন ? কেমন করে ?

বাসু ঃ না হলে ছন্দার মারুতি-সুজুকি গাড়ির পিছন দিকের ডান-চাকায় অমন চোরা-লীক হবে কেমন করে ? আমি জানতাম—ওটা তুমিই করেছিলে। যাতে ছন্দা তড়িঘড়ি রওনা হলেও তোমার ফলো করতে অসুবিধা না হয়।

ত্রিদিব ঃ এটা কী করে বলছেন, স্যার ? টায়ার-পাঙ্চার তো অ্যাক্সি-ডেণ্টালিও হতে পারে ?

বাসু ঃ পারে। যে-চাকা পথের ঘর্ষণে নিত্য ক্ষয়িত হচ্ছে তা পাঙ্চার হতেই পারে। কিন্তু যে-চাকা জমি থেকে দুই-ফুট উচুতে ডিক-এর বর্মে নিরাপদে সুরক্ষিত, তাতে অ্যাক্সিডেণ্টালি তো একটা পেরেক ফুটতে পারে না। পারে ?

ত্রিদিব ঃ মানে ?

বাসু ঃ আরে বাপু, 'মানে'টা তুমিও জানো, আমিও জানি। ঐ স্পেয়ার টায়ারে একটা পেরেক ঢুকিয়ে চোরা 'লীক' তৈরী করতে পার একমাত্র তুমিই। কারণ ছন্দা ছাড়া ঐ গাড়ির চাবি শুধুমাত্র তোমার কাছেই ছিল। ছন্দা তো আর নিজের গাড়ির স্পেয়ার-টায়ারে পেরেক পুঁতে রাখবে না। ফলে ওটা তোমার কীর্তি। তুমি এমন ব্যবস্থা করেছিলে যে, ছন্দা মাঝ রাতে হঠাৎ কোথাও অভিসারে গেলে অন্ততপক্ষে দশ-পনের মিনিট সময় তোমাকে দিতে বাধ্য হবে দু-দুবার 'লীক' সারাতে। তবে হ্যাঁ, এর মধ্যে দোষের কিছু নেই। তোমার মূল উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। সাচ্চা রাঠোর শক্তাবৎ রাজপুতের মতো। শুধু সমঝে নেওয়া ঃ স্ত্রী দ্বিচারিণী কি না !

ত্রিদিব ঃ আপনিই বলুন, স্যার। আর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে আমার ?

বাসু ঃ কারেক্ট। স্রেফ রাজপুত শিভাল্রি !...তুমি যে টেলিফোন করার পর নিজের অ্যাম্বাসাডার বার করে ওকে 'ফলো' করেছিলে এটা বুঝতে আমার কোন অসুবিধা হয়নি।

ত্রিদিব ঃ কী করে বুঝলেন ?

বাসু ঃ যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত ঃ দেখ। ছন্দা বলেছে—গাড়িটা বার করে তারাতলামুখো যাবার আগে সে গ্যারেজের স্লাইডিং ডোরটা টেনে তালাবন্ধ করে দিয়ে গেছিল। তুমিও বলেছিলে জানলা দিয়ে দেখতে পাও ডবল্-পাল্লা স্লাইডিং ডোরটা সে টেনে বন্ধ করে। নবতাল তালা লাগায়। তুমি বলেছিলে, ফিরে এসে ছন্দা তোমাদের ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে নবতাল-তালাটা খোলে, স্লাইডিং-ডোরটা সরায়। তাই নয় ?

ত্রিদিব ঃ হ্যাঁ, তাই। কারণ, ওর নিজের চাবির সেট তো তখন তাল্লা তলায় পড়ে আছে।

বাসু ঃ তাই যদি হয়, তাহলে শুতে যাবার আগে, গ্যারেজের পাল্লা সে

টেনে বন্ধ করেনি কেন ?

ত্রিদিব ঃ আপনিই বলুন ?

বাসু ঃ একমাত্র যুক্তি ঃ ইতিমধ্যে অ্যাম্বাসাডার গাড়িটা কেউ বার করেছিল এবং ছন্দা ফিরে আসার আগে দ্বিতীয়বার ঢুকিয়েছিল। তবে তাড়াহুড়ায় অ্যাম্বাসাডার-গাড়িটা যথেষ্ট ভিতরে ঢুকিয়ে 'পার্ক' করেনি। সে জন্যই ঐ গাড়ির বাম্পারে স্লাইডিং-ডোরটা আট্‌কে যাচ্ছিল। ছন্দা তাই স্লাইডিং ডোরটা বন্ধ করতে পারেনি। নবতাল-তালা লাগানোর প্রশ্নই ওঠেনি।

ত্রিদিব ঃ কে ?…কে ? অ্যাম্বাসাডার গাড়িটা বার করবে ? ঢোকাবে ?

বাসু ঃ একমাত্র তুমিই তা পারতে। তুমিই তা করেছিলে। যেহেতু সাচ্চা শন্তাবতের মতো তুমি জানতে চেয়েছিলে তোমার স্ত্রী দ্বিচারিণী কিনা। কী ? ঠিক বলছি তো ?

ত্রিদিব ঃ হ্যাঁ, ঠিকই বলছেন ! আমি স্বচক্ষে দেখেছি, ছন্দা ঐ গ্যালভানাইজড পাইপটা ঘুরিয়ে কমলেশের মাথায় মারল। বিশ্বাস করতে পারেন ? আমি সে-কথা পুলিসকে বলিনি। কাউকে বলিনি। কিন্তু নিজের চোখে আমি তা দেখেছি।

বাসু ঃ আমি তো তা জানিই !

ত্রিদিব ঃ তাও জানেন আপনি ! অসম্ভব ! কী জানেন ?

বাসু ঃ বল্‌ছি। শোন ! মিলিয়ে নাও ! ছন্দা রওনা হবার পর তুমি ডাক্তার ব্যানার্জিকে একটা ফোন কর। কারণ তুমি জানতে তোমার হাতে যথেষ্ট সময় আছে। ছন্দাকে দু-দুবার চাকা বদলাতে হবে। দু-দুবার টিউবে হাওয়া ভরতে হবে। ডাক্তার ব্যানার্জিও তাঁর বাড়িতে নেই শুনে তুমি ধরে নিয়েছিলে ওরা দুজনে মিলে তারাতলায় গেছে। তাই তুমি সোজা তারাতলার—মা-সন্তোষী অ্যাপার্টমেণ্টে চলে যাও। ছন্দা চাকায় হাওয়া-ভরে সেখানে পৌঁছানোর অনেক আগেই তুমি পৌঁছাও। পুলিসটা পরে যে-ভাবে ঢুকেছিল সেই ভাবে ভারা বেয়ে মেজানাইন-উচ্চতায় উঠে জানলার ফোকর বেয়ে ভিতরে ঢুকে লুকিয়ে বসে থাক। একটু পরে কমলেশের টেলিফোনটা বাজে। কমলেশ জেগেই ছিল। টেলিফোনে কথা বলে…

ত্রিদিব ঃ কী-কথা বলুন তো ?

বাসু ঃ ফোন করেছিল ওর এক পাওনাদার। ও তাকে জানায় ছন্দা রাও ওকে পরদিনই দু-হাজার টাকা দেবে। তা থেকে কমলেশ তার ধার কিছুটা শোধ করবে।

ত্রিদিব ঃ আজ্ঞে না ! ভুল হল আপনার ! ধার নয়। ওর আর এক প্রাক্তন শ্যালক ফোন করেছিল। কমলেশ যে-টাকা চুরি করেছে তাই উশুল করতে চাইছিল। বুঝলেন ?

বাসু ঃ তাহলে তাই হবে। মোটকথা একটু পরে ছন্দা এসে কলবেল বজায়। কমলেশ নিচে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। ওরা দুজনে উপরে উঠে

আসে। দু-জনে কথা কাটাকাটি থেকে ঝগড়া করছিল। তুমি আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিলে। কমলেশ বিশ্বাস দু-হাজার টাকা চাইছিল, আর ছন্দা বলছিল অত টাকা ওর কাছে নেই! কমলেশ তা বিশ্বাস করে না, সে-একটা অশ্লীল গালাগাল দিয়ে ওর হাত চেপে ধরে।

ত্রিদিব ঃ কারেক্ট! তখন আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। আপনি তো জানেনই, আমার ধমনীতে শক্তাবৎ রাঠোর রাজপুতের রক্ত।

বাসু ঃ তাহলে তুমি ঝাঁপিয়ে পড়ে কমলেশের চেয়ারে একটা ঘুসি মারলে না কেন? 'ঢিসম্' করে! অমিতাভ বচ্চনের মতো?

ত্রিদিব ঃ মারতামই তো! কিন্তু ওদের দু-জনের হেপাজতেই আছে রিভলবার—আমি নিরস্ত্র! আমি দেখলাম, ওরা দুজনে মারামারি করছে! ছন্দা এক ধাক্কা মেরে তার হাতটা ছাড়িয়ে নিল। সেই ধাক্কাতে একটা কাচের গ্লাস ঝন্‌ঝনিয়ে ভেঙে পড়ল। এই সময় কমলেশ কী করল জানেন?

বাসু ঃ জানি। দু-হাত বাড়িয়ে ছন্দার গলা টিপে ধরতে গেল।

ত্রিদিব ঃ কারেক্ট! তখনই ছন্দা একটা জলের পাইপ তুলে নিয়ে এলো-পাতাড়ি ঘোরাতে থাকে। পাইপটা দ্রাম করে গিয়ে লাগে কমলেশের মাথায়। ও পড়ে যায়। ঠিক তখনি আমি হাত বাড়িয়ে সুইচটা অফ্ করে দিই।

বাসু ঃ আই নো! কিন্তু কমলেশের আঘাতটা মারাত্মক ছিল না। পাঁচ-সেকেণ্ড বাদেই সে উঠে বসতে চাইল!

ত্রিদিব ঃ একজাক্টলি! রাস্তার আলো পড়েছিল ঐখানে। আমি স্পষ্ট দেখলাম—ও হিপ-পকেটে হাত চালিয়ে দিয়েছে। তার মানেটা বুঝেছেন, স্যার?

বাসু ঃ জলের মতো পরিষ্কার! ওর হিপ্-পকেটে ছিল রিভলবারটা! তাই তো? তাহলে তুমি যা করেছিলে তা সমর্থনযোগ্য। ওটা তো আত্ম-রক্ষার্থে! না হলে কমলেশই গুলি করে মারত। তাই না?

ত্রিদিব ঃ বলুন, স্যার! আমার অন্যায়টা কী হল? আমি ছন্দার ফেলে যাওয়া জলের পাইপটা তুলে নিয়ে ঐ শয়তানটার মাথার পিছন দিকে অ্যাইসা এক বাড়ি ঝাড়লাম যে, ওর ভবলীলা খতম!

বাসু ঃ বুঝলাম। তারপর তুমি ছন্দাকে নাম ধরে ডাকলে না কেন?

ত্রিদিব ঃ আমার ধারণা ছিল ছন্দার জন্য ডক্টর ব্যানার্জি নিচে অপেক্ষা করছে। সেটা সত্যি কি না তাই দেখতে চাইলাম! নিচে হঠাৎ কলবেল' বেজে ওঠায় আমার সন্দেহ বেড়ে যায়। তারপর আমার হঠাৎ আতঙ্ক হয়—যে লোকটা 'কলবেল' বাজাচ্ছে সে যদি পুলিস হয়! তাই আমি তৎক্ষণাৎ ভারা বেয়ে নিচে এলাম। দেখলাম, একটা লোক আমার আগে আগে ভারা বেয়ে নিচে নামছে। সে দৌড়ে গিয়ে একটা মটোর-সাইকেলে, উঠে পালিয়ে যায়।

বাসু ঃ তুমিও গাড়িতে উঠে বাড়ি ফিরে এসেছিলে, কেমন? কিন্তু তোমার হাতে সময় ছিল কম। তাই তাড়াহুড়ো করে গাড়িটা পার্ক করে

স্লাইডিং-ডোর টেনে দেবার সময় পাওনি। তালা লাগাবার প্রশ্নই ওঠেনি।

ত্রিদিব : কারণ আমি জানতাম দু-তিন মিনিটের মধ্যেই ছন্দা এসে পৌঁছাবে। তাড়াহুড়ায় অ্যাম্বসাডার গাড়িটা আমি ঠিক মতো পার্ক করতে পারিনি। তাই ছন্দা স্লাইডিং-ডোরটা বন্ধ করতে পারেনি।

বাসু : তুমি সব কথাই বলেছ ত্রিদিব, কিন্তু একটা কথা এখনো বলনি!

ত্রিদিব : কী কথা ?

বাসু : পরদিন সকালে, যখন ছন্দা অঘোরে ঘুমাচ্ছে আর তুমি আমার কাছে আসবে বলে মনস্থির করলে তখন তুমি পকেট হাৎড়ে দেখতে পেলে—তোমার চাবির থোকাটা নেই! আগের দিন রাত্রে কমলেশের ফ্ল্যাটে যখন পকেট থেকে দেশলাই বার করছিলে তখন অসাবধানে তোমার চাবির থোকাটা পড়ে গেছে! যেহেতু তারাতলায় পৌঁছে কমলেশের ফ্ল্যাটে যাওয়ার আগে তুমি গাড়ি 'লক' করে যাওনি আর ইগ্‌নিশান-কী ড্যাস বোর্ড লাগানো ছিল, যেহেতু ছন্দাকে অনুসরণ করার সময় তুমি নবতাল-তালাটা লাগিয়ে যাওনি তাই বাড়ি ফিরে তোমার কোনও অসুবিধা হয়নি। তাই না ? তার মানে তুমিই ড্রয়ার থেকে ট্রিপ্লিকেট চাবিটা সংগ্রহ করেছিলে। পরদিন সকালে। আর ছন্দার ব্যাগ খুলে তার চাবিটাও নিজের পকেটে ভরে নাও। অর্থাৎ খবরের কাগজে যে ফটো বার হয়েছে তা তোমার চাবির সেট—ছন্দার নয়। কী ? ঠিক বলছি ?

ত্রিদিব : আশ্চর্য! আপনি কেমন করে টের পেলেন ?

বাসু-সাহেব হাতটা তুলে রানুকে থামতে বললেন, দ্যাট্‌স্ অল! আর পড়ার দরকার নেই। তুমি বিশ্রাম নাও গে যাও।

রানু কাগজগুলো নিয়ে তাঁর ইনভ্যালিড-চেয়ারের চাকায় পাক মেরে গৃহান্তরে চলে গেলেন। তবে নিতান্ত মেয়েলী কৌতূহলে রাঠোর রাজপুতটির দিকে একবার চকিত দৃষ্টিপাত করতে ভুল হল না।

ফোলানো বেলুনটিতে কে যেন নির্মমভাবে সূঁচ ফুটিয়েছে! উনি স্রেফ চুপসে গেছেন!

রানু চলে যাবার পর স্বয়ংক্রিয়-পাল্লাটা বন্ধ হতেই ত্রিবিক্রমনারায়ণ ঝুঁকে পড়ে বললেন, আপনি কি এই ডিপজিশনের কপি পুলিসকে দেবেন ?

জবাবে বাসু বললেন, ফর য়োর ইনফরমেশন মিস্টার রাও, আপনার পুত্রবধূর জামিনের অর্ডার বেরিয়ে গেছে। প্রসিকিউশানের নিজেদের সাক্ষীরাই তাকে 'অ্যালেবাই' দিয়েছে। সম্ভবত পুলিস এ-কেস চালাবে না। হত্যামুহূর্তে আসামী অকুস্থলে ছিল না, এটা প্রমাণিত হয়েছে!

ত্রিবিক্রম পুনরায় বলেন, তা নয়, আমি জিজ্ঞেস করছি, এই 'ডিপজিশনে'র কপি কি আপনি পুলিস-কমিশনারকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন ?

বাসু বলেন, আপনার পুত্র ও পুত্রবধূ দু-জনেই 'মিউচুয়ালি এগ্রি' করেছে। বিবাহবিচ্ছেদটা হয়ে যাবে। অবশ্য অ্যালিমানির খেশারদটা আপনি

দিতে রাজি হলে।

ত্রিবিক্রম স্পষ্টতই বিরক্ত হলেন : দ্যাট্‌স্‌ নট দ্য পয়েন্ট, কাউন্সেলার! আমি জানতে চাইছি, এই ডিপজিশনের কপি কি পুলিসে পাঠানো হবে?

—কে পাঠাবে? আমরা ছয়জন জানি, কমলেশকে কে হত্যা করেছে। ত্রিদিব নিজে জানে, কিন্তু সে পাঠাবে না। কারণ সে হত্যাকারী। নটরাজন আর স্টেনোগ্রাফার 'প্রফেশনাল এথিক্সে' পুলিসে জানাতে পারে না। বাকি রইলাম আমরা তিনজন : আপনি, আমি আর আমার সেক্রেটারি। কে পাঠাবে?

ত্রিবিক্রম দাঁতে-দাঁত দিয়ে বললেন, আপনি?

—না। আমি পাঠাব না। কেন জানেন? আমি চাই না যে, টাকার জোরে আপনি আইনকে ফাঁকি দিতে সক্ষম হন। এ জন্য শাস্তি যা দেবার তা আমি নিজেই দেব।

—আপনি নিজেই শাস্তি দেবেন? ত্রিদিবকে?

—নিজেই দেব। ত্রিদিবকে নয়। তার বাবাকে। প্রকৃত অপরাধীকে। কমলেশ যখন পকেট থেকে রিভলবার বার করছে, তখন তার মাথায় বাড়ি মারাকে খুন তো বলাই চলে না। সেটা আত্মরক্ষা করা। সাচ্চা মরদ হলে সে পুলিসে গিয়ে অকপটে আদ্যন্ত সত্য কথা বলত। নিঃসন্দেহে সে নির্দোষী হিসাবে মুক্তি পেত। কিন্তু ত্রিদিব সে-পথে যায়নি। তার পরিবর্তে সে তার স্ত্রীর—যে স্ত্রী দ্বিচারিণী নয়, যে দু হাজার টাকা ব্ল্যাকমেলারকে দিতে রাজি হল না—তাকে ফাঁসিয়ে দিল। ফাঁসির দড়িতে ঝোলাতে চাইল। তার ভ্যানিটিব্যাগ থেকে চাবির গোছা চুরি করে পুলিসের কাছে মিথ্যা এজাহার দিয়ে এল। এই হিমালয়ান্তিক অপরাধের জন্য দায়ী কে? একমাত্র ত্রিদিবের বাবা। যে ওকে মেরুদণ্ডহীন ক্রিমিকীটের মতো না-মানুষ করে গড়ে তুলেছে। অপরাধীকে তাই কঠিন শাস্তি দেব আমি।

—কী শাস্তি?

—অর্থদণ্ডই। আইন-সম্মতভাবে। ঘুষ নয়।

ত্রিবিক্রম পকেট থেকে চেক বই বার করে, কলমের খাপটা খুলে বলেন, বলুন?

—দুটো চেক লিখবেন। একটা আমাকে। অ্যাকাউন্ট-পেয়ী। আপনার পুত্রবধূর পক্ষে মামলা-লড়ার জন্য 'ফীজ' : পঞ্চাশ হাজার, ইনক্লুডিং কস্ট। দ্বিতীয়টা আপনার বধূমাতাকে—হোয়াইট মানি—অ্যালিমানি-কাম-প্রপার্টি সেট্‌ল্‌মেন্ট : সাতাত্তর লক্ষ টাকা।

ত্রিবিক্রম একটু চমকিত হয়ে বললেন, বেগ্‌ য়োর পার্ডন? লক্ষ? 'হাজার' নয়?

—না 'মিলিয়ান' নয়, লক্ষই। আপনিই না সেদিন বললেন, আপনার হাত দিয়ে দিনে লাখ-লাখ নয়, কোটি-কোটি টাকা হাত ফিরি হয়?

ত্রিবিক্রম জবাব দিলেন না। দু-খানি চেক লিখে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,

আগে বলিনি, তাহলে আমাকে ভুল বুঝতেন। এখন বলছি, আই প্লীড : গিল্‌টি। ছেলেটাকে আমি ঠিক মতো মানুষ করতে পারিনি।

বাসুও উঠে দাঁড়ালেন। করমর্দনের জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, শুভ-প্রচেষ্টা যে-কোন বয়সেই শুরু করা যেতে পারে। উইশ্‌ য়ু বেস্ট অব লাক্‌। ছেলেকে এবার মানুষ করে তুলুন!

ত্রিবিক্রম ওঁর প্রসারিত হাতটা ধরেই ছেড়ে দিলেন। বললেন, থ্যাংস্‌ কাউন্সেলার, ফর দিস্‌ কাউন্সেল!

॥ উনিশ ॥



পরদিই সকাল।

ওঁরা চারজনে ব্রেকফাস্টে বসেছেন। আজ প্রাতরাশে কিছু রকমফের হয়েছে—কড়াইশুটির কচুরি। বোধকরি বাসু-সাহেবের সাফল্যের কারণে। সুজাতা কচুরিগুলো বেলে দিয়ে এসেছে। বিশু একটার পর একটা কড়াইয়ে ছাড়ছে, আর গরম-গরম পাতে নামিয়ে দিচ্ছে। রানু হিসাব রাখছেন জনান্তিকে—ব্যারিস্টার-সাহেবের পাতে ক-খানা নামল। তাঁর ক্লোরেস্টরল্‌ বুঝি বিপদসীমা ছুঁই-ছুঁই। তাই বেশি ভাজা খাওয়া মানা, অর্থাৎ খাওয়া মানা।

কৌশিক বলল, একটা জিনিস কিন্তু আমার কাছে পরিষ্কার হয়নি, মামু। ত্রিদিবের আগে-আগে যে ছায়ামূর্তি ভারা বেয়ে নেমে গিয়েছিল সে কে?

বাসু, পাতের স্ফীতোদর খাদ্যবস্তুটার উদরে ফর্ক সহযোগে একটা ছিদ্র করে ফুঁ দেওয়ায় ব্যস্ত ছিলেন। বললেন, শিবানী সোমের কমিশন এজেন্ট।

—রানু একটু বিস্মিত হয়ে পড়েন : শিবানী সোম? সে কে?

—তোমরা এখনো চেন না। আমি চিনি।

—তাহলে আমাদের চিনিয়ে দাও।

—দিতে পারি। যদি তুমি আর একখানা কচুরি স্যাংশান কর! বিনা কমিশনে 'কমিশন-এজেন্টে'র তথ্য পেশ করা চলবে না।

রানু হেসে ফেলেন। বলেন, পাতে যেটা রয়েছে সেটা নিয়ে ক-খানা হল?

—তিনখানা।

সুজাতা টপ্‌ করে ওঁর পাতে আর একটা কচুরি নামিয়ে দিয়ে বলে, তিন-শত্তুর করতে নেই। নিন, হল তো? এবার বলুন—শিবানী সোম কে? তার পাত্তা কোথায় পেলেন?

—তথ্যটা সরবরাহ করেছে বটুকে। সে দু নৌকোয় পা দিয়ে চলতে চেয়েছিল। কিন্তু দোহাত্তা লোটা তার বরাতে নেই। শিবানী সোমের এজেন্ট কেটে পড়ায় সে শুধু আমাকেই সংবাদ সরবরাহ করে পকেট ভারী করছিল।

একেবারে শেষ পর্যায়ে।

কৌশিক বলে, বুঝেছি। কমলেশ খুন হওয়ার আগেই পানের দোকানে যে মটর সাইকেলের মালিকের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়। যে-ছোকরা সাহস করে আপনার চেম্বারে আসতেই রাজি হয়নি।

বাসু কচুরিতে একটা কামড় দিয়ে বলেন, হ্যাঁ, সেই ছোকরাই শহরতলির মস্তান। শিবানী সোমও বিবাহ-বিশারদ কমলের এক ধর্মপত্নী। তার কিছু গহনা হাতিয়ে কমল নিরুদ্দেশ হয়েছিল। ওই কমিশন-এজেন্ট ছোকরাও ঘটনার রাত্রে ওখানে উপস্থিত ছিল। সম্ভবত সে এসেছিল ত্রিদিবেরও আগে। আমার মনে হয়, সে যখন ভারা বেয়ে উঠছে তখনই ত্রিদিব এসে তার গাড়িটা রাস্তার ধারে রাখে। তাতেই ও আত্মগোপন করে লুকিয়ে বসে থাকে। সমস্ত ঘটনার হয়তো সে নীরব দর্শক—আড়ালে লুকিয়ে থেকে। চোখের সামনে কমলকে খুন হতে দেখে সে ভারা বেয়ে নেমে যায়। তার মটর-সাইকেলের শব্দ অনেকেই শুনেছে।

—তাহলে ফিঙ্গার-প্রিন্টগুলো মুছে দিয়ে গেল কে?

—'নেতি-নেতি' করতে করতে যে লোকটি অকুস্থলে সর্বশেষ উপস্থিত ছিল—যার ধমনীতে শক্তাবৎ রাজরক্ত! আপাতদৃষ্টিতে তাকে ন্যালা-ক্যাবলা মনে হলেও শয়তানি বুদ্ধি তার কম নয়! হয়তো প্রচুর ডিটেক্টিভ গল্প ওর পড়া আছে। তাই যখন দেখল সব শুনশান—ডোরবেল বাজানোও বন্ধ হয়ে গেছে তখন ত্রিদিবই সব কিছু মসৃণ বস্তু তার রুমাল দিয়ে মুছে দিয়ে যায়। এমনও হতে পারে যে, রুমাল বার করবার সময়েই তার গাড়ির চাবিটা পড়ে যায়।

হঠাৎ কলবেলটা বেজে ওঠে। বিশু গিয়ে দরজা খুলে দেখল। আগন্তুক বাধা মানল না। সরাসরি চলে এল ভিতর বাড়িতে—ডাইনিং হলে। রানু সবার আগে দেখতে পেলেন। খুশিমনে ডেকে ওঠেন, এস, এস ছন্দা। ছাড়া পেয়ে গেছ তাহলে? বস ওই চেয়ারটায়।

ছন্দা এগিয়ে এল। নত হয়ে প্রণাম করল বাসুকে আর রানুকে। বলল, হাজত থেকে সোজা চলে এসেছি। আর যাবই বা কোথায়? আলিপুরের বাড়িতে তো প্রবেশ নিষেধ। শুভ্রাদির বাড়িতে যেতে পারতাম, কিন্তু সেখানে যেতেও কেমন যেন সঙ্কোচ হল।

বাসু বললেন, এখানে চলে এসে বুদ্ধিমতীর মতো কাজ করেছ। তবে ইচ্ছা করলে যে-কোনও পাঁচতারা হোটেলে ভি. আই. পি. সুইটেও তুমি উঠতে পারতে।

ছন্দা ম্লান হাসে। বলে, ধনকুবেরের প্রাক্তন পুত্রবধূকে নিয়ে লেগ-পুলিং করছেন, স্যার?

রানু হাত বাড়িয়ে কর্তাকে বাধা দিলেন। ছন্দাকে বলেন, তুমি বাথরুমে গিয়ে মুখে-হাতে জল দিয়ে এখানে এসে বস দিকিন। সকাল থেকে এক কাপ চাও কপালে জোটেনি মনে হচ্ছে।

সুজাতা তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল।

একটু পরে মুখ মুছতে-মুছতে ছন্দা ফিরে এসে বসল একটা চেয়ারে।

বিশু ওর সামনে নামিয়ে রাখল গরম কচুরির প্লেট।

আহারান্তে বাসু বললেন, রানু বাধা দেওয়ায় তখন তোমার প্রশ্নটার জবাব দিতে পারিনি ছন্দা। এখন বলি : না! রসিকতা আমি করিনি। ধন-কুবেরের প্রাক্তন পুত্রবধূ হিসাবে তুমি আজ সত্তর লক্ষ টাকার মালিক! পাঁচতারা হোটেলের বিলাসবহুল কক্ষ তোমার কাছে স্বপ্নরাজ্য নয়।

সুজাতা সংশোধন করে দেয়, সত্তর নয় মামু, সাতাত্তর লক্ষ।

—না সুজাতা। পাঁচ-লাখ টাকার চেক ছন্দা দেবে কমলাক্ষ করের বিধবা অনসূয়া করকে, আর দু-লাখ কমলাপতি সোমের বিধবা শিবানী সোমকে। ওরা দু-জনেও কম ভোগেনি। ওদের কথা মনে ছিল বলেই আমি সত্তরের বদলে অঙ্কটা সাতাত্তর লাখ করেছি।

ছন্দা বোকার মতো একবার এদিকে একবার ওদিকে তাকিয়ে দেখে। শেষে বলেই ফেলে, এ সব কী আবোল-তাবোল বকছেন আপনারা ?

বাসু নিঃশব্দে উঠে গেলেন পাশের ঘরে। তখনই ফিরে এসে চেকটা বাড়িয়ে ধরলেন ছন্দার দিকে। টাকার অঙ্কটার দিকে নজর পড়ায় বজ্রাহত হয়ে গেল যেন। প্রশ্ন করবার ক্ষমতাও ছন্দার আর অবশিষ্ট ছিল না।

বাসু বললেন, ত্রিবিক্রমরাও আমার ফি মিটিয়ে দিয়েছেন। এটা তোমার 'নেট'। তবে ওই পাঁচ-লাখ তোমার খরচ হবে! বুঝলে না ? এটা তোমার বিবাহ-বিচ্ছেদের খেশারত। তোমার প্রাক্তন স্বামী দিচ্ছে : 'অ্যালিমানি-কাম-মানি-সেট্‌ল্‌মেণ্ট।'

ছন্দা ধীরে-ধীরে চেকটা টেবিলে নামিয়ে রাখল। মুখটা থমথমে হয়ে গেল তার। বললে, ত্রিবিক্রম রাও-এর দেওয়া ঘুষ আমি নেব, এটা আপনি ধরে নিলেন কেন ?

—ঘুষ! সার্টেন্‌লি নট! সবটাই লিগাল-মানি। কালো টাকার নয়। ত্রিবিক্রম ঘুষ দেবে আর আমি তাই হাত পেতে নেব ? কী বলছ ছন্দা ? এ তার অর্থদণ্ড! ঠিক আছে। চেকটা এখানেই থাক। তুমি এই কাগজগুলো নিয়ে ওঘরে যাও। পড়। তারপর ফিরে এসে তোমার সিদ্ধান্ত জানিও···

ছন্দা জানতে চায়, কীসের কাগজ এগুলো ?

—তোমাদের বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার ব্যাপারে ত্রিদিব কী ডিপজিশান দিয়েছে তা পড়ে দেখ। তারপর কী করতে চাও, বল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে ছন্দা ফিরে এল। বলল, আশ্চর্য! আমি তো স্বপ্নে এমন কথা ভাবতে পারিনি। ডাক্তার ব্যানার্জি তাহলে ঠিকই বলেছিলেন, মাতৃত্ব কামনার তির্যক পরিতৃপ্তির সন্ধানে আমি অন্ধ হয়ে গেছিলাম। ওকে শোধরানো অসম্ভব। জেনে বুঝে সে আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিচ্ছিল! আমার চাবির গোছাটা চুরি করে···

এই সময় বেজে উঠল টেলিফোনটা। এ কাজ চিরকাল রানুর। উনি

হাত বাড়িয়ে যন্ত্রটা তুলে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই খবর পেয়েছেন। ছন্দা ছাড়া পেয়ে গেছে।···না, না, জামিন নয়, মুক্তি। পুলিস আর মামলা চালাতেই চায় না।···আপনি কোথা থেকে বলছেন?···কী?···ক্যালাঙ্গুটে! সেটা আবার কোথায়?···না, না, নিতান্ত ঘটনাচক্রে সে এখানেই বসে আছে! ···এই তো আমার সামনে!···আচ্ছা দিচ্ছি তাকে···

টেলিফোনটা বাড়িয়ে ধরে ছন্দাকে বলেন, ডাক্তার ব্যানার্জি! গোয়া থেকে এস. টি. ডি. করছেন···নাও, কথা বল···না, বরং এক কাজ কর। আমার রিসেপশানে চলে যাও। এই টেলিফোনের এক্সটেনশানে জনান্তিকে কথা বলতে পারবে। যাও।

ছন্দা সলজ্জে ও-ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। চেকটা তুলে নিয়ে।

রানু সুজাতার দিকে ফিরে বলেন, বল তো সু, 'শেষের কবিতা'র শেষ কবিতার মোদ্দা কথাটা কী?

সুজাতা অবাক হয়ে বলে, আমি জানি না। হঠাৎ এ কথা কেন?

বাসু বললেন, 'পরশুরামে'র মতেঃ উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে, সেই ধন্য করিবে আমাকে!'